শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
সংকলিত

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৪

মূল্য—৪৸০ আনা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস লিঃ,
৮০. লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪

— সূচীপত্র —

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসূর্যেন্দু বিকাশ কর, শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা প্রমুখ সুধীবৃন্দের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও সাহায্যের ফলে এই অভিধান সংকলনের কার্য সম্ভব হয়েছে। ইঁহারা নানাভাবে এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে যেরূপ শ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্যে আমি ইঁহাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ ছাড়া যে সকল সহৃদয় বন্ধু এই অভিধান প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই

—ইতি

গ্রন্থকার

পরিভাষা — বৈজ্ঞানিক ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের জন্যে বহুদিন থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছে ; ফলে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যথেষ্ট প্রচলিতও হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বাংলা পরিভাষা সর্বাংশে প্রকৃত অর্থবোধক হয় না, কষ্টকল্পিত ও নিরর্থক হয়ে পড়ে ; এজন্যে এরূপ বাংলা পরিভাষা এ পুস্তকে যথাসম্ভব বর্জন করে ইংরেজী শব্দই বিশেষ তাৎপর্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিজ্ঞান ভারতী' অভিধানে বিশেষ প্রচলিত ও নির্দোষ বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলো মাত্র আমরা ব্যবহার করেছি।

বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর বাংলা ব্যাখ্যার মধ্যেও ইংরেজী শব্দই স্বকীয় তাৎপর্যসহ ভাবপ্রকাশক ভঙ্গিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতির পরিভাষা অম্লজান, উদ্‌জান প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নি ; কারণ এগুলো থেকে অক্সাইড, পারঅক্সাইড, হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি বিভিন্ন অনুযোজক শব্দ গঠন করা সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয় না। কিন্তু টেম্পারেচার—উষ্ণতা, বয়েলিং পয়েন্ট—স্ফুটনাঙ্ক, ইকোয়েটর—বিষুবরৃত্ত প্রভৃতি পরিভাষা সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছে। কেহ কেহ ইন্‌কিউবেটর, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা উষ্ণকক্ষ, হিমকক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার করেন, এরূপ না করাই ভাল। ইঞ্জিন, সেল, ডায়নামো, কমিউটেটর, কম্পাস, গ্যালভ্যানোমিটার প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্রাদি বিষয়ক শব্দের যথাযথ আন্তর্জাতিক রূপ বজায় রাখাই বিধেয়। আবার অনেকে ক্যালসিয়াম, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি শব্দকে ক্যালসিয়ম, প্ল্যাটিনম প্রভৃতি লিখে থাকেন ; এরূপ বিকৃতিরও আমরা পক্ষপাতী নই। অক্সিঅ্যাসিডকে অক্সিঅম্ল, অ্যালকোহলকে কোহল, ক্যাথোড-রে-টিউবকে ক্যাথোড-রশ্মি নল লেখাও নিরর্থক।

মোট কথা, আমরা এই পুস্তকে বৈজ্ঞানিক শব্দের মূল ধ্বনি ও রূপ যথাসম্ভব বজায় রেখে বাংলায় গ্রহণ করেছি। এভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দরাজি ক্রমে বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হলে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য

সমৃদ্ধ হবে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দূর হবে। অধিকন্তু এর ফলে শিক্ষার্থিগণের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানশিক্ষার পথও অনেক সুগম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ ছাড়া সংখ্যাসূচক প্রতীক চিহ্নগুলোও এই পুস্তকে সর্বত্র 1, 2, 3··· ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে; যেহেতু রাসায়নিক সংকেত-সূত্রাদিতে রোমান হরফ ও সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা অপরিহার্য। এর ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে বলে আমরা মনে করি। আমাদের মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অনুশীলনে এই রীতিই সমীচীন।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা — বিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্দাদির মূল তথ্য ও তাৎপর্য সহজভাবে বিবৃত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বহু জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সহজ ব্যাখ্যা অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়েছে; কারণ সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সংকলন করাই অভিধানের রীতি—অভি-ধানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। এজন্যে কোন কোন স্থলে বিবৃতি অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে, তথ্যবিশেষে মতদ্বৈধের অবকাশও অসম্ভব নয়। সহজবোধ্য বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয়তো সর্বত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নি। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানের অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ও মূল তথ্যের প্রাথমিক ধারণা পরিবেশন করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান ভারতী' দেশের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই আমরা কৃতার্থ হবো।

বাংলা ভাষায় এরূপ বৈজ্ঞানিক অভিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টা এই প্রথম। বিশেষতঃ নানারূপ অসুবিধা ও ব্যস্ততার মধ্যে এর সম্পাদন কার্য সম্পন্ন করতে হয়েছে। কাজেই কোথাও কোথাও ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি হয়তো থেকে গেছে; অতএব আমরা দেশের সহৃদয় সুধীসমাজের সহযোগিতাপূর্ণ

মতামত সর্বতোভাবে কামনা করছি। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে যে কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশিষ্ট — অভিধানের শেষে বিজ্ঞান বিষয়ক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিশিষ্ট হিসেবে প্রদত্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা ও অনুশীলনের ব্যাপারে বিভিন্ন পদার্থের ডেন্সিটি, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, বিভিন্নরূপ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি, সৌরপরিবারের বিভিন্ন গ্রহ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য ইত্যাদি বহু বিষয় বিজ্ঞানানুরাগীদের প্রায়শঃই প্রয়োজন হয়। এজন্যে এরূপ বিভিন্ন তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। 'বিজ্ঞান ভারতী'তে যে সকল বাংলা পরিভাষা গৃহীত হয়েছে সেগুলোর একটা বাংলা বর্ণানুক্রমিক তালিকা মূল ইংরেজী শব্দসহ প্রদত্ত হয়েছে; এ থেকে বাংলায় বহু সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ সহজে পাওয়া যাবে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধাদি রচনার জন্যে লেখকগণের ও বিজ্ঞানানুরাগী সাধারণ পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংকলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে উক্ত তালিকার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হলেও মূল তালিকা যথাযথ রাখা হয়েছে। ইতি—

১৫ই জুলাই, ১৯৫৪
৪৯/১এ, টালিগঞ্জ রোড,
কলিকাতা ২৬

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

সংকেত

এই অভিধানে বিভিন্ন ব্যাখ্যাদির মধ্যে অন্যত্র দ্রষ্টব্য শব্দের পরে এই ↑ চিহ্ন দেওযা হয়েছে ; ↑ মানে 'অন্যত্র দেখুন'।

রাসায়নিক সূত্রাদির অর্থবোধের জন্যে পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট 'মৌলিক পদার্থের তালিকা' থেকে বিভিন্ন মৌলের সাংকেতিক চিহ্ন দেখতে হবে ; যেমন—

N — নাইট্রোজেন   Na — সোডিয়াম
Ca — ক্যালসিয়াম   C — কার্বন ; ইত্যাদি

এ থেকে —

NH_3 — অ্যামোনিয়া (একটা নাইট্রোজেন পরমাণু ও তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে সৃষ্ট একটা অ্যামোনিয়া অণু) বুঝতে হবে।

এইরূপ, H_2O — জল (দুটা হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটা অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে গঠিত পদার্থ) জলের একটা অণু।

বিজ্ঞান ভারতী

বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান

অক্টো, অক্টা — আট গুণ, অষ্টসংখ্যক ; যেমন, অক্টোপাস--অষ্টভুজ সামুদ্রিক জীব ; অক্টাহেড্রন—সমান আটতলবিশিষ্ট আকৃতি।

অক্টাগন — অষ্টভূজ জ্যামিতিক ক্ষেত্র ; যে সামতলিক ক্ষেত্র আটটি ভূজ বা বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ।

অক্ট্যাণ্ট — বৃত্তের অষ্টমাংশ। কোন জ্যামিতিক বৃত্তের দুটি ব্যাসার্ধ 45° কোণে অঙ্কিত হলে তাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ।

অক্টেন — প্যারাফিন ↑ জাতীয় একটি হাইড্রোকার্বন ↑ ; তরল পদার্থ, স্ফুটনাংক 126° সেন্টিগ্রেড। আণবিক সূত্র C_8H_{18} ; মোটর স্পিরিট বা পেট্রলের কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়াকে অক্টেন-রেটিং বলে।

অক্টেভ্-ল—বিজ্ঞানী নিউল্যাণ্ডস্ মৌলিক পদার্থগুলোর ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন। এর মূল তথ্য অনেকটা মেণ্ডেলিফের 'পিরিয়ডিক্-ল'-এরই ↑ প। বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ করেছিলেন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলোর একটা সুসম্পূর্ণ পর্যায়ক্রমিক তালিকা, যাকে বলা হয় পিরিয়ডিক টেবল ; এর মূল সূত্রটাই হোল পিরিয়ডিক্-ল ↑। নিউল্যাণ্ডস্-এর 'অক্টেভ-ল' অসম্পূর্ণ হলেও অন্যনিরপেক্ষভাবেই তিনি এটা করেছিলেন।

অক্সিজেন — একটি মৌলিক গ্যাস, সাংকেতিক চিহ্ন O, — বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 16, পারমাণবিক সংখ্যা 8. অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে বায়ুতে মিশে আছে ; বায়ুমণ্ডলের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। সব রকম দহনকার্য ও জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া এ ছাড়া চলে না। হাইড্রোজেন ↑ গ্যাসের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে জলের উৎপত্তি হয়। খনিজ ধাতুর সঙ্গে প্রচুর সংমিশ্রিত রয়েছে। লোহার সঙ্গে এর মিলনের ফলে লোহায় মরিচা ধরে—লোহার

অক্সাইড ↑ হয়। তরল বায়ু থেকে আংশিক বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাওয়া যায়। জলে সামান্য দ্রবণীয়। 1774 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিষ্টলি আবিষ্কার করেন।

অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম — অক্সিজেন ↑ ও অ্যাসিটিলিন ↑ গ্যাস দুটি মিশিয়ে একসঙ্গে প্রজ্জ্বলিত করলে যে উচ্চ তাপের (প্রায় 3300 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) তীব্র অগ্নিশিখার
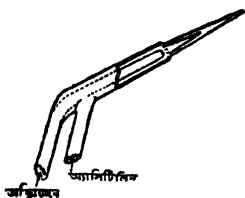
অ্যাসিটিলিন
অক্সিজেন

অক্সি-অ্যাসিটিলিন বার্ণার

সৃষ্টি হয়। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৃথক নলের মধ্য দিয়ে এসে ওই দুটা গ্যাস এক মুখে মিশে বেরোয়; এই মিশ্রিত গ্যাস জ্বালিয়ে দিলে অত্যুত্তপ্ত শিখার সৃষ্টি করে। এর তাপে কঠিন ধাতব পদার্থ গালিয়ে জোড়া লাগান যায়; এই প্রক্রিয়াকে বলে **ওয়েল্ডিং** ↑।

অক্স্যালিক অ্যাসিড — সাদা স্ফটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $(COOH)_2 . 2H_2O$; নানারকম রঞ্জক-দ্রব্য, কালি, মেটাল-পলিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে দরকার হয়। এর জলীয় দ্রব লাগালে কালির দাগ উঠে যায়; এর সঙ্গে একটু অ্যামোনিয়া ↑ দিয়ে রোদে রাখলে ভাল কাজ হয়ে থাকে। রাসায়নিক মিলনে এ থেকে বিভিন্ন অক্স্যালেট্ সল্ট ↑ সৃষ্টি হয়।

অটো — শব্দার্থ হোল স্বয়ংক্রিয়, বা আপনা-থেকে; যেমন, অটোমেটিক পিস্তল, অটো-জাইরো ↑, ইত্যাদি।

অটোগেমিক—যে সব উদ্ভিদ বা প্রাণী গর্ভকোষ পুংকোষের মিলন ব্যতীত আপনা থেকেই এককভাবে বংশ বৃদ্ধি করে।

অটোক্লেভ্ — বাক্সের মত আধার-যুক্ত বিশেষ এক রকম তাপযন্ত্র; উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে এর মধ্যে রেখে কোন বস্তু 100° সেন্টি-গ্রেডের অধিক তাপে উত্তপ্ত রাখা যায়। ক্ষতচিকিৎসার তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস জীবাণুমুক্ত করবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে; একে স্টেরিলাইজ্ করা বলে।

অটোজাইরো — ঘূর্ণায়মান পাখা-যুক্ত হেলিকপ্টার ↑ শ্রেণীর এক রকম বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র বিমান-পোত। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘূর্ণায়মান পাখার সাহায্যে বাতাস

অটোজাইরো

কেটে অটোজাইরো সোজা উপরে উঠে যেতে পারে।

অডিবিলিটি লিমিট্ — বাতাসে প্রতি সেকেণ্ডে কমপক্ষে 30 থেকে 30,000 বার স্পন্দনের শব্দতরঙ্গ মানুষের কানে ধরা পড়ে ; এর বেশী বা কম স্পন্দন-বিশিষ্ট তরঙ্গের শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। প্রতি সেকেণ্ডে শব্দতরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যার এই সীমাকে বলে অডিবিলিটি-লিমিট। এর বেশী স্পন্দনযুক্ত শব্দতরঙ্গকে বলে 'আল্ট্রাসনিক'।

অপ্টিক্স্ — আলোকের ধর্ম ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

অব্জেক্টিভ্ — দূরবীক্ষণ ও অণু-বীক্ষণ যন্ত্রে যে-সব লেন্স ↑ দৃশ্য বস্তুর অভিমুখে সংলগ্ন থাকে। ওই সব যন্ত্রের যেদিকে চোখ লাগান হয় সেখানকার লেন্সকে বলে আই-পিস

অব্টিউস অ্যাঙ্গল্ — এক সমকোণ বা 90° ডিগ্রি অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ।

অর্গ্যানিক্ কেমিষ্ট্রি — জৈব বা অঙ্গারক রসায়ন-বিদ্যা ; কার্বো রসায়ন। উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে প্রাপ্ত বা অঙ্গারঘটিত পদার্থাদি বিষয়ক রসায়ন শাস্ত্র।

অর্থোক্রোমেটিক্ ফিল্ম — অর্থো মানে সোজাসুজি বা যথাযথ ক্রোমেটিক মানে বর্ণময়। আলোক চিত্রের যে ফিল্মে বিভিন্ন বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য সাদা কালো ছবিতে যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়। বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে এরূপ ফিল্ম বিশেষতঃ সবুজ, নীল ও বেগুনী বর্ণ (আলোক) সুগ্রাহী হয়ে থাকে ; ফলে ফটোগ্রাফির ↑ আলোছায়ার কৌশলে এতে অধিকতর স্বাভাবিক ছবি ওঠে।

অর্থোপ্টেরা — আরসোলা জাতীয় যে-সব পতঙ্গের সামনের পক্ষদ্বয় অপেক্ষা-কৃত পুরু ও শক্ত, কিন্তু পেছনের পাখা জোড়া পাতলা জালি পর্দায় তৈরী।

অর্থোপ্টেরা

অর্পিমেণ্ট — এক রকম হলদে খনিজ পদার্থ ; স্বভাবজাত আর্সেনিক ট্রাইসালফাইড্ (As_2S_3), বিষাক্ত পদার্থ। বাংলায় বলে হরিতাল।

অরবিট্ — কক্ষ ; নির্দিষ্ট ভ্রমণ-পথ। গ্রহাদি যে-পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। — পরমাণুর সংগঠক ইলেকট্রনগুলো যে-পথে নিউ-ক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরে।

অরোরা-বোরিয়ালিস্ — উত্তর-মেরু-প্রভা ; পৃথিবীর উত্তর মেরু-প্রদেশের আকাশে যে আলোকচ্ছটা

দৃষ্ট হয়। এর বর্ণালীতে প্রধানতঃ লাল ও সবুজ বর্ণের আভাই বেশী। সম্ভবতঃ সূর্য থেকে তড়িতাবিষ্ট কণিকা-ধারা বিচ্ছুরণের ফলে এরূপ বর্ণচ্ছটা প্রতিভাত হয়ে থাকে। বায়ু-কণিকা আয়নায়িত হয়ে তড়িৎ-বিচ্ছুরণের ফলেও এরূপ হতে পারে। যখন সৌরকলঙ্কের আধিক্য ঘটে তখনই এই আলোকচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। দক্ষিণ-মেরুতে এরূপ প্রভাকে বলে **অরোরা অস্ট্রেলিস্।**

অলিয়াম — ঘনীভূত (কন্‌সেণ্ট্রেটেড) গন্ধকাম্ল; বিশুদ্ধ সাল-ফিউরিক অ্যাসিড, H_2SO_4 ↑, যাতে জলীয় অংশ প্রায় থাকে না। অনাবৃত রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে এ-থেকে সব সময় সাল্‌ফার-ট্রাইঅক্সাইডের (SO_3) ধূম নির্গত হতে থাকে; তাই একে ফিউমিং সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডও বলে।

অলেইক্ অ্যাসিড — একটি অসম্পৃক্ত তরল জৈব অ্যাসিড ↑; বিভিন্ন তৈল ও চর্বি জাতীয় পদার্থে এর বিভিন্ন গ্লিসারাইড ↑ পাওয়া যায়। এর গ্লিসারাইডের ভাগ যত বেশী থাকবে তৈল বা চর্বি তত নরম, মসৃণ ও তৈলাক্ত হবে।

অলিফাইন্‌স — ইথিলিন ↑ শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনগুলোর সাধারণ নাম; এদের অলিফিন্‌সও বলা হয়। এদের সাধারণ রাসায়নিক ফর্মুলা হোল C_nH_n; বিভিন্ন সংখ্যক কার্বন ↑ ও হাইড্রোজেন অণুর মিলনে এগুলো গঠিত হয়।

অয়েল অব ভিট্রিয়ল — সাল-ফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4); বাংলায় বলে গন্ধকাম্ল।

অস্‌মোসিস্ --- সূক্ষ্ম পর্দাবিশেষের মধ্যে দিয়ে জল বা অপর কোন দ্রাবকপদার্থের যে-গতি লক্ষিত হয়। এরূপ পর্দার ভিতর দিয়ে দ্রাবক পদার্থ নিঃসৃত হয়, কিন্তু দ্রাব্য পদার্থ আটকে যায়। দুটি অসমান ঘনত্বের দ্রবের মধ্যে এরূপ পর্দা দিলে অল্প ঘনত্বের দ্রব থেকে দ্রাবকের এই গতির (অস্‌মোসিস) প্রভাবে জল বা যে-কোন তরল দ্রাবক অধিক ঘনত্বের দ্রবের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

অস্‌মিয়াম্ — একটি মৌলিক ধাতু; ---সাদা, স্ফটিকাকার, কঠিন পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Os; পারমাণবিক ওজন 190·2, পারমাণবিক সংখ্যা 76; সবচেয়ে ভারী ধাতব পদার্থ। প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। দুর্লভ মূল্যবান ধাতু।

অস্‌মিরিডিয়াম --- অ স্ মি য়া ম্, ইরিডিয়াম ↑ ও সামান্য প্ল্যাটিনামের

মিশ্রণে উৎপন্ন একটি সংকর ধাতু। অত্যন্ত কঠিন, মরিচা ধরে না—মূল্যবান ঝর্ণা-কলমের নিবের অগ্রভাগে লাগান হয়।

অসিলোস্কোপ — স্পন্দন-নির্দেশক যন্ত্র; যে-যন্ত্রের সাহায্যে সব রকম বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা কম্পন ধরা পড়ে, এবং সেই কম্পনের গতি-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। অনেক যন্ত্রে আবার স্পন্দনের রেখা-চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায়—এই রেখা-চিত্রকে বলে অসিলোগ্রাফ। (ভূ-কম্পন নির্দেশক যন্ত্রের নাম সিস্‌মোমিটার ↑)

অ্যা

অ্যাকাউষ্টিক্স্‌ — শব্দ-বিজ্ঞান; শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি বিষয়ক বিজ্ঞান।

অ্যাক্‌সিলারেটর — (1) যে পদার্থের উপস্থিতির জন্যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর হয়; অন্য কথায় একে আবার ক্যাটা-লাইট ↑ বা ক্যাটালিস্টও বলে। (২) যে যন্ত্রের সাহায্যে মোটর গাড়ীর গতি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

অ্যাক্‌সিলারেশন — চলমান বস্তুর গতি পরিবর্তনের হার; প্রতি সেকেণ্ডে গতির যতটা হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে।

অ্যাকোয়া — জল; রসায়নবিদ্যায় জল বা অ্যাকোয়া বুঝাতে সংক্ষেপে Aq লেখা হয়।

অ্যাকোয়া ফর্টিস্‌ — প্রায়-নির্জ্জল বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড, HNO_3, (কন্‌সেন্ট্রেটেড)।

অ্যাকোয়া রিজিয়া — এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। স্যাকরারা সোনা গলাতে ব্যবহার করে; সোনা, রূপা প্রভৃতি নোবল্‌ মেটাল ↑ এতে গলে যায়, যা অপর কোন অ্যাসিড এককভাবে পারে না। এই মিশ্রণ খোলা রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে হলদে হয়ে যায়—নাইট্রোসিল-ক্লোরাইড জন্মায় ও ক্লোরিন ↑ গ্যাস বেরোয়।

অ্যাকোয়াস্‌ — জলীয়, জলযুক্ত। কোন দ্রবের দ্রাবক জল হলে তাকে অ্যাকোয়াস সলিউশন ↑ বলে।

অ্যাকোনাইট্‌ — এক প্রকার উদ্ভিদের বিষাক্ত রস; উদ্ভিদটাও এই নামে পরিচিত একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ পদার্থ; ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় বলে কাঠবিষ।

অ্যাকুমুলেটর — যে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত করে রাখা হয়। একে এক রকম সেল ↑ বলা যেতে পারে; যার

মধ্যে তড়িৎ সঞ্চিত করে রেখে দরকার মত ব্যবহার করা যায়। এ জন্যে একে স্টোরেজ ব্যাটারিও ↑ বলে। সাধারণ লেড্-অ্যাকুমুলেটরে একটা কাঁচ-পাত্রের মধ্যে দুখানা সীসার প্লেট পাশাপাশি সামান্য ব্যবধানে জলমিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। ওর একখানা (পজিটিভ) প্লেটের গায়ে লেড পারক্সাইড (PbO_2) মাখান থাকে। ওই প্লেট দুখানার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালালে ইলেক্ট্রোলিসিস্ ↑ প্রক্রিয়ায় সীসা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। এর ফলেই তড়িৎশক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। এই অ্যাকুমুলেটর থেকে তড়িৎশক্তি ব্যবহারের সময় বিপরীত ধারায় রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে থাকে, ফলে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি সংযোজক তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ এরূপ অ্যাকুমুলেটর মোটর গাড়ীতে তড়িৎ-স্ফুরণ (স্পার্কিং) ও আলো জ্বালার জন্যে ব্যবহৃত হয়।
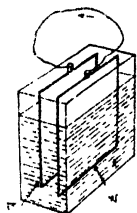
অ্যাকুমুলেটর

অ্যাগেট্—এক রকম প্রস্তর বিশেষ, মূলতঃ সিলিকা (SiO_2) ↑। অত্যন্ত কঠিন বলে ঘর্ষণে তেমন ক্ষয়ে যায় না। সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রের ফালক্রাম ↑ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়—কঠিন বস্তু পেষণের যোগ্য হামানদিস্তা অ্যাগেট্ প্রস্তরে তৈরী হয়ে থাকে।

অ্যাগার-অ্যাগার — নানা প্রকার সামুদ্রিক গুল্ম থেকে যে এক রকম আঠাল পদার্থ পাওয়া যায় ; এর রাসায়নিক গঠন কার্বোহাইড্রেটের ↑ মত। গরম জলে গুলে যায়, পরে ঠাণ্ডা হলে ক্রমে ঘন জেলির ↑ মত থিতিয়ে পড়ে। জীববিদ্যার পরীক্ষাদিতে এই জেলির মাধ্যমে জীবাণুদের বংশ বৃদ্ধি করিয়ে নানা রকম গবেষণা করা হয়।

অ্যাজোট্—নাইট্রোজেন ↑ গ্যাস : পূর্বে নাইট্রোজেন গ্যাস এই নামে পরিচিত ছিল।

অ্যাজুরাইট — স্বভাবজাত বেসিক কপার কার্বনেট ↑ : তামার একটা রাসায়নিক যৌগিক, $2CuCO_3.Cu(OH)_2$; নীলবর্ণের খনিজ পদার্থ। রাসায়নিক উপায়ে এ থেকে তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

অ্যাটম — পরমাণু : রাসায়নিক মতে মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ ; সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম পদার্থ-কণিকা। (অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানে পরমাণু-বিভাজনও সম্ভব

হয়েছে—ইলেক্ট্রন ↑, প্রোটন ↑, প্রভৃতি কণিকায় পরমাণু গঠিত।)

অ্যাটম বম্ — পারমাণবিক বোমা, যার বিস্ফোরণে মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত হয়ে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বৈজ্ঞানিক অটোহান প্রথমে ইউ-রেনিয়াম ↑ পরমাণুর ফিসন ↑ ঘটাতে সমর্থ হন। ইহার উপর ভিত্তি করেই পরে আমেরিকায় মিত্র পক্ষীয় বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় কার্যকরী পারমাণবিক বোমা তৈরী করা সম্ভব হয়। জাপানের হিরোসিমা নগরীতে প্রথম 'অ্যাটম-বম্' বিস্ফোরিত হয়েছিল। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে মন্দগতি নিউট্রন ↑ কণিকার সাহায্যে ক্রমাগত ভগ্ন করার ব্যবস্থা করে এই প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটে। এই বোমা এমনভাবে তৈরী হয় যাতে কোটি কোটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকে, আর তা থেকে বিমুক্ত শক্তি এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগেরও কম সময়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়; এই প্রক্রিয়াকে বলে নিউক্লিয়ার-ফিসন ↑। প্রকৃত-পক্ষে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ অসংখ্য ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সমষ্টি; একে বলে চেইন-রিঅ্যাক্শন। জটিল ব্যবস্থায় ইউরেনিয়াম ↑ বা প্লুটোনিয়াম ↑ ধাতুর বিশেষ বিশেষ আইসোটোপের ↑ ফিসন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

অ্যাটমিক ষ্ট্রাক্চার — পারমাণুর গঠন। পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঋণ-তড়িৎযুক্ত ইলেক্ট্রন কণিকাগুলো বিভিন্ন পথে ঘুরছে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মধ্যে এই ইলেক্ট্রন কণিকার সংখ্যা বিভিন্ন। পরমাণুর প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছে ধন-তড়িৎযুক্ত কয়েকটি প্রোটন ↑ ও তড়িৎহীন কয়েকটি নিউট্রন কণার সমবায়ে। প্রোটন ও নিউট্রনের প্রত্যেকটির ভর (মাস্ ↑) প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান; কিন্তু ইলেক্ট্রন কণিকার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর 1840 ভাগের একভাগ মাত্র, অর্থাৎ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। প্রোটনের তড়িৎশক্তি ইলেক্ট্রনের তড়িৎশক্তির সমান, কিন্তু বিপরীতধর্মী। কোন একটি পরমাণুর গঠনে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা চারদিকের ইলেক্ট্রন সংখ্যার সমান। পরমাণুর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও বস্তুগত পার্থক্য নির্ভর করে তার ইলেক্ট্রন সংখ্যা ও তাদের গতি প্রকৃতির উপর। এই ইলেক্ট্রন

সংখ্যাকেই বলা হয় পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা, বা অ্যাটমিক নাম্বার ↑। দুইটি পদার্থের রাসায়নিক মিলন তাদের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনের আকর্ষণ বিকর্ষণ ও স্থান বিনিময়ের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক পাইল্ — যে-যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনিয়াম ↑ পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার কাজ চালান হয়। এই প্রক্রিয়া গ্র্যাফাইট্ ↑ বা ভারীজল (হেভি-ওয়াটার ↑) দিয়ে মন্দীভূত করে প্লুটোনিয়াম ↑ সৃষ্টি করা হয়; অথবা, তাপ নিয়ন্ত্রণ করে রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ পদার্থ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক এনার্জি — পারমাণবিক শক্তি; পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গলে যে-শক্তির উদ্ভব হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় পদার্থকে এভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। পদার্থ বিজ্ঞানের বিখ্যাত সমীকরণ, $E = mc^2$, এই সত্যই প্রতিপন্ন করছে। এখানে E হোল এনার্জি বা শক্তি, m বস্তুভর এবং c আলোর গতি। আলোর গতি হোল সেকেণ্ডে 1,86,326 মাইল। এই হিসেবে পঞ্চাশ টন কয়লা পুড়িয়ে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, মাত্র এক গ্র্যাম ↑ পদার্থের (ইউরেনিয়ামের) বিলুপ্তি ঘটিয়ে ততটা প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানের মতে পদার্থ ও শক্তি মূলতঃ এক। পদার্থের অন্তর্ধানে শক্তির উৎপত্তি, এবং শক্তির অন্তর্ধানে পদার্থের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

অ্যাটমিক ওয়েট — পারমাণবিক ওজন; কোন মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুর স্বকীয় ওজন। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে বিভিন্ন পদার্থের এই পারমাণবিক ওজন তুলনামূলকভাবে স্থির করা হয়।

অ্যাটমিক থিওরী — পারমাণবিক মতবাদ। পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ডিমোক্রিটাস্ সাধারণভাবে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানী ড্যাল্টন সেই মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং পারমাণবিক গঠনের রাসায়নিক ব্যাখ্যা ও সূত্র প্রবর্তন করেন। ভারতের প্রাচীন আর্যঋষিগণও পদার্থের গঠনে অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা মতবাদ প্রচার করেছিলেন। যাই হোক, এভাবে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু-হিসাবে ধরা হোল। কোন একটি পদার্থের সব পরমাণু সর্বতোভাবে

এক রকম (আইসোটোপের ↑ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রভেদ দেখা যায়); বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। দুইটি পদার্থের পরমাণু একে অন্যের সঙ্গে পরস্পর জুড়ে গিয়ে পদার্থ দুটির রাসায়নিক মিলন ঘটায় এবং যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। আধুনিক মতবাদ (অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ↑) ড্যাল্টনের মতবাদ থেকে অবশ্য অনেকাংশে বিভিন্ন।

অ্যাটমিক নাম্বার — পারমাণবিক সংখ্যা। কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলো ইলেক্ট্রন পরিভ্রমণ করে সেই সংখ্যাকে বলে ওই পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা। এই সংখ্যা আবার নিউক্লিয়াসের প্রোটন ↑ সংখ্যারও সমান।

অ্যাটমিক হিট্ — পারমাণবিক তাপ। কোন মৌলিক পদার্থের বিশেষ তাপ (স্পেসিফিক হিট ↑) প্রকাশক সংখ্যাকে তার পারমাণবিক ওজন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সব কঠিন পদার্থের এই পারমাণবিক তাপ মোটামুটি 6 ক্যালোরি ↑ ; স্বাভাবিক তাপ হ্রাস পেলে পারমাণবিক তাপও হ্রাস পায়।

অ্যাট্‌মস্ফিয়ার — পৃথিবীর উপরি ভাগের বায়ুমণ্ডল; নানারকম গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। শুষ্ক ও বিশুদ্ধ অবস্থায় বায়ুতে থাকে 78·08% নাইট্রোজেন, 20·95% অক্সিজেন, ·93% আর্গন ↑, ·03% কার্বন-ডাই-অক্সাইড ↑; এছাড়া নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্‌টন, জেনন্ প্রভৃতি ইনার্ট গ্যাস ↑ বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর এই গ্যাসীয় পরিমাণের সামান্য তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ বায়ুতে আবার জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড ↑, ওজন ↑, গন্ধকজাত রাসায়নিক পদার্থ, ধূলিকণা প্রভৃতিও সংমিশ্রিত থাকে। ভূপৃষ্ঠের সকল পদার্থের উপর বায়ুমণ্ডলের একটা চাপ সব সময়েই পড়ছে—সমতল ভূমিতে এই চাপ প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে মোটামুটি 14·72 পাউণ্ড ↑। বিভিন্ন উচ্চতায় ও প্রাকৃতিক কারণে এই বায়ুমণ্ডলীয় চাপের কিছু হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে।
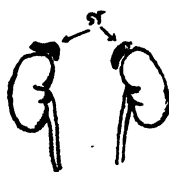
অ্যাড্রিনেলিন গ্ল্যাণ্ডস্ —দেহা-ভ্যন্তরস্থ মূত্রাশয় দুটার ঊর্দ্ধ-ভাগের নিকট-বর্তী (ছবিতে গ-চিহ্নিত) গ্রন্থিদ্বয়। এই গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের ↑ মধ্যস্থ মেডুলা

অ্যাড্রিনেলিন গ্ল্যাণ্ডস্

থেকে সময় সময় অ্যাড্রিনেলিন নামক এক প্রকার হর্মোন ↑ নির্গত হয়ে রক্তে মিশে যায়। অকস্মাৎ ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি উত্তেজনার ফলে এই রস-নিঃসরণ ঘটে।

অ্যান্থ্রোপোলজি — মানবজাতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান : মানব বংশের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ তথ্য বিষয়ক বিজ্ঞান।

অ্যান্হাইড্রাইড্—নিরুদক পদার্থ; যে সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে ওয়াটার-অব ক্রিষ্ট্যালিজেসন ↑ থাকে, উত্তাপ প্রয়োগে তা থেকে জল বিমুক্ত করলে সেই সব পদার্থের অ্যান্হাইড্রাইড তৈরী হয় : যেমন, নীল স্ফটিকাকার তুঁতে (ব্লুভিট্রিয়ল ↑) উত্তপ্ত করলে তার ওয়াটার-অব-ক্রিষ্ট্যালিজেসন চলে গিয়ে যে সাদা গুঁড়া পড়ে থাকে তাকে বলে তুঁতের অ্যান্হাইড্রাইড্। আবার বলা যায়, কোন পদার্থের অ্যান্হাইড্রাইড্ হোল সেই পদার্থ, যা জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে উক্ত পদার্থটি উৎপন্ন হয় ; যেমন, সালফার-ট্রাই-অক্সাইড ↑ (SO_3) গ্যাস হোল সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) অ্যান্হাইড্রাইড।

অ্যাণ্টিনা—(1), শুঙ্গ, শোঁয়া। কীট পতঙ্গের সূক্ষ্ম অঙ্গবিশেষ ; জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ। (২) রেডিও গ্রাহকযন্ত্রের অ্যারিয়াল বা আকাশ-তার, যার মাধ্যমে বেতার-তরঙ্গ যন্ত্রে পৌছায়।

অ্যান্থ্রাক্স — এক রকম জীবাণু-ঘটিত মারাত্মক পশু-রোগ ; বিশেষতঃ ভেড়ার চামড়া ও পশম থেকে এই রোগের ব্যাসিলাস ↑ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। এজন্যে এই রোগ উল-সর্টাস্ ডিজিজ্ নামেও পরিচিত। এর জীবাণুগুলোকেও অ্যান্থ্রাক্স বলে।

অ্যানথ্রাক্স

অ্যান্থ্রাসাইট্—এক শ্রেণীর শক্ত কয়লা : এতে কার্বনের ভাগ অনেক বেশী, সামান্য কিছু হাইড্রোকার্বনও ↑ মিশ্রিত থাকে। সাধারণ কয়লার চেয়ে এর তাপ-শক্তি অনেক বেশী।

অ্যাণ্টি-পাইরেটিক—অ্যাস্পিরিন ↑ প্রভৃতি যে সব ভেষজ পদার্থ দেহের তাপ কমিয়ে দেয় ; এরূপ ঔষধকে ফেব্রিফিউজও বলা হয়।

অ্যাণ্টিমনি—একটা মৌলিক ধাতব পদার্থ—সাদা, স্ফটিকাকার, ভঙ্গুর। পারমাণবিক ওজন 121·76 ; সাংকেতিক চিহ্ন Sb (ষ্টিবিয়াম্) সাধারণতঃ অক্সাইড ও সালফাইড অবস্থায় খনিজ আকারে পাওয়া যায়। অ্যাণ্টিমনি সালফাইডকে

বাংলায় বলে রসাঞ্জন বা সুর্মা। ছাপার টাইপ তৈরীর কাজে সীসার সঙ্গে কিছু অ্যাণ্টিমনি মিশ্রিত করা হয় (টাইপ মেটাল ↑)।

অ্যাণ্টিবায়োটিক—বিভিন্ন শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক ছত্রাক বা জীবাণুরা যে-সব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে; যার প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ জীবাণু ধ্বংস হয়, বা তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে। জীবাণু-ঘটিত বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিক কার্যকরী ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি অনেক রকম অ্যাণ্টিবায়োটিক প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

অ্যাণ্টিডোট্—প্রতিবিষ বা বিষঘ্ন পদার্থ; যাতে কোনরূপ বিষক্রিয়া নাশ করে। এ রকম ঔষধে বিষের শক্তি রাসায়নিক উপায়ে প্রশমিত হয়, আবার অনেক সময় তাকে অদ্রাব্য করে ফেলে, যাতে সে-বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে আর প্রাণহানি ঘটাতে পারে না।

অ্যানাটমি—শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা; চিকিৎসা-শাস্ত্রের অংশ বিশেষ। দেহের অস্থি, মাংসপেশী প্রভৃতি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

অ্যানাল্জেসিক্ — বেদনানাশক ঔষধ। অ্যাস্পিরিন, অ্যাণ্টিপাইরিন প্রভৃতি নানা রকম অ্যানাল্জেসিক ঔষধ আছে; এসব খেলে দেহের আভ্যন্তরীণ সব রকম ব্যথা বেদনার উপশম হয়। আবার কোকেন ↑ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগে স্থানীয় বেদনা দূর হয়। এইরূপ সব ভেষজ পদার্থকেই সাধারণভাবে বলে অ্যানালজেসিক।

অ্যানালিসিস্—বিশ্লেষণ; রসায়ন বিদ্যায় যে সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থের উপাদানগত গুণ বা পরিমাণ নিরূপিত হয়। বিশ্লেষণের তৌলিক (গ্র্যাভিমেট্রিক), মাত্রিক (কোয়াণ্টিটেটিভ), আঙ্গিক (কোয়ালিটেটিভ) প্রভৃতি নানারকম ব্যবস্থা আছে।

অ্যানিরয়েড—শব্দার্থ হোল, তরল পদার্থবিহীন। এক রকম চাপমান যন্ত্রকে (ব্যারোমিটার ↑) বলে অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার। বায়ুর
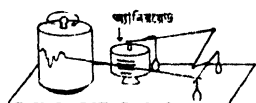
অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার

চাপ মাপবার জন্যে এই যন্ত্রে সাধারণ ব্যারোমিটারের মত পারদ বা অন্য কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। এ যন্ত্রে থাকে একটা ধাতু-নির্মিত বায়ুশূন্য চ্যাপ্টা পাত্র—দুদিকে ঢেউ খেলানো পাতলা ধাতব ঢাকনা। বায়ুমণ্ডলের চাপ কম বেশী

হলে ওই পাতলা ঢাকনাটা ওঠা-নামা করে। যান্ত্রিক কৌশলে ওই সামান্য ওঠা-নামার হার পরিবর্ধিত করে মাপা হয়—একটা কাঁটা ঘুরে যায় স্কেলের উপরে। ওই কাঁটা আবার একটা ঘূর্ণায়মান ড্রামের গায়ে রেখাপাত করেও বায়ুর চাপ নির্দেশ করতে পারে।

অ্যানিলিন্—অ্যা মি নো-বে ঞ্জি ন নামক একপ্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থের ব্যবহারিক নাম। কোল-গ্যাস ↑ উৎপাদনের সময় কয়লা থেকে যে আলকাতরা বেরোয় তা থেকে পাওয়া যায় বেঞ্জিন ↑। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেঞ্জিনকে নাইট্রোবেঞ্জিনে পরিবর্তিত করা হয়—তা থেকে আবার অ্যামিনো-বেঞ্জিন বা অ্যানিলিন তৈরী করা হয়। বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণহীন, কিন্তু বায়ুর সংস্পর্শে এর রং গাঢ় বাদামী হয়ে যায়। বিষাক্ত পদার্থ। নানা রকম রং, ঔষধ ও প্লাষ্টিক ↑ শিল্পে অ্যানিলিন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান।

অ্যানিমল-চারকোল— জীবজন্তুর হাড় বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে কয়লা তৈরী হয়। এতে থাকে 10% কার্বন, ও 90% ক্যালসিয়াম ফসফেট ↑ প্রভৃতি অজৈব পদার্থ। চিনি, লবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ বর্ণহীন সাদা ধব্ধবে করবার জন্তে এদের দ্রব এরূপ কয়লার ভিতর দিয়ে চুইয়ে ফিল্টার ↑ করে নেওয়া হয়।

অ্যানিলিং--উত্তপ্ত পদার্থ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা। পুড়িয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন ধাতব দ্রব্যাদি তৈরী করবার সময় ধাতুর আণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়ে যায়, কতকটা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। পদার্থের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আবার ফিরিয়ে আনবার জন্তে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কাঁচও অ্যানিল করা হয়—উপযুক্ত কৌশলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা (অ্যানিলিং) করে কাঁচকে টান-শূন্য করে তার সহজভঙ্গুরতা দোষ দূর করা হয়।

অ্যানেস্থেটিক্—যে সকল ঔষধ প্রয়োগে জীবদেহ অসাড় ও অনুভূতি শূন্য হয়। জীবদেহে এরূপ অ্যানে-স্থেসিয়া বা অসাড়তার ভাব স্থান-বিশেষে বা সমগ্রভাবে হতে পারে; যেমন, ক্লোরোফর্ম ↑ প্রয়োগে জীবদেহ সমগ্রভাবে অসাড় অচেতন হয়ে পড়ে. আবার কোকেন ↑ ইন্জেক্সন দিয়ে দেহের স্থানবিশেষ অনুভূতিশূন্য করা যায়। এ জাতীয় সব রকম ঔষধকেই অ্যানেস্থেটিক বলা হয়।

অ্যানোডাইন্—বেদনানাশক ঔষধ;

প্রয়োগে দেহের তাপ কমে, ব্যথা বেদনা দূর হয়। অ্যাস্পিরিন, ফেনা-সিটিন প্রভৃতি অ্যানালজেসিক্ ↑ আফিম, মর্ফিয়া, ক্লোরাল প্রভৃতি বিভিন্ন নার্কোটিক ↑ বা ঘুমের ঔষধ, বিভিন্ন অ্যানেস্থেটিক ↑ ঔষধ; এ সকলকেই সাধারণভাবে অ্যানো-ডাইন বলা হয়।

অ্যাপোথিক্যারিজ্ ওয়েট — ডাক্তারী ঔষধাদির ইংলণ্ডীয় মাপ; কঠিন ঔষধ পরিমাপের ওজন:

1 গ্রেণ = ·0648 গ্র্যাম
20 গ্রেণ = 1 স্ক্রুপল
24 গ্রেণ = 1 পেনিওয়েট
3 স্ক্রুপল = 1 ড্রাম (Drachm)
4 ড্রাম = 1 আউন্স ট্রয়

অ্যাপোথিক্যারিজ্ মেসার — তরল ঔষধাদির ইংলণ্ডীয় ডাক্তারী মাপ:—

1 মিনিম = ·0591 সি. সি. (1 ফোঁটা)
60 মিনিম = 1 ড্রাম = 3·55 সি সি.
8 ড্রাম = 1 আউন্স
= 28·41 সি. সি.
20 আউন্স (তরল) = 1 পাইন্ট
= 568 সি. সি,

অ্যাপার্চার—ছিদ্র-পথ; আলোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিতে যে ছিদ্রপথে আলোকরশ্মি প্রবেশ করান হয়।

অ্যাপেণ্ডিক্স্ — বৃহদন্ত্রের ডান-দিকস্থ ঊর্ধ্বমুখী কোলন ↑ অংশের নিম্নভাগে সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটা বদ্ধমুখ নল; কোলনের সঙ্গে এটা বোঁটার মত লেগে আছে। এর প্রদাহ ও স্ফীতিজনিত রোগকে বলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্।

অ্যাপেণ্ডিক্স্

অ্যাব্সোলিউট্ অ্যালকোহল—প্রায়-নিরুদক কোহল। বিশুদ্ধ ও তীব্র ইথাইল অ্যালকোহল ↑, যাতে প্রায় 99% কোহলের ভাগ বর্তমান, জল মোটামুটি 1% মাত্র থাকে।

অ্যাব্সোলিউট জিরো—সম্ভাব্য সবনিম্ন তাপমাত্রা। সেণ্টিগ্রেড ↑ তাপমানের হিসেবে এই তাপ হোল -273^{0}; সেণ্টিগ্রেড মাপের মত অ্যাবসোলিউট্ মাপেও হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ব্যবধানকে 100 ডিগ্রিতে বিভক্ত করা হয়, কাজেই সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রিকে অ্যাব্সোলিউট ডিগ্রিতে (^{0}A বা ^{0}K) নিতে হলে তার সঙ্গে 273 যোগ করতে হয়।

অ্যাবারেসন — জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণের সময়ে বিভিন্ন কারণে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে যে দৃষ্টিভ্রম ঘটে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে

দর্শকের দৃষ্টিকোণ নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে; ফলে দৃশ্যতঃ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থানের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। গ্রহনক্ষত্রের আলোক-রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার ফলে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্সের মধ্য দিয়ে ওই আলোকরশ্মি প্রতিসরণের জন্যেও এরূপ দৃষ্টিভ্রম বা অ্যাবারেসন ঘটে থাকে।

অ্যাভোগেড্রোজ্-ল — বিজ্ঞানী-অ্যাভোগেড্রোর নির্ধারিত নিয়ম বা তথ্য। তথ্যটা হোল এই যে, একই তাপ ও চাপে সমান আয়তনের সকল গ্যাসের মধ্যেই সর্ব্বদা সমান সংখ্যক গ্যাসীয় অণু থাকবে।

অ্যাভয়ড্রুপয়েজ্ ওয়েট — ইংলণ্ডীয় বাজার ওজন:

437½ গ্রেণ = 1 আউন্স
= 283 গ্রাম

16 আউন্স বা
7000 গ্রেণ = 1 পাউণ্ড
14 পাউণ্ড = 1 ষ্টোন
2 ষ্টোন = 1 কোয়াটার
4 কোয়াটার = 1 হন্দর
20 হন্দর বা
2240 পাউণ্ড = 1 টন
(প্রায় 27 মণ)

অ্যাম্পিয়ার — তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপের একক; ফরাসী বৈজ্ঞানিক অ্যাম্পিয়ারের নামানুসারে। এক অ্যাম্পিয়ার মানে, সিলভার-নাইট্রেট দ্রবের মধ্যে যেটুকু তড়িৎ-প্রবাহে প্রতি সেকেণ্ডে ·001118 গ্র্যাম সিলভার বা রৌপ্য ইলেক্ট্রো-লিসিস্ ↑ প্রক্রিয়ায় পৃথক হয়ে যায়।

অ্যাম্পিউল — মুখবন্ধ ক্ষুদ্র কাঁচ-পাত্র, যার মধ্যে বিভিন্ন ঔষধের দ্রবণ

অ্যাম্পিউল

সংরক্ষিত করে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা দূর করা হয়।

অ্যামর্ফাস্— দানাযুক্ত বা স্ফটিকাকার নয় এমন; যে কঠিন পদার্থের কোন রকম নির্দিষ্ট আকারের দানা নেই, যেমন— কাঁচ, রজন, রাবার ইত্যাদি।

অ্যামাল্গাম্ — পারদ-সংকর; মার্কারি ↑ বা পারা সংযুক্ত মিশ্র ধাতু (অ্যালয় ↑)। প্রায় সব ধাতুর সঙ্গে পারদের ধাতু-সংকর হয়, কিন্তু লোহার সঙ্গে পারা মেশে না। স্বর্ণরেণু মিশ্রিত পাথর বা বালি থেকে অ্যামাল্গাম্ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ পৃথক করা যায়।

অ্যামাটল্ — বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ; 80% অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও 20% টি. এন. টি (T.N.T.) ↑ অর্থাৎ ট্রাইনাইট্রো-

টলুইন এর সংমিশ্রণে এই বিস্ফোরক প্রস্তুত হয়।

অ্যামাইড — অ্যামাইন ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ; অ্যামোনিয়া ↑ সংযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন যৌগিক। কোন জৈব অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল দিয়ে অ্যামোনিয়ার (NH_3) এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্যুত করে যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ গঠিত হয়; যেমন— অ্যাসিট্যামাইড, CH_3CONH_2

অ্যাম্ফিবিয়া — জীব সৃষ্টির ক্রম-বিকাশের ধারায় মৎস্য ও সরীসৃপের মাঝামাঝি পর্যায়ের প্রাণী, যেমন — ব্যাং, শামুক, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর জীব।

অ্যাম্ফিবিয়া

অ্যামিথিষ্ট — বেগুনী রং-এর এক রকম বালুকা-প্রস্তর বা কোয়ার্টজ ↑। স্ফটিকাকার উজ্জ্বল প্রস্তর বিশেষ— অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক (SiO_2) সিলিকন অক্সাইড ↑ ।

অ্যাম্মিটার — বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র-বিশেষ; যান্ত্রিক কৌশলে এর সাহায্যে অ্যাম্পিয়ার ↑ এককে তড়িৎপ্রবাহ মাপা হয়।

অ্যামিবা — এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু। এক-কোষী প্রাথমিক জীব; প্রস্থে এরা এক ইঞ্চির প্রায় একশ ভাগের এক ভাগ। একটা থেকে দুটা, দুটা থেকে চারটা, এভাবে নিজ দেহ

অ্যামিবা

ভেঙ্গে ভেঙ্গে এরা বংশ বৃদ্ধি করে। এদের দেহ জেলির মত থল্‌থলে পদার্থে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অংশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এরা এগিয়ে চলে।

অ্যামোনিয়া—এক রকম উগ্র গন্ধ-বিশিষ্ট গ্যাস, জলে দ্রবনীয়। হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। আণবিক সূত্র NH_3; এর দ্রবে থাকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড, NH_4OH; ক্ষারধর্মী পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়। কয়লা থেকে কোল-গ্যাস ↑ তৈরীর সময় অতিরিক্ত হিসেবেও প্রচুর অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। জমির সার ও বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী

করার কাজে যথেষ্ট দরকার। শীতল কক্ষ বা রেফ্রিজারেটর ↑ যন্ত্র তৈরী করতেও অ্যামোনিয়া লাগে।

অ্যারোগ্রাফ — জিনিসপত্রে রং করবার এক রকম যন্ত্রবিশেষের ব্যবহারিক নাম। এর সাহায্যে বিভিন্ন জিনিসের উপর সমানভাবে রং-এর পাতলা আস্তরণ দেওয়া যায়। এর সূক্ষ্মাগ্র-মুখে তরল রং বাষ্পাকারে নির্গত হয়। এর 'ব' নল পথে বাতাস প্রবেশ করান হয়, তার চাপে 'ন' ছিদ্রপথে রং বেরিয়ে জিনিসে লাগে।
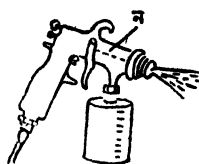
অ্যারোগ্রাফ

অ্যাল্‌কেমি — প্রাচীন যুগের কিমিয়া বা রসায়নবিদ্যা। সেকালে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে) এক শ্রেণীর তথাকথিত বিজ্ঞানী যে-সব কৌশলে প্রধানতঃ নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই অ্যাল্‌কেমিষ্টরা রসায়নবিদ্যার সঙ্গে নানা রকম তন্ত্রমন্ত্র, যাদুবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সব মিশিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে 'জীবন-রসায়ন' ও 'পরশ-পাথর' আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু ও ব্যবস্থার বিশেষ যোগাযোগে মানুষের ব্যাধি-শূন্য দীর্ঘজীবন লাভ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করার উপায় বার করাই ছিল তাঁদের কাম্য। ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটতে এঁদের এই উদ্ভট প্রচেষ্টা অবাস্তব প্রতিপন্ন হয় এবং অ্যাল্‌কেমি যুগ শেষ হয়।

অ্যাল্‌কালি — ক্ষারধর্মী পদার্থ-সমূহ; কতকগুলো ধাতুর হাইড্রক্সাইড ↑, জলে দ্রবনীয়। অ্যাল-কালি পদার্থগুলি অ্যাসিডের শক্তি প্রশমিত করে, রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লিথিয়াম ↑ প্রভৃতিকে বলে অ্যালকালি ধাতু—এদের হাইড্রক্সাইডই হোল অ্যালকালি।

অ্যাল্‌কালয়েড্ — বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে যে-সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। নিকোটিন ↑, কুইনিন ↑, কোকেন ↑, মর্ফিন ↑ প্রভৃতি এরূপ উদ্ভিদজাত অ্যাল-কালয়েড। এদের সকলের মধ্যেই নাইট্রোজেন ↑ থাকে, আর এরা অ্যালকালি বা ক্ষারধর্মী হয়। জীব-দেহের উপর এদের বিশেষ বিশেষ ভেষজ গুণ প্রকাশ পায়।

অ্যালয় — সংকর ধাতু; দুই বা ততোধিক ধাতুর সংমিশ্রণে যে মিশ্র ধাতু তৈরী হয়। কখন কখন বিভিন্ন ধাতুর যৌগিক মিলন ঘটিয়ে, কখন

বা কেবল মাত্র সংমিশ্রণে সংকর ধাতু সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধাতুর কাঠিন্য বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধির জন্যে এরূপ করা হয়।

অ্যালবুমেন্ — প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ; যা ডিমের শ্বেত-অংশে বা প্রাণীদেহের বিভিন্ন বস্তুতে বর্তমান। আবার বিভিন্ন শস্যবীজেও বিভিন্ন অ্যালবুমেন্ রয়েছে—গম, রাই, বার্লি প্রভৃতিতে লুকোসিন নামে; মটর, সয়াবিন প্রভৃতিতে লিগো-মেলিন নামে পরিচিত বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যালবুমেন্ আছে।

অ্যালাম্ — ফিট্‌কিরি; পটাসিয়াম সালফেট্ ও অ্যালুমিনিয়াম সালফেট্ মিলে 24টি জলীয় অণু নিয়ে এর উৎপত্তি, (K_2SO_4 $Al_2(SO_4)_3$. $24H_2O$) ; একে পটাস্ অ্যালাম বলা হয়। স্ফটিকাকার, জলে দ্রবনীয়। এর সাহায্যে জলের ময়লা থিতিয়ে পড়ে। রঞ্জক পদার্থ, অগ্নিনিরোধক দ্রব্য ও অন্যান্য নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করতে এর দরকার হয়। সাধারণতঃ অ্যালাম বলতে পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট্ বুঝালেও রাসায়নিক হিসেবে একই গঠনের বিভিন্ন লবণ (সল্ট ↑) মিলিত হয়ে যে স্ফটিকাকার যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় তাকেই বলে অ্যালাম; যেমন, ফেরিক-অ্যালাম, ক্রোম-অ্যালাম ↑ ইত্যাদি।

অ্যালাম্

অ্যালুমিনিয়াম্—মৌলিক ধাতু; সাদা, হাল্‌কা ও উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Al; পারমাণবিক ওজন 26·97, পারমাণবিক সংখ্যা 13; প্রধানতঃ বক্সাইট নামক এক রকম খনিজ থেকে নিষ্কাশিত হয়। হাল্‌কা বলে অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন ধাতু-সংকর নানা কাজে, বিশেষতঃ বিমানপোত তৈরী করতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামে গৃহস্থালীর নানা রকম তৈজসপত্র ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি তৈরী হয়।

অ্যালুমিনা— অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3; বক্সাইট ↑, কোরাণ্ডাম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে প্রাকৃতিক অবস্থায় থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম্-ব্রাস্—পিতল বা ব্রাস্ প্রধানতঃ তামা ও দস্তার সংকর-ধাতু—এর সঙ্গে সামান্য অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে এই বিশেষ সংকর ধাতুটা তৈরী হয়।

অ্যালুমিনিয়াম্-ব্রোঞ্জ—ব্রোঞ্জ প্রধানতঃ তামা ও টিনের সংকর ধাতু; এর সঙ্গে সামান্য (4% থেকে 13%) অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে যে সংকর-ধাতু তৈরী হয়।

অ্যাস্‌কর্বিক অ্যাসিড—ভিটামি-সি নামে পরিচিত একটি খাদ্য-প্রা। সাদা, ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। বিভিন্ন ফল ও তাজা শাকসব্জিতে পাওয়া যায় (ভিটামিন ↑)।

অ্যাসিটোন — তরল রাসায়নি পদার্থ, CH_3COCH_3; বর্ণহী, দাহ্য, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। স্ফুটনাং 56·5° সেন্টিগ্রেড। একে কখ কখন ডাই-মিথাইল কিটোন-ও বলা হয়। উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় লাগে, বিশেষতঃ সেলুলোজ-অ্যাসিটে রেয়ন ↑, বা কৃত্রিম রেশম তৈরী জন্যে এর বিশেষ প্রয়োজন। চা ও রঞ্জন জাতীয় পদার্থ অ্যাসিটোনে গলে যায়।

অ্যাসিটিক অ্যাসিড — বর্ণহী তরল অম্লপদার্থ; রাসায়নিক সূ CH_3COOH, ভিনিগারের ↑ মধ্যে পাওয়া যায় বলে একে ভিনিগার-অ্যাসিডও বলা হয়। উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে জমে যায়, তখন একে গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড বলে। বিবিধ রাসায়নিক শিল্পে এর যথেষ্ট দরকার। বিভিন্ন ধাতবপদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন অ্যাসিটেট্ সল্ট ↑ তৈরী হয়; যেমন—লেড্ অ্যাসিটেট্, যাকে সুগার-অব-লেড বলে, রঞ্জন-শিল্পে যথেষ্ট দরকার হয়। কৃত্রিম রেশম (অ্যাসিটেট্-সিল্ক ↑) শিল্পে অ্যাসিটিক অ্যাসিড একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান।

অ্যাসিটিলিন—বর্ণহীন, দাহ্য, বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ, C_2H_2 ; গ্যাসটা জ্বালালে উজ্জ্বল আলো ছড়ায়। সাধারণ কার্বাইড ↑ গ্যাস-বার্ণারে এই অ্যাসিটিলিন গ্যাসই জ্বলে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে ↑ জল দিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে গ্যাসটা উৎপন্ন হয়; $CaC_2 + 2H_2O =$ C_2H_2 (অ্যাসিটিলিন) + $Ca(OH)_2$ (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑ বা চূণ)। ওয়েল্ডিং-এর কাজে অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম ↑ সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজন হয়।

অ্যাসিটেট্ সিল্ক—কৃত্রিম রেশম; আজকাল রেয়ন ↑ নামে পরিচিত। তুলা, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি সেলুলোজ জাতীয় পদার্থের উপর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক রকম সাদা নরম পদার্থের সৃষ্টি হয়; পদার্থটা হোল সেলুলোজ অ্যাসিটেট ↑। যন্ত্রের সাহায্যে এ-থেকে সূক্ষ্ম সূত্র তৈরী হয় এবং সেই সূতায় রেশমের মত বস্ত্রাদি বোনা হয়। এই হোল কৃত্রিম রেশম, বা আর্টিফিশিয়াল সিল্ক।

অ্যাসিড—অম্ল, তেজাব (হিন্দি);

কোন ধাতুর সংস্পর্শে যে-পদার্থের হাইড্রোজেন পরমাণু বিমুক্ত হয়ে যায়, আর ওই ধাতুর পরমাণু তার স্থান অধিকার করে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ অ্যাসিডের স্বাদ অম্ল; এর সংস্পর্শে বিভিন্ন বস্তু ক্ষয়ে যায়। যে কোন অ্যাসিড লাগলে নীল-লিট্‌মাস্ নামক রাসায়নিক পদার্থ লাল হয়ে যায়। অ্যাসিড মাত্রেই হাইড্রোজেন অণু থাকে। এর জলীয় দ্রবে ওই হাইড্রোজেন আয়নায়িত হয়ে পড়ে, এবং কোন ধাতব বেসের ↑ সংস্পর্শে সহজেই বিমুক্ত হয়ে বিভিন্ন সল্টের ↑ উৎপত্তি ঘটে।

অ্যাসিড-সল্ট—অ্যাসিডের সঙ্গে কোন ধাতুর যৌগিক মিলনে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বা সল্ট ↑ তৈরী হয়। যদি অ্যাসিডের সবটা হাইড্রোজেন-অণু বিমুক্ত না হয়ে কিছু হাইড্রোজেন ওই সল্টে থেকে যায়, তবে তাকে বলা হয় অ্যাসিড-সল্ট; যেমন, $NaHCO_3$, সোডিয়াম বাইকার্বনেট।

অ্যাস্ট্রোনমি —জ্যোতির্বিদ্যা; গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি প্রকৃতি, অবস্থান ও অবস্থাদি সম্পর্কীয় পর্যবেক্ষণ-লব্ধ বিবিধ তথ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়।

অ্যাষ্টারয়েড্‌স্ — গ্রহ-পুঞ্জ; মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের অক্ষ-পথের মধ্যবর্তী একটি নির্দিষ্ট কক্ষে প্রায় দেড় হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ এক সঙ্গে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এদের বলে অ্যাস্টারয়েড্‌স বা গ্রহ-পুঞ্জ। এগুলোর কোনটারই ব্যাস 300 মাইলের বেশী নয়।

অ্যাষ্টিগ্‌মেটিজম্ — চোখের বা কোন লেন্সের উপরিভাগের বক্রতা প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ার জন্যে যে দৃষ্টিদোষ ঘটে। এরূপ লেন্সে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি বিভিন্ন ফোকাসে ↑ সংহত হয়, এ-জন্যে দৃষ্ট বস্তু এব্‌ড়ো থেব্‌ড়ো দেখায়; এই ত্রুটিকে বলে অ্যাষ্টিগ্‌মেটিজম্। চোখের এরূপ দোষ সিলিণ্ড্রিক্যাল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে দূর করা হয়।

অ্যাস্পিরিন—সাদা কঠিন পদার্থ; রাসায়নিক নাম অ্যাসিটাইল-সেলিসাইলিক অ্যাসিড। 133^{0} সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়। বেদনানাশক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এর অ্যানাল্‌জেসিক্ ↑ ও অ্যান্টিপাইরেটিক ↑ উভয় গুণই বিশেষভাবে বর্তমান।

অ্যাস্‌ফ্যাল্ট—আল্‌কাতরার মত কালো আঠাল এক রকম পদার্থ; এর প্রধান উপাদান হোল বিটুমেন্। সাধারণ কথায় একে

বলে পিচ্; সহরের রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। অনেক হ্রদের তলায় ও কোন কোন স্থানে চুনা-পাথর ও বেলে-পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় অ্যাস্ফ্যাল্ট প্রচুর পাওয়া যায়।

অ্যাস্বেস্টস্ — এক শ্রেণীর সিলিকেট ↑ পদার্থের বিশেষ নাম; প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট ও অন্যান্য ধাতব সিলিকেট বা বালুকাদির মিলনে উৎপন্ন একটা রাসায়নিক পদার্থ। জিনিসটা অদাহ্য বলে অগ্নি-নিরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আঁসযুক্ত জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে নানা আকারের অদাহ্য অ্যাস্বেস্টস্ সিট্ তৈরী হয়ে থাকে।

অ্যাষ্টেটিক্ কয়েলস্ — বৈদ্যুতিক তার-কুণ্ডলীর এক রকম ব্যবস্থা; সূক্ষ্ম তড়িৎ-যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। এর জন্যে একটা ধাতব তার-কুণ্ডলী এমনভাবে স্থাপিত হয় যাতে ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে যে চৌম্বক-শক্তি উৎপন্ন হয়, তা আবার নিকটস্থ কোন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীত শক্তির প্রভাবে পরস্পর শক্তিশূন্য হয়ে পড়ে।

আ

আইডোফর্ম — বীজঘ্ন রাসায়নিক পদার্থ; হলদে, স্ফটিকাকার কঠিন বস্তু। একটা বিশেষ তীব্র গন্ধের জন্য পরিচিত। বীজাণু-প্রতিরোধক হিসেবে ক্ষতস্থানে লাগান হয়।

আই-পিস্— অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রে দর্শকের চোখের কাছে যে লেন্স ↑ সংলগ্ন থাকে। অব্জেকটিভ্ ↑ লেন্সের ভিতর দিয়ে দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব এসে আই-পিসের মধ্য দিয়ে বর্ধিতাকারে দর্শকের চোখে প্রতিফলিত হয়।

আইয়োডিন্—গাঢ় ধূসর বর্ণের কঠিন মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 126·92, পারমাণবিক সংখ্যা 53; উদ্বায়ী পদার্থ, হাওয়ায় উন্মুক্ত রাখলে বেগুনী রংয়ের ধূমে পরিণত হয়ে উবে যায়। জলে প্রায় গলে না; কিন্তু অ্যাল-কোহলে ↑ সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়— এই দ্রবকে বলে টিংচার-আইয়োডিন, যা কাঁটা-ছেড়ায় জীবাণু প্রতিরোধক হিসেবে লাগান হয়। বিভিন্ন সামুদ্রিক গুল্মে ও চিলি সল্ট-পিটার ↑ নামক একটি খনিজে এর যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়, এবং তা থেকে বিশুদ্ধ আইয়োডিন পৃথক করা হয়। বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে এর যৌগিক মিলনে বিভিন্ন

আইয়োডাইড্ সল্ট সৃষ্টি হয়। অনেক খাদ্যবস্তুতে সামান্য আইয়োডিন থাকে; খাদ্যে এর অভাবে গলগণ্ড রোগ জন্মে। বিভিন্ন আইয়োডাইড সল্ট ঔষধ হিসেবে ও আলোকচিত্র শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আইস্—বরফ; জলের কঠিন অবস্থা। তাপ হ্রাস পেয়ে 0° ডিগ্রি সেণ্টি-গ্রেডে ↑ নেমে এলে জল জমে বরফ হয়ে যায়। জল জমলে আয়তনে বাড়ে—কাজেই হাল্‌কা হয়ে বরফ জলের উপর ভেসে থাকে; নীচের জলে জলচর জীব স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করে বেঁচে থাকতে পারে। শীতপ্রধান অঞ্চলের স্বাভাবিক তাপে বরফ সৃষ্টি হয়, আবার রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও বরফ তৈরী করা যেতে পারে।

আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার্—এক রকম প্রস্তর বিশেষ; স্বচ্ছ স্ফটিকাকার ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট ↑। পদার্থটির একটা বিশেষ গুণ এই যে, এর মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হলে আলোক-রশ্মি পোলারাইজ্‌ড্ ↑ হয়, অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গ-স্পন্দন সব একমুখী হয়ে পড়ে। আলোক-তরঙ্গের এই গতিনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে বলে পোলারাইজিং এফেক্ট। আইস্‌ল্যাণ্ড স্পারের মধ্যে আবার আলোকরশ্মির একাধিক প্রতিসরণও হয়ে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে যন্ত্রাদিতে এটা ব্যবহৃত হয়।

আইস্‌ল্যাণ্ড স্পার্

আইস-পয়েণ্ট — বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে ঠিক যে-তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হতে সুরু করে; অন্য কথায় বলা যায়, যে তাপ-মাত্রায় (টেম্পারেচার ↑) বরফ গলতে সুরু করে। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (ব্যারোমিটার ↑) এই তাপমাত্রা হোল 0 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড ↑।

আইসোটোপ্ — বিশেষ অবস্থায় কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতকগুলো পরমাণুর ওজন বদলে যায়, অথচ পারমাণবিক সংখ্যা সমান থাকে, এরূপ পরমাণুকে ওই মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলে। আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে ওই মৌলিক পদার্থের মতই থাকে। একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পার-মাণবিক ওজনের বিভিন্ন আইসো-টোপ হতে পারে। পরমাণুর কেন্দ্রীনের নিউট্রন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয়।

যে-সব পরমাণুর কেন্দ্রীনে সমসংখ্যক নিউট্রন থাকে তারা একই শ্রেণীর আইসোটোপ। অনেক স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের মধ্যে তার বিভিন্ন আইসোটোপ মিশ্রিত থাকতে পারে; বিভিন্ন কৌশলে আইসোটোপ তৈরীও করা যেতে পারে।

আইসোটোপিক ওয়েট—অক্সিজেন গ্যাসের আইসোটোপের ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন তুলনা করা হয়। কোন আইসোটোপের এই তুলনামূলক পারমাণবিক ওজনকে বলে আইসোটোপিক ওয়েট। এই ওজন প্রায়ই পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; একে আইসোটোপের মাস্ ↑ বা ভর সংখ্যাও বলে।

আইসোট্রন্—যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে কোন পদার্থ থেকে তার হালকা ও ভারী বিভিন্ন প্রকার আইসোটোপ ↑ সব পৃথক করা সম্ভব হয়।

আইসোট্রপিক — যে-সব পদার্থের শক্তি বা ধর্ম (তাপের তারতম্যে আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা প্রভৃতি) সর্বত্র সব দিকেই সমান; যেমন—কাঁচকে বলা হয় আইসোট্রপিক পদার্থ, কিন্তু কাঠ আইসোট্রপিক নয়।

আইসোপোডা—সামুদ্রিক জীবের এক বিশেষ শ্রেণী; ক্ষুদ্র থলথলে দেহ, বাইরে কোন কঠিন খোলা বা আবরণ নেই।

আইসোবার—আবহাওয়া-নির্দেশক মানচিত্রে যে সকল রেখা টেনে অনুরূপ বায়বীয় (বায়ুমণ্ডলের) চাপবিশিষ্ট স্থানসমূহ যোগ করে দেখান হয়।

আইসোবার্স্ — সমান পারমাণবিক ওজনের বিভিন্ন পরমাণুর আইসোটোপ ↑, অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমগোত্রীয় আইসোটোপ। এদের পারমাণবিক সংখ্যা (অ্যাটমিক নাম্বার) বিভিন্ন, কিন্তু আইসোটোপিক ওয়েট ↑ সমান; যেমন, টিন ধাতুর একটা আইসোটোপ হোল $_{50}Sn^{115}$, আর, ইণ্ডিয়াম ↑ ধাতুর একটা আইসোটোপ $_{49}In^{115}$; কাজেই এদের বলা হয় আইসোবার্স্। এখানে 115 হোল পারমাণবিক ওজন, আর 50 ও 49 হোল পারমাণবিক সংখ্যা।

আইসোথার্ম — আবহাওয়া-নির্দেশক মানচিত্র বা নক্সায় একই তাপবিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান যে সকল রেখা টেনে দেখান হয়। এদের আইসোথার্মাল লাইনও বলে।

আইসোমর্ফিজম্ — একই রূপ

রাসায়নিক গঠন ও কেলাসন (দানাবাঁধা) থাকার অবস্থা; কৃষ্টালিজেসনে ↑ এই সাম্যভাব যে পদার্থের সর্বত্র একই রূপ থাকে তাকে বলে আইসোমর্ফাস পদার্থ; যেমন, ফিটকারি বা অ্যালাম ↑ হোল আইসোমর্ফাস।

আইসোমার — যে সব রাসায়নিক পদার্থের অণুগুলো সমান সংখ্যক বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত হয়েও সেই পরমাণুগুলোর সংস্থান বা পরস্পর সংযোগের বিভিন্নতার [illegible] বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট হয়, তারা পরস্পরের আইসোমার। যেমন, অ্যামোনিয়াম সায়েনেটের ↑ আণবিক সূত্র হোল NH_4CNO, আবার ইউরিয়া ↑ হোল $CO(NH_2)_2$; এরা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমান সংখ্যক পরমাণু-বিশিষ্ট হয়েও পারমাণবিক সংস্থানের বিভিন্নতার জন্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন [illegible]তীয় পদার্থ হয়েছে। এরা হোল [illegible]স্পর পরস্পরের আইসোমার। অণুর গঠনে পরমাণুর এরূপ সংস্থান বৈচিত্র্যকে বলে **আইসোমেরিজম্**।

আফ্‌টার-ড্যাম্প—মিথেন্ (CH_4) গ্যাসকে বলে ফায়ার-ড্যাম্প ↑; কয়লার খনিতে এই মিথেন গ্যাস উঠে যে বিস্ফোরণ ঘটায় তাতে কার্বন-মনক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব হয়। বিস্ফোরণের ফলে খনির গহ্বরে উৎপন্ন এই সব বিষাক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণকে বলে আফ্‌টার ড্যাম্প।

আম্ব্রা — আলোকরশ্মি কোন অস্বচ্ছ পদার্থে বাধা পেলে ওই বাধার পশ্চাদ্ভাগে একটা গাঢ় ছায়া পড়ে। এই ছায়ার চারধারে আঁধা অন্ধকার দেখায়।

আম্ব্রা
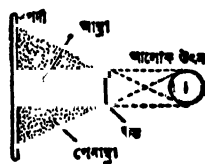
মাঝখানের গাঢ় অন্ধকার অংশকে বলে আম্ব্রা, আর চার ধারের স্বল্প আলোকিত অংশকে বলে পেনাম্ব্রা।

আয়ন — তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বা পরমাণু-সমষ্টি। কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের চারদিকে যতগুলি ইলেকট্রন ↑ (অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ↑) থাকলে তা বৈদ্যুতিক-সমতা লাভ করে তার চেয়ে কম সংখ্যক ইলেক্ট্রন থাকলে ওই পরমাণু হয় ধন-তড়িৎ সম্পন্ন আয়ন; ওই ইলেক্ট্রন সংখ্যা আবার বেশী হলে সৃষ্টি হয় ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন আয়ন কণিকা। নানাভাবে ইলেক্ট্রন কণিকার সংখ্যার এরূপহ্রাস-বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বা পরমাণু সমষ্টি আয়নায়িত হয়ে পড়ে। হাইড্রোজেন ↑ পরমাণুর

ইলেক্‌ট্রন কণিকাটি সরিয়ে দিলে যে প্রোটন ↑ কণিকা থাকে তাই হোল হাইড্রোজেন-আয়ন। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণ করলে, রঞ্জন-রশ্মি ↑, গামা-রশ্মি ↑ প্রভৃতি চালালে ওই গ্যাসীয় পরমাণুগুলো আয়নায়িত হয়ে ওঠে।

আয়নোস্ফিয়ার—ভূ-পৃষ্ঠের মোটামুটি 30 থেকে 250 মাইল উচ্চে অবস্থিত আয়নায়িত বায়বীয় স্তর। সূর্যকিরণের আলট্রা-ভায়োলেট ↑ রশ্মির প্রভাবে এই স্তরের বায়ুকণিকাগুলো তড়িতাবিষ্ট (আয়নায়িত) অবস্থায় থাকে। এর ফলে এই স্তরে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ক্রমাগত ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ সম্ভব হয়ে থাকে। পৃথিবীর অ্যাট্‌মস্ফিয়ারের ↑ এই বায়ুস্তরকে হেভিসাইড-লেয়ারও ↑ বলে।

আয়রন — লৌহ; কঠিন মৌলিক ধাতব পদার্থ। পারমাণবিক ওজন 55·85, পারমাণবিক সংখ্যা 26; চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষাকৃত নরম; বিভিন্ন কৌশলে একে সুকঠিন ও কার্যক্ষম করা হয়। কার্বন বা অন্য কোন ধাতব পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করলে এর এই বৈশিষ্ট্য জন্মায় (স্টিল ↑)। কাঁচা লোহার তৈরী জিনিসকে টেম্পার ↑, অর্থাৎ পান দিয়েও তার কাঠিন্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পরিমাণ মত কার্বন ↑ মিশিয়ে লোহাকে কঠিন ইস্পাতে পরিণত করা হয়। ম্যাগ্নেটাইট্ ↑ হেমাটাইট্ ↑, পাইরাইটস্ প্রভৃতি লৌহ-মিশ্রিত বিভিন্ন খনিজ-পাথর ব্ল্যাষ্ট-ফার্নেসে ↑ গলিয়ে নানা কৌশলে লোহা নিষ্কাশিত হয়। লোহার ল্যাটিন নাম ফেরাম, সাংকেতিক চিহ্ন তাই Fe. বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিভিন্ন রকম লোহা ব্যবহৃত হয়, যেমন—পিগ্-আয়রন, রট-আয়রন, কাষ্ট-আয়রন ↑ ইত্যাদি।

আয়রন-লাংস — ফুস্‌ফুস্ অকেজো হয়ে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলে যে-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটা হোল, বাই রের র বা স স্পর্ক শূ
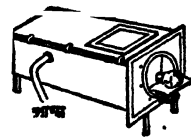
আয়রন লাংস

একটা সুদৃঢ় বাক্সের মত, মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটিত রোগীকে বিশেষ ব্যবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়, মাথাটি অবশ্য বাইরে থাকে ওই বাক্সের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ যান্ত্রিক কৌশলে (পাম্পের সাহায্যে) পর্যায়ক্রমে বাড়ান কমান হয়

ফলে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় যেমন হয়, তেমনভাবেই রোগীর ফুস্‌ফুস্‌টা সংকুচিত প্রসারিত হতে থাকে, বাইরের বাতাস নাসিকা পথে দেহ মধ্যে প্রবেশ করে ও বেরিয়ে আসে। এভাবে সহজেই রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে। এ যন্ত্রটাকে আবার 'ড্রিঙ্কার অ্যাপারেটাস'ও বলে।

আর্ক (জ্যামিতিক)—বৃত্তের পরিধির যে কোন অংশ।

আর্ক (বৈদ্যুতিক) — সামান্য ব্যবধানে রক্ষিত দুটী তড়িৎ-দ্বারের (ইলেক্ট্রোড ↑) মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে যে সুতীব্র বৈদ্যুতিক আলো পাওয়া যায়। এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এর তড়িৎ-দ্বার দুটি সাধারণতঃ হয় কার্বনের তৈরী। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বাষ্পীভূত কার্বন কণিকার ধারা উভয় তড়িৎ-দ্বারের মধ্যস্থ ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। এই কার্বন বাষ্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চলাচল করার ফলে কার্বন কণিকাগুলো তড়িতাবিষ্ট হয়ে ওই তীব্র আলোক ও উত্তাপের সৃষ্টি করে। এভাবে কোন কোন ধাতু-নির্মিত তড়িৎ-দ্বারের মধ্যেও আর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে।

আর্ক-ল্যাম্প—তীব্র আলোক সৃষ্টির জন্যে বৈদ্যুতিক আর্কের ব্যবহারিক প্রয়োগে যে এক রকম বাতি তৈরী করা হয়। সাধারণতঃ কার্বন আর্কেরই বাতি হয়ে থাকে। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্বন দণ্ড দুটির ব্যবধান বাড়িয়ে কমিয়ে আলোর তীব্রতাও হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। পারদের সাহায্যেও এক রকম আর্ক-ল্যাম্প তৈরী হয়—এতে পারদই তড়িৎদ্বারের কাজ করে।

দর্পণ
আলোকরশ্মি
কার্বন ইলেক্ট্রোড
আর্ক-ল্যাম্প

আর্কিমিডিস্ প্রিন্সিপ্‌ল্ — তরল পদার্থের প্লবতা সম্পর্কে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কৃত তথ্য। তথ্যটা হোল এই যে, কোন তরল পদার্থের মধ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণ-ভাবে কোন বস্তু নিমজ্জিত করলে যতটা তরল পদার্থ স্থানচ্যুত হয়, তার ওজনের সমান ওজন সেই বস্তু দৃশ্যতঃ হারায়, নিমজ্জিত বস্তুটা হাল্‌কা মনে হয়। নিমজ্জিত বস্তুর আয়তনের সমান তরল পদার্থের ওজন ওই বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে কমে যায়। নিমজ্জিত বস্তুর উপরে তরল পদার্থের ঊর্দ্ধ চাপের ফলেই এরূপ ঘটে। একেই

বলে তরল পদার্থের প্লবতা বা বয়েন্‌সি ↑। কোন বস্তুর আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি এই তথ্যের সাহায্যে সহজেই নির্ণীত হয়ে থাকে।

আর্গ—বল-বিদ্যায় শক্তি পরিমাপের একক বিশেষ; শক্তি প্রয়োগে জড় পদার্থে যে কর্মক্ষমতা প্রকাশ পায় তার পরিমাপ। সি. জি. এস. মাপে এক ডাইন ↑ শক্তির প্রভাবে এক সেণ্টিমিটার দূর অবধি যে পরিমাণ কাজ নিষ্পন্ন হয় তাই হোল এক আর্গ।

আর্গন—একটি মৌলিক গ্যাস; বায়ুমণ্ডলে সামান্য ('93%) পরিমাণে আছে। গ্যাসটি নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ কোন পদার্থের সঙ্গেই এর রাসায়নিক মিলন ঘটে না (ইনার্ট গ্যাস ↑)। বিজলী বাতির বাল্‌ব কখন কখন এই গ্যাসে ভর্তি করা হয়।

আর্গল—ঈষৎ লালাভ স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ; এর প্রধান উপাদান হোল পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টার্টারেট। একে সাধারণ ভাবে টার্টার-ও বলা হয়। মদ্য প্রস্তুতের সময় মদ্যভাণ্ডের মধ্যে এই পদার্থ আপনা থেকে জমে।

আর্জেণ্টাইন — খনিজ সিলভার-সালফাইড, Ag_2S; রৌপ্য ও গন্ধকের একটি যৌগিক পদার্থ। সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই রৌপ্য নিষ্কাশিত হয়। একে সিলভার-গ্ল্যান্সও বলে। কোন ধাতুর সঙ্গে রৌপ্য মিশ্রিত থাকলে তাকে বলে আর্জেণ্টিফেরাস্ মেটাল।

আর্মেচার—বৈদ্যুতিক মোটর বা ডায়নামোতে ধাতব তার-জড়ানো যে যন্ত্রাংশ থাকে। একটা ধাতব দণ্ডের গায়ে বিশেষ ব্যবস্থায় সরু তারের অসংখ্য পাক জড়ানো থাকে। বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতিতে ওই তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সাধারণতঃ আর্মেচারটাই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে ঘুরতে থাকে।

আর্সেনিক—একটি মৌলিক পদার্থ, পারমাণবিক ওজন 74'91, পারমাণবিক সংখ্যা 33; সাংকেতিক চিহ্ন As; বিষাক্ত পদার্থ,—ধূসরবর্ণ, স্ফটিকাকার ও ভঙ্গুর। গন্ধকের সঙ্গে মিশে রিয়েলগার ↑ As_2S_2, অর্পিমেণ্ট, As_2S_3, প্রভৃতি নানা খনিজ পদার্থে এবং কখন কখন বিশুদ্ধভাবেও পাওয়া যায়। ঔষধ হিসেবে, কীটনাশক পদার্থ তৈরীর কাজে ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আল্‌পাকা — দক্ষিণ আমেরিকার এক জাতীয় লোমশ জন্তু: দেখতে

অনেকটা ভেড়ার মত, কিন্তু গলা লম্বা, দেহ সুচিক্কণ ঘন পশমে

আবৃত। এদের ওই লোমে তৈরী সূক্ষ্ম সূত্রে বোনা বস্ত্রাদিকেও আলপাকা বলা হয়।

আলপাকা

আলট্রা-ভায়োলেট-রে—এক রকম অদৃশ্য আলোকরশ্মি। সূর্য-রশ্মির বর্ণালীতে দেখা যায় পর পর সাজানো সাতটা বর্ণরেখা, এক-প্রান্তে ভায়োলেট বা বেগুনী ও অন্য প্রান্তে লাল। সাদা আলোকের সংগঠক বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এই সাতটা বর্ণরশ্মি আমরা দেখতে পাই (স্পেক্ট্রাম ↑)। বেগুনী-রশ্মির পরে যে অতিবেগুনী বা আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সৃষ্টি হয় তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এত কম (4×10^{-5} সেন্টিমিটার থেকে 5×10^{-7} সেন্টি-মিটার) যে, তা আর মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু এই অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে। সূর্যালোকের এই অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি মানুষের দেহে ভিটামিন-ডি সৃষ্টি করে, নানা রকম চর্মরোগ সারায়, এর আবার বিভিন্ন জীবাণু-নাশক শক্তিও আছে।

আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ — এক রকম বিশেষ ব্যবস্থার অণুবীক্ষণ যন্ত্র ; এর সাহায্যে সাধারণ মাই-ক্রোস্কোপে ↑ অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকাও বেশ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার দেখায়। এ দিয়ে বিশেষতঃ তরল পদার্থ পরীক্ষা করা হয়। ওই তরল পদার্থের মধ্যে একটা তীব্র আলোক-রশ্মি সংহত করা হয়, ফলে ওর মধ্যস্থ অতি ক্ষুদ্র
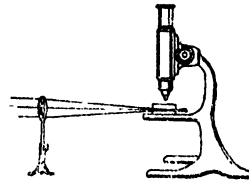
আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ

অদৃশ্য পদার্থ-কণিকা-গুলো বিচ্ছুরিত আলোকের প্রভাবে সাধারণ মাইক্রোস্কোপেই স্পষ্ট দেখা যায়। তরল পদার্থের মধ্যে এরূপ আলোক বিচ্ছুরণের এই প্রভাবকে বলে টিণ্ড্যাল-এফেক্ট ↑ ।

আলট্রা-ম্যারাইন—এক রকম নীল বর্ণের রঞ্জক পদার্থ। চীনামাটি, গন্ধক, সোডিয়াম সালফেট্ ইত্যাদি মিশিয়ে এ জিনিসটা প্রস্তুত করা হয়। রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচা কাপড়ের হলদে ছোপ ও চিনির স্বাভাবিক রং দূর করতে এই নীল রং অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

আলট্রাসোনিক ওয়েভ—যে শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে 30,000 বারের বেশী। এরূপ স্পন্দনের শব্দ-তরঙ্গ মানুষের শ্রুতি-গোচর হয় না (অডিবিলিটি লিমিট ↑)। একে সুপারসোনিক ↑ ওয়েভও বলে।

ই

ই ক্লি প্ স্ (লুনার)—চন্দ্রগ্রহণ; বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যখন সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে একই সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্যের আলো পৃথিবীতে আট্‌কে যায়, কাজেই পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে চন্দ্রকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। পূর্ণিমা রাতে চন্দ্রের উপর এই ছায়া দেখা যায়, একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। ব্যাপারটা নিছক আলোছায়ার খেলা মাত্র।

ইক্লিপ্‌স (সোলার) —সূর্যগ্রহণ;

ইক্লিপ্‌স
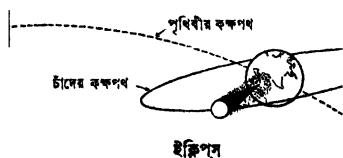
বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে একই সরল রেখায় এসে পড়ে, তখন সূর্য গ্রহণের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের ছায়ায় পৃথিবী থেকে সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সূর্য গ্রহণ বা আলোছায়ার এই ব্যাপার একই সময়ে একই রকম দেখা যায় না।

ইকোয়েটর (টেরেস্ট্রীয়াল) — ভূ-বিষুবরেখা; ভূপৃষ্ঠের কাল্পনিক নিরক্ষ রেখা; পৃথিবীর মেরু-দ্বয়ের সমদূরবর্তীভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে বৃত্তরেখার কল্পনা করা হয়েছে। ভৌগোলিক আলো-চনার সুবিধার জন্যে এই রেখার কল্পনা করা হয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় বিভিন্ন রকম ইকোয়েটরের কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে; যেমন—

ই কো য়ে ট র (ম্যাগ্নেটিক) — পৃথিবীর প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে দুইটি বিপরীতধর্মী চৌম্বক শক্তির অস্তিত্ব লক্ষিত হয়—এদের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে ওই স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তির কোন প্রভাব নেই। এই রকম স্থানের উপর দিয়ে যে বৃত্ত রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাকে বলে ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর। এটা ভৌগোলিক নিরক্ষ-বৃত্ত বা টেরেস্ট্রিয়াল ইকোয়েটরের প্রায়

কাছাকাছি, উত্তর দক্ষিণে কিছু সরে আছে মাত্র।

ইকোয়েটর (সেলেশ্চিয়াল) — পৃথিবী থেকে আমরা আপাত-দৃষ্টিতে গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-গুলোকে আকাশের এক অর্ধ-গোলাকার চাঁদোয়ার গায়ে সংলগ্ন দেখতে পাই, পৃথিবী যেন ওর কেন্দ্র স্থলে রয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যায় একে বলে 'সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ার'। পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর বা নিরক্ষরেখা যে সমতলে আছে তাকে চারদিকে বাড়িয়ে দিলে যে কাল্পনিক বৃত্তরেখায় উহা সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারকে ছেদ করবে তাকে বলা হয় সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েটর।

ইকোয়েশন (ম্যাথমেটিক্যাল)— গাণিতিক সমীকরণ; বিভিন্ন রাশি বা রাশি-সমষ্টির সমতা প্রদর্শনের সূত্র—এর মধ্যে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট মূল্যমানের রাশি থাকবে, যাতে অনির্দিষ্ট রাশির একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানে সমীকরণটি সার্থক হবে। যেমন, $5a=10$ একটি গাণিতিক সমীকরণ; এর অনির্দিষ্ট রাশি a এর মূল্য 2 হোলেই সমীকরণটি সার্থক হবে।

ইকোয়েশন (কেমিক্যাল)— রাসায়নিক সমীকরণ; যে সব পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটবে এবং তার ফলে যে সব পদার্থ উৎপন্ন হবে, তাদের সমতা প্রদর্শনের বর্ণনামূলক সূত্র। এর মধ্যে উৎপাদক ও উৎপাদিত পদার্থগুলোর মৌলিক উপাদানের অণু-পরমাণুর সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেখান হয়। যেমন, $H_2+Cl_2=2HCl$ একটি রাসায়নিক সমীকরণ; এতে বুঝাচ্ছে — হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে। একটি হাইড্রোজেন অণু ও একটি ক্লোরিন অণু মিলে দুটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু সৃষ্টি হয়েছে; কারণ হাইড্রোজেন ↑ ও ক্লোরিনের ↑ প্রত্যেকটির অণুতে দুটি করে পরমাণু রয়েছে, তার এক একটি পরমাণু মিলে একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অণু গঠিত হয়েছে। এভাবে সমীকরণটির সমতা রক্ষিত হোল।

ইকুইনক্স—পৃথিবীর তুলনায় সূর্য একস্থানে স্থির আছে সত্য; কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদির তুলনায় পৃথিবী থেকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সারা বছরে সূর্যের যে গতিপথ দেখতে পাই তাকে জ্যোতির্বিদ্যায় বলা হয় ইক্লিপ্টিক ↑। এই ইক্লিপ্টিক-

সেলেশ্চিয়াল ইকোয়েটরকে ↑ যেখানে ছেদ করে তাকে বলে ইকুইনক্স। সূর্য যখন ইকুইনক্সে থাকে তখন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত সমান হয়; এ রকম হয় বছরে দুদিন—21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর। 21 মার্চ সূর্য ভারন্যাল ইকুইনক্সে ও 20 সেপ্টেম্বর অটাম্ন্যাল ইকুইনক্সে থাকে।

ইকুইলিব্রিয়াম্ — স্থিরাবস্থা; বিপরীত শক্তির প্রভাবে পদার্থ যে স্থিরতা লাভ করে। টেবিলের উপর একখানা বই রয়েছে—বইখানার ইকুইলিব্রিয়াম অবস্থা; বইখানার নিম্নমুখী ভারশক্তি টেবিলের উর্ধ্বমুখী ভারসহন শক্তির সমান, তাই ওখানা স্থির থাকে।

ইউরিয়া—সাদা, স্ফটিকাকার জৈব পদার্থ; জীবজন্তুর মূত্রে পাওয়া যায়। এর অন্য নাম কার্বামাইড। খাদ্যের প্রোটিন ভাগ বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্রমে এই নাইট্রোজেন-বহুল পদার্থের সৃষ্টি হয়। দেহের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন এই ইউরিয়ার আকারে বেরিয়ে যায়। পদার্থটা জলে দ্রবণীয়। মূত্রে কিছু ইউরিক অ্যাসিডও থাকে, নানা কারণে এর সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সল্ট হাত পায়ের গাঁটে সঞ্চিত হওয়ার ফলে বাত রোগ জন্মে।

ইউরেনিয়াম—সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থ থেকে স্বভাবতঃই তেজ বিকিরীত হয় বলে একে রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ এলিমেণ্ট বলে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয় পদার্থকেই সর্ব প্রথম ভাঙা সম্ভব হয়েছে। এরূপ কেন্দ্রীন বিভাজনকেই বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিসন ↑।

ইউরেনাস্—সূর্যের একটি গ্রহ; শনি ও নেপচুন ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 178 কোটি মাইল; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 14·6 গুণ বড়। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর আমাদের হিসাবে লাগে 84 বছর।

ইথার—বর্ণহীন ও দাহ্য একটি তরল রাসায়নিক পদার্থ, $(C_2H_5)_2O$ বিশেষ এক রকম মিষ্ট গন্ধযুক্ত জীবদেহের উপর এর অ্যানেস্থেটিক ↑ ক্ষমতা আছে। ইথাইল অ্যালকোহলকে ↑ তেজী সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে নির্জলিকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইথার তৈরী হয় এজন্যে একে সালফিউরিক ইথার বা ডাই-ইথাইল ইথারও বলা হয়।

ইথার—বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একটা কাল্পনিক পদার্থ যার মাধ্যমে আলোক, বেতা

প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় বলে পূর্বে মনে করা হোত।

ইথাইল অ্যালকোহল—সুরাসার, সাধারণ অ্যালকোহল। বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, তীব্র কটু স্বাদযুক্ত। শর্করা জাতীয় পদার্থকে এক রকম জীবাণুর প্রভাবে বিশেষ ধরণের গাঁজন ক্রিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত হয়। ঔষধ হিসেবে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

ইথেন—এক রকম বর্ণহীন, গন্ধহীন দাহ্য গ্যাস; প্যারাফিন↑ জাতীয় একটা হাইড্রোকার্বন। রাসায়নিক সূত্র C_2H_3

ইথিলিন—এক রকম বর্ণহীন, মিষ্ট গন্ধযুক্ত, দাহ্য গ্যাস। একটি গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন। রাসায়নিক সূত্র C_2H_6.

ইগ্‌নিস-ফেটুয়াস্ — আলেয়া; ইংরেজীতে একে বলে উইল-ও-দি উইস্প্। পতিত বা পরিত্যক্ত ভূমিতে মাঝে মাঝে যে অস্থায়ী অগ্নিশিখা জ্বলে উঠতে দেখা যায়। ভূগর্ভ থেকে ফস্‌ফিউরেটেড হাইড্রোজেন↑ বা অন্য কোন দাহ্য গ্যাস বেরিয়ে বায়ুর সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে; এর ফলেই এরূপ অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ইগ্নিসন্-পয়েন্ট—জ্বলনাংক; কোন পদার্থ যে উত্তাপে জ্বলে ওঠে। যে তাপমাত্রায় পৌছুলে কোন পদার্থ জ্বলতে সুরু করে, তাই হোল ওই পদার্থের ইগ্নিসন-পয়েন্ট। এই তাপমাত্রা বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে।

ইনোকুলেসন — রোগ-বীজাণুর টিকা; কোন রোগের জীবাণু সুস্থ জীবদেহে সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে সেই রোগের প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা। বিজ্ঞানী পাস্তুর এর আবিষ্কারক। বাইরে থেকে কোন রোগ-জীবাণু নিয়ে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে ওই রোগের একটা মৃদু আক্রমণ ঘটে; ফলে ওই রোগের তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করবার একটা শক্তি জীবদেহে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্বে সজীব জীবাণু নিয়ে এরূপ টিকা দেওয়া হোত, এখন মৃত জীবাণু বা তাদের দেহ নিঃসৃত রস, (টক্সিন↑, অ্যান্টিটক্সিন) প্রভৃতির টিকা দিয়েও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে।

ইনফ্রা সাউণ্ড—মোটামুটি 30 এর কম স্পন্দন সংখ্যার শব্দতরঙ্গ। বোমা বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন এরূপ স্পন্দনের শব্দ মানুষের শ্রুতি-গোচর না হলেও ফিজ্যান্ট প্রভৃতি কোন কোন পাখী এই শব্দ অনুভব

করতে পারে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ইনার্ট — যে পদার্থের কোন রাসায়নিক ক্রিয়া নেই ; কোন পদার্থের সঙ্গেই যার রাসায়নিক মিলন ঘটে না। হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটন, আর্গন ↑ প্রভৃতি গ্যাস্‌কে ইনার্ট গ্যাস বলে, কারণ এদের কোনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া নেই।

ইনার্সিয়া — জড় বস্তুর স্থিতাবস্থা ; বাইরের কোন শক্তি প্রয়োগ না করলে জড় বস্তু স্থির থাকলে বরাবর স্থিরই থাকবে, চলতে থাকলে বরাবর একই দিকে একই ভাবে চলতে থাকবে। জড় বস্তুর এই ধর্মকে বলে ইনার্সিয়া। শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত পদার্থের গতি বা স্থিতির কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

ইন্‌ক্যুবেটর — বাক্সের মত একটা যন্ত্র, যার অভ্যন্তরভাগে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট তাপের সমতা রক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তাপের এই সমতা রক্ষার যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বলে থার্মোষ্টাট্‌ ↑ —এতে এমন যন্ত্র কৌশল থাকে যাতে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় পৌঁছুলেই তাপ পরিবহনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তাপমাত্রা আর বাড়তে পারে না। এরকম যন্ত্রে সাধারণতঃ হাঁস, মুরগী প্রভৃতির ডিম ফোটান হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় অপুষ্ট শিশুদেরও এর মধ্যে উপযুক্ত তাপে রেখে সজীব ও পরিপুষ্ট করে তোলা যায়। জীববিদ্যার পরীক্ষাদির জন্যে জীবাণুদের এর মধ্যে রেখে বাঁচিয়ে ও বাড়িয়ে তোলা হয়ে থাকে।

ইন্‌ক্যাণ্ডেসেন্স — ভাস্বরতা, অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় বস্তুর যে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ভাব দৃষ্ট হয়।

ইন্‌ক্যাণ্ডেসেণ্ট ল্যাম্প — যে বাতিতে কোন পদার্থ অত্যধিক উত্তপ্ত করে ভাস্বরতা বা আলোক সৃষ্টি করা হয়। ইলেক্ট্রিক বাল্‌বের সরু তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে ওটা প্রদীপ্ত হয়ে আলো ছড়ায়। গ্যাসের আলোতে প্রধানতঃ থোরিয়াম ↑ ও সিরিয়াম ধাতুর সল্ট মাখান ম্যাণ্টেল ↑ প্রদীপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে।

ইন্টার-সেলুলার—উদ্ভিদ বা জীব দেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যবর্তী স্থান বা বস্তু।

ইন্টারনোড— উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখার যেখানে পাতা গজায় তাকে বলে নোড; দুটা নোডের মধ্যবর্তী অংশকে বলে ইন্টারনোড।

ইন্টারনোড

ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্-লাইন—যদি কোন লোক পূর্ব দিকে চলতে থাকে, তাহলে পৃথিবীর আহ্নিক-গতির (পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে) জন্তে সে ক্রমে আগে সূর্যোদয় দেখবে, ঘড়ির সময় তার এগিয়ে যাবে; আবার পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে তার সময় পিছিয়ে যাবে। এজন্তে সময় বা তারিখের একটা স্থিরতা রক্ষার জন্তে গ্রিনউইচ (0° দ্রাঘিমা) থেকে 180° দূরে, অর্থাৎ 180° দ্রাঘিমা রেখায় উপস্থিত হলে পূর্বদিকে অগ্রসর যাত্রী একদিন বাদ দেয়, অর্থাৎ দুদিনের একই তারিখ ধরা হয়; আর পশ্চিম দিকের যাত্রীর একদিন কমে যায় বলে সে তার তারিখের সঙ্গে এক দিন যোগ করে দেয়, অর্থাৎ পরের দিনের তারিখ ধরে নেয়। এভাবে আন্তর্জাতিক হিসেবে তারিখ নির্ধারণের জন্তে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ওই 180° দ্রাঘিমা রেখাকে এজন্তে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বা ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্-লাইন বলা হয়।

ইণ্টারন্যাল-কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন—যে ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে উপযুক্ত জ্বালানি কিছু জ্বেলে তার আবদ্ধ তাপশক্তিকে যান্ত্রিক কৌশলে গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এর জ্বালানি সাধারণতঃ পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি হয়ে থাকে। পিষ্টন লাগান একটা আবদ্ধ সিলিণ্ডারের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জ্বলনক্রিয়া চলতে থাকে, গ্যাস সৃষ্টি হয়; তার চাপে পিষ্টনটা চলাচল করে। মোটর গাড়ীতে পেট্রল পুড়িয়ে এ-রকম ইঞ্জিন চালান হয়।

ইণ্ডাক্‌সন — কোন পদার্থকে তড়িতাবিষ্ট করবার একটা বিশেষ কৌশল। পদার্থটা তড়িৎ-পরিবাহী হলে নিকটস্থ কোন তড়িৎ শক্তির প্রভাবে ওর মধ্যেও তড়িৎ শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এরূপ তড়িৎ সংক্রমণকে বলে ইণ্ডাক্‌সন।

ইণ্ডাক্‌সন কয়েল—নিম্ন চাপের তড়িৎশক্তি থেকে উচ্চতর চাপের তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের একটা যন্ত্র কৌশল। নরম লোহার রডের গায়ে ধাতব তার জড়িয়ে, একটার উপর আর একটা এভাবে, দুটা কয়েল তৈরী করা হয়—নীচেরটা প্রাইমারি কয়েল ও উপরেরটা সেকেণ্ডারি কয়েল। প্রাইমারি কয়েলে অল্প কয়েকটি মাত্র পাক থাকে, আর সেকেণ্ডারি কয়েলে থাকে অপেক্ষা-কৃত সরু তারের অনেকগুলো পাক। যান্ত্রিক কৌশলে প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে (ইলেকট্রিক বেলের ↑ মত) এমনভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালান

হয়, যাতে সেই প্রবাহিত তড়িৎ স্রোতকে অতি দ্রুত গতিতে একবার চালিয়ে, আবার বন্ধ করে, ক্রমাগত দ্রুত গতিশীল পরবর্ত্তী-তড়িৎ স্রোত (অল্টার্নেটিং কারেন্ট ↑) উৎপাদন করা হয়। এর ফলে সেকেণ্ডারি কয়েলের মধ্যে উচ্চ চাপের তড়িৎ শক্তির উন্মেষ ঘটে।

ইণ্ডিয়াম্—মৌলিক ধাতব পদার্থ; অত্যন্ত নরম ধাতু। সীসার চেয়েও নরম বলে অনেক সময় যন্ত্রাদির বেয়ারিংএর উপরে এর একটা আবরণ দেওয়া হয়।

ইণ্ডিগো — নীলবর্ণের জৈব রাসায়নিক; গ্লুকোসাইড ↑ জাতীয় পদার্থ। সাধারণভাবে পদার্থটা ইণ্ডিক্যান বলে পরিচিত। ইণ্ডিগোফেরা নামে একজাতীয় উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এই ইণ্ডিগো বা নীলের জন্যে ওই উদ্ভিদের চাষ এখন আর হয় না; কারণ, কৃত্রিম উপায়েই নীল তৈরীর সহজসাধ্য কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইন্‌ফিনিটী—অসীম বা অনন্ত রাশি বা সংখ্যা; যে রাশি ধারণাযোগ্য যে কোন বৃহত্তর রাশির চেয়েও বড়। এইরূপ রাশির কল্পনা করা যায় মাত্র; ∞ এই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে একে প্রকাশ করা হয়।

ইন্‌ফিনিটীসিম্যাল — ধারণাতীত ক্ষুদ্রতম রাশি; কোন রাশি যদি ক্রমাগত ক্ষুদ্র হতে হতে যায়, অথচ কখন শূন্যও না হয়, তবে সেই ক্ষুদ্রতম রাশির ধারণাকে ইনফিনিটিসিম্যাল বলে বোঝান হয়।

ইন্‌ফ্রা-রেড-রে — অদৃশ্য অতি-লোহিত রশ্মি। সূর্যরশ্মির বর্ণালীর এক প্রান্তে যে লাল রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয় তার চেয়েও বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি আর আমরা চোখে দেখতে পাই না। লাল রশ্মির পরবর্তী এই অদৃশ্য রশ্মি হোল ইনফ্রা-রেড বা অতিলোহিত রশ্মি। এটা আর আলোক বা বর্ণধর্মী নয়—তাপধর্মী। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোকরশ্মির চেয়ে বেশী, কিন্তু বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম।

ইন্‌ভার— একটা সংকর ধাতু—63·8% লৌহ, 36% নিকেল ও ·2% কার্বন মিশিয়ে তৈরী। তাপের হ্রাসবৃদ্ধিতে এর আয়তনের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এজন্যে দামী ঘড়ির ব্যালান্স-হুইল ও অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ নির্মাণে এই সংকর ধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইনভার্ট সুগার — সমপরিমাণ গ্লুকোজ ↑ ও ল্যাভুলোজ ↑ শর্করার সংমিশ্রণ; যা ইক্ষু চিনির (কেন সুগার) রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন হয়। ইক্ষুচিনি হোল

সুক্রোজ ; এর জলীয় দ্রব এক রকম এনজাইমের ↑ প্রভাবে, অথবা কোন মৃদু অ্যাসিড দিয়ে ফুটালে ওই সুক্রোজের ↑ গ্লুকোজ ও ল্যাভুলোজ নামক দুটি আইসোমার ↑ সমপরিমাণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে বলে ইন্‌ভার্সন অব কেন-সুগার।

ইনভার্টেজ — এক রকম বিশেষ জৈব পদার্থ বা এনজাইম্‌; যা সাধারণতঃ ঈষ্টের ↑ মধ্যে জন্মায়। ইনভার্টেজ নামক এই এনজাইম্‌ ইক্ষুচিনির রূপান্তর ঘটিয়ে গ্লুকোজ ও ল্যাভুলোজ ↑ নামক শর্করা উৎপন্ন করে।

ইন্‌সুলেসন—তড়িৎ বা তাপশক্তির পরিবহন বন্ধ করবার ব্যবস্থা। কোন তড়িতাবিষ্ট বস্তু থেকে তড়িৎ, বা উত্তপ্ত বস্তু থেকে তাপের নিষ্ক্রমণ রোধ করার কৌশল। যে সব পদার্থের তড়িৎ বা তাপ পরিবহন রোধ করবার ক্ষমতা আছে তাদের বলা হয় ইন্‌সুলেটর।

ইন্‌সুলিন—জীবদেহের প্যান্‌ক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ডে ↑ উৎপন্ন একটি হর্মোন ↑। এর অভাবে ডায়বিটিস বা বহুমূত্র-রোগ জন্মে। কোন সুস্থ জীবদেহ থেকে ইনসুলিন নিয়ে ডায়বিটিস রোগীকে ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়; এতে রক্তের শর্করা ভাগ কমে যায়, রোগের উপশম ঘটে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইন্‌সুলিন খাদ্যাদির শর্করা উপাদানের সমতা রক্ষা করে।

ইপ্‌সম সল্ট — ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট ; সাধারণভাবে বলে ম্যাগ-সাল্‌ফ $MgSO_4, 7H_2O$। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, বিরেচক ও ক্ষারধর্মী। জোলাপ-জাতীয় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইপিকাক্‌—ব্রেজিল্‌ দেশের একরকম উদ্ভিদজাত অ্যাল্‌কালয়েড ↑ পদার্থ ; এর মধ্যে অ্যামিটিন নামক ভেষজ পদার্থ রয়েছে। ঔষধটির প্রয়োগে রোগীর ঘাম হয়, বমির উদ্রেক করে। আমাশয় রোগে ফলপ্রদ ; কাসির শ্লেষ্মা তরল করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

ইভাপোরেসন — বাষ্পীভবন ; উত্তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া। কর্পূর, পেট্রল প্রভৃতি অনেক পদার্থ স্বাভাবিক তাপেই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়, এদের বলে ভোলা-টাইল বা উদ্বায়ী পদার্থ। তাপ বৃদ্ধি করলে তরল পদার্থের এই বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়।

ইভোলিউসন— ক্রম-বিবর্তন ; ক্ষুদ্র এককোষী জীব (উদ্ভিদ বা প্রাণী) থেকে বহুকোষী জটিল অবয়ববিশিষ্ট জীবের ক্রমবিকাশ। কোটি কোটি

বছরে এই ইভোলিউসন বা ক্রম বিবর্তনের ফলে প্রারম্ভিক সাধারণ জীবদেহ থেকে বর্তমান মানব দেহের উৎপত্তি হয়েছে।

ইমিউনিটি — জীবদেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা। এরূপ ক্ষমতা স্বাভাবিক বা জন্মগতও হতে পারে; আবার ভ্যাক্‌সিন ইত্যাদি প্রয়োগেও জন্মান যায়। এই রোগ-প্রতিরোধ শক্তির তারতম্যের জন্যেই একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় থেকেও কেউ রোগাক্রান্ত হয়, কেউ বা সুস্থ থাকে।

ইম্মিসিব্‌ল—পরস্পর একীভূত হয়ে মিশে যায় না এমন; তরল পদার্থের বেলায়ই কথাটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে—যেমন, জল আর তেল পরস্পর ইম্মিসিব্‌ল।

ইমেজ্‌ — প্রতিচ্ছায়া; কোন বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মি দর্পণ বা লেন্সের উপরে প্রতিফলিত হলে তার যে প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রতিবিম্ব সোজাসুজি দর্শকের চোখে পড়তে পারে, আবার কোন পর্দার উপরেও ফেলা যায়। এ হোল রিয়েল ইমেজ বা প্রকৃত প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব আবার ভার্চুয়াল ↑ বা অপ্রকৃতও হতে পারে। সাধারণ আয়নায় আমরা ভার্চুয়াল ইমেজ্‌ দেখি। এখানে আলোকরশ্মির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয় না। কাজেই এরূপ ভার্চুয়াল ইমেজ পর্দার উপর ফেলা যায় না।

ইল্যাস্টিসিটি — স্থিতিস্থাপকতা; পদার্থের যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্যে চাপ দিলে তার আকার-আয়তন বদলে যায়, চাপ ছেড়ে দিলে আবার পূর্ব আকার-আয়তনে ফিরে আসে। এরূপ পদার্থকে বলে ইল্যাস্টিক পদার্থ; রাবার এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। অধিকাংশ পদার্থেরই কিছু না কিছু ইল্যাস্টিসিটি আছে, সামান্য বলে চোখে ধরা পড়ে না।

ইলেক্ট্রিসিটি — তড়িৎ শক্তি। পদার্থের পারমাণবিক গঠনে যে ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট ইলেক্ট্রন ↑ কণিকা রয়েছে বিভিন্ন উপায়ে তাদের উত্তেজিত করলে যে শক্তির উদ্ভব হয়। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ছয় শত বছর পূর্বে অ্যাম্বার নামক পদার্থে এই শক্তির পরিচয় পান থেল্‌স নামে এক বিজ্ঞানী। তড়িৎ পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে প্রবাহিত করা যায়—একে আবার তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করাও যেতে পারে। এই তড়িৎ শক্তি বিশেষ ব্যবস্থায় কোন পদার্থের মধ্যে স্থির-ভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, তখন একে বলে স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি বা স্থির-

তড়িৎ। যদি একে কোন বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থের তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তাকে বলে কাইনেটিক ইলেক্ট্রিসিটি, বা চল-বিদ্যুৎ। সাধারণতঃ ধাতব পদার্থমাত্রই উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী (কণ্ডাক্টর) হয়ে থাকে।

ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট— তড়িৎ শক্তির ধারা-প্রবাহ; কোন তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তারের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন কণিকাগুলোর গতি। তড়িৎ শক্তির উচ্চ চাপের ফলে ইলেক্ট্রন↑ বা ঋণতড়িৎ-কণিকাগুলো প্রকৃতপক্ষে ধন-তড়িৎ ধারার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। তড়িৎ প্রবাহের এই গতিপথ তারের মাধ্যমে সর্বদা অবিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ রাখতে হয়; একেই বলে ইলেক্ট্রিক সার্কিট। ওই তার কোথাও বিচ্ছিন্ন হলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ইলেক্ট্রিক কারেণ্ট দু-রকম—এ. সি (অল্টারনেটিং কারেণ্ট) এবং ডি. সি (ডাইরেক্ট কারেণ্ট)। এ. সি. প্রবাহে তড়িৎ শক্তির চাপ ক্রমাগত বাড়ান কমান হয়; এক দিকে হঠাৎ চাপ বেড়ে যায়, মুহূর্তে কমে গিয়ে বিপরীত দিকে বেড়ে যায়। প্রবাহের এই গতি পরিবর্তন সেকেণ্ডে 50 বার, বা তারও বেশী হয়ে থাকে। এজন্যে একে বাংলায় পরিবর্তী-প্রবাহ বলা হয়। ডি. সি. প্রবাহে তড়িৎ শক্তি ক্রমাগত একই দিকে সমানভাবে প্রবাহিত হয়, গতি পরিবর্তন হয় না। একে বলা হয় ডাইরেক্ট বা একমুখী প্রবাহ।

ইলেক্ট্রিক জেনারেটর— যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তি উৎপাদিত হয়। এই যন্ত্র বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন শক্তির হতে পারে। তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের যান্ত্রিক কেন্দ্রকে বলে পাওয়ার ষ্টেশন। এ সব কেন্দ্র সাধারণতঃ দু-রকম হয়ে থাকে—থার্মাল↑ ও হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক↑ পাওয়ার ষ্টেশন। তেল, কয়লা প্রভৃতি জ্বালানির সাহায্যে উত্তাপ সৃষ্টির ফলে যে জেনারেটর চলে, তাকে বলে থার্মাল; আর জলস্রোতের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে যে জেনারেটর চালান হয়, তাকে বলে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক জেনারেটর↑। বিরাট শক্তিশালী এরূপ বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে বিদ্যুৎশক্তি তারের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্যে দূর দূরান্তরে সরবরাহ করা হয়।

ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প—তড়িৎ শক্তির

প্রভাবে আলোক উৎপাদনের ব্যবস্থা। তড়িৎ প্রবাহের ফলে বিশেষ ধরণের (সাধারণতঃ টাংষ্টেন ↑ ধাতুর) সরু তার উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। ওই তার বা ফিলামেন্ট ↑ থাকে বায়ুশূন্য বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসে পূর্ণ কাচ-গোলকের মধ্যে, যাকে বলে ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব। এই হোল সাধারণ ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প। ইদানিং নিয়ন ↑ ল্যাম্পের প্রচলন হয়েছে। কাঁচের বাল্‌ব বা টিউবের মধ্যে নিয়ন গ্যাস ভর্তি করে তার মধ্যে দুটা ধাতব

নিয়ন-ল্যাম্প

চাকতি বা জড়ান তার জুড়ে দেওয়া হয়। ওই দুটা চাকৃতি বা তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালালে লাল রংএর আলোক সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ফ্লোরেসেন্ট ↑ পদার্থ ভিতরে দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের নিয়ন আলোক তৈরী করা হয়েছে।

ইলেক্ট্রিক বেল — বৈদ্যুতিক ঘন্টা। বেল, ইলেক্ট্রিক ↑ ।

ইলেক্ট্রো-কেমিষ্ট্রী — ইলেক্ট্রো-লিসিস ↑ সম্পর্কীয় রসায়ন শাস্ত্র; তড়িৎ প্রবাহের প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থের যে-সব রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, তৎসম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

ইলেক্ট্রো-কার্ডিওগ্রাম—বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এক রকম যান্ত্রিক কৌশলে অঙ্কিত হৃৎস্পন্দনের রেখা চিত্র; যন্ত্রটাকে বলে ইলেক্ট্রো-কার্ডিও-গ্রাফ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত হলে এই যন্ত্র দিয়ে

কার্ডিয়োগ্রাম

পরীক্ষা করা হয়; রেখাচিত্র দেখে হৃৎপিণ্ডের কার্য-কারিতার ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা যায়।

ইলেক্ট্রো-এন্সেফালোগ্রাম — ইলেক্ট্রো-এন্সেফালোগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কিত মস্তিষ্কের বিদ্যুৎস্পন্দনের গতি প্রকৃতি নির্দেশক রেখা চিত্র। মস্তিষ্কের কোষগুলোর স্পন্দন বহু সহস্র গুণ বর্ধিত হয়ে এই যন্ত্রে তরঙ্গের আকারে রেখাপাত করে। এই রেখা দেখে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুর কার্যকারিতা বুঝা যায়। যেমন, একজন সুস্থ লোকের মস্তিষ্ক থেকে সেকেণ্ডে 8 থেকে 13 টি তরঙ্গ-রেখা পাওয়া যায়, কিন্তু মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বেলায় এই তরঙ্গরেখা সেকেণ্ডে মাত্র 6 বা 7 টার বেশী হয় না; তরঙ্গের আকার

ও প্রকৃতিরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

ইলেক্ট্রোড—তড়িৎ-দ্বার ; তড়িৎ পরিবাহী কোন পদার্থের যে দণ্ড, চাকৃতি বা তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ কোন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, বা তা থেকে বেরিয়ে যায়। যে তড়িৎদ্বার দিয়ে তড়িৎ প্রবেশ করে তাকে বলে অ্যানোড ↑ ; যেটা দিয়ে তড়িৎ বেরিয়ে যায় তাকে বলে ক্যাথোড ↑ ।

ইলেক্ট্রোলিসিস্—বিশেষ বিশেষ পদার্থের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ওই সব পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলেক্ট্রোলিসিস্। ক্যাথোড্ ও অ্যানোড্ তড়িৎদ্বার দুটির মধ্যে ওই পদার্থের পরমাণুগুলো আয়নায়িত হয়ে পড়ে, আর সেই আয়ন-কণিকাগুলোর মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে। ওর কোন কোন পদার্থ তড়িৎদ্বারের উপর সঞ্চিত হয়, কোন কোনগুলো আবার গ্যাসের আকারে বিমুক্ত হয়ে যায়। পদার্থের এরূপ বিশ্লেষণ নির্ভর করে দ্রাবক ও দ্রাব্য পদার্থ দুটির ও ইলেক্ট্রোডের রাসায়নিক গঠন ও প্রকৃতির উপর।
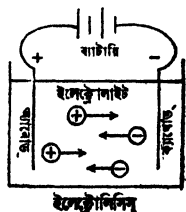
ইলেক্ট্রোলিসিস্

ইলেক্ট্রোলাইট — ইলেক্ট্রোলিসিস্ প্রক্রিয়ায় যে পদার্থের দ্রবের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালান হয়। এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ ওই পদার্থেরই আয়নায়িত পরমাণুগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। কপার-সালফেট্ ↑ বা তুঁতের জলীয় দ্রবের মধ্যে দুটো ইলেক্ট্রোড ↑ বসিয়ে ব্যাটারির তার জুড়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালান হোল। ব্যাটারি ↑ থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ অ্যানোডের মধ্য দিয়ে ওই দ্রবের মাধ্যমে ক্যাথোডে পৌঁছে আবার ব্যাটারিতে ফিরে যায়। এর ফলে ওই দ্রব বা ইলেক্ট্রোলাইটের ঋণ-তড়িতাবিষ্ট সালফেট্ আয়নগুলো ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে চলে যায় ; আর ধন-তড়িতাবিষ্ট কপার (তামা) আয়নগুলো অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে যায়। এভাবে তামার সূক্ষ্ম কণিকা ক্যাথোডের গায়ে জমে একটা পাত্লা আস্তরণের সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ↑ ; আর কপার সালফেটের ওই দ্রবটা, যা বিশ্লিষ্ট হয়, তাকে বলে ইলেক্ট্রোলাইট।

ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেট— বৈদ্যুতিক তার জড়ানো লৌহ দণ্ড ; দণ্ডটা সোজা বা ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকানোও হতে পারে।

জড়ানো ওই তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে দণ্ডটা চৌম্বক শক্তি লাভ করে; একেই বলে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট; বাংলায় বলে তড়িৎচুম্বক। তারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ যতক্ষণ চলে ওই দণ্ডের চৌম্বক ধর্মও ততক্ষণ মাত্র থাকে।
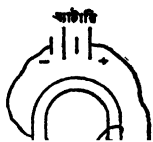
ব্যাটারি

ইলেক্ট্রোম্যাগনেট

ইলেক্ট্রোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তির চাপ বা ভোল্টেজ ↑ মাপা হয়। তড়িতের চাপ নিরূপণের জন্যে নানা রকম যান্ত্রিক কৌশলের ইলেক্ট্রোমিটার আছে।

ইলেক্ট্রোস্কোপ — যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তির অস্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এজন্যে সাধারণতঃ গোল্ড-লিফ্-ইলেক্ট্রোস্কোপ' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটা হোল একটা মুখবন্ধ কাঁচের জার; একটা বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতব দণ্ডের সঙ্গে লাগান সোনার দু-খানা পাতলা পাত ওই জারের মধ্যে ঝোলান থাকে। ওই ধাতবদণ্ডের সঙ্গে কোন জিনিস বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সংযুক্ত করলে, যদি তাতে তড়িৎ শক্তি থাকে, তবে তা দণ্ডের ভিতর দিয়ে সোনার পাত দু-খানাকে তড়িতাবিষ্ট করবে; আর সম-তড়িতাবিষ্ট হওয়ার ফলে পাত দুখানা পরস্পর থেকে সরে ফাঁক হয়ে যাবে। তারের সংযোগ কেটে দিলে পাত দু-খানা আবার জুড়ে যাবে। এই প্রক্রিয়া থেকে কোন পদার্থে তড়িৎ শক্তির অস্তিত্ব সহজেই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সোনার পাত

ইলেক্ট্রোস্কোপ

ইলেক্ট্রোপ্লেটিং — কোন ধাতব বস্তুর উপরে ইলেক্ট্রোলিসিস্ ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্য কোন ধাতুর সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়ার কৌশল। সাধারণতঃ এ-প্রক্রিয়াকে বাংলায় গিল্টি করা বলা হয়। এভাবে কপার-প্লেটিং, সিল্ভার প্লেটিং, গোল্ড-প্লেটিং প্রভৃতি করার ব্যবস্থা করা যায়। যে ধাতুর আস্তরণ দিতে হবে তার কোন সল্ট হবে ইলেক্ট্রোলাইট ↑; ঋণতড়িৎ-দ্বার বা ক্যাথোড ↑ প্রান্তে থাকবে ধাতব বস্তুটা, যার গায়ে ইলেক্ট্রোলিসিস্ প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রোলাইটের ↑ ধাতব অংশের সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ গিয়ে লেগে যাবে।

ইলেক্ট্রন — পদার্থের পরমাণুর সংগঠক ঋণ-তড়িৎ কণিকা। মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীন বা নিউ-

ক্লিয়াসের চারদিকে এরূপ ঋণতড়িৎ কণিকা পরিভ্রমণ করে (অ্যাটমিক স্ট্রাক্‌চার ↑)। হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারদিকে একটিমাত্র ইলেক্ট্রন ঘুরছে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এরূপ ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ইলেক্ট্রনিক্‌স্—ইলেক্ট্রনের ধর্ম ও গতিবিধি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যে শাখায় রেডিও ভাল্‌ব ↑, ক্যাথোড-রে-টিউব ↑ প্রভৃতি যন্ত্রাদি (যার মধ্যে মুক্ত ইলেক্ট্রন কণিকা সব চলাচল করে) বিষয়ক তথ্যাদি আলোচিত হয়।

ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপ—সাধারণ মাইক্রোস্কোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি আমাদের চোখে পড়ে; বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে বর্ধিতাকারে দৃশ্য বস্তুর সেই প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দৃশ্য বস্তুটা যদি আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয়, তবে আর তা থেকে আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হতে পারে না; ফলে বস্তুটা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে অদৃশ্য থেকে যায়। এখন, ক্যাথোড-রে-টিউবে ↑ ক্যাথোড প্রান্ত থেকে যে ইলেক্ট্রনের ধারাপ্রবাহ বেরোয় তার প্রকৃতি আলোক-রশ্মিরই অনুরূপ; কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। কাজেই ইলেক্ট্রনের এই ধারা-রশ্মিতে অতি ক্ষুদ্র (যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে ↑ অদৃশ্য) কণিকাও প্রতিফলিত হতে পারে। অতি জটিল যান্ত্রিক কৌশলে এরূপ প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রে। এ পর্যন্ত একশত পরমাণুবিশিষ্ট বড় অণু এই যন্ত্রে দেখা গিয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতে এ যন্ত্রের আরও উন্নতি হবে, এবং ভারী মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্র পরমাণু পর্যন্ত এর সাহায্যে দেখা যেতে পারে।

ইয়োলো-ফিভার—পীতজ্বর; দক্ষিণ আমেরিকার এক রকম মারাত্মক ব্যাধি। এক রকম মশার দ্বারা সংক্রামিত হয়। এ-রোগে লিভার, পাকস্থলী প্রভৃতির প্রদাহ ও স্ফীতি ঘটে, গাত্রচর্ম হলদে হয়ে যায়, রোগী কালো বমি করে। আজকাল এর প্রতিষেধক ঔষধাদি বেরিয়েছে।

ঈষ্ট—ছত্রাক জাতীয় এক রকম জৈব পদার্থ; এর সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ-রসের গাঁজন ক্রিয়া ঘটে থাকে। পাউরুটি নরম ও ফাঁপা করবার জন্যে ময়দায় ঈষ্ট দেওয়া হয়। চিনির রস ঈষ্ট দিয়ে গাঁজিয়ে মদ প্রস্তুত করা হয়। ঈষ্ট থেকে এক

রকম এন্‌জাইম ↑ বা জৈব পদার্থ জন্মে; যার প্রভাবে এরূপ বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হয়।

উ

উড্ মেটাল — একটা সংকর ধাতুর বিশেষ নাম। 50% বিস্‌মাথ, 25% সীসা, 12·5% টিন, 12·5% ক্যাড্‌মিয়াম মিশিয়ে এটা তৈরী। মাত্র 71° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গলে যায়। এরূপ নিম্ন-গলনাংকের জন্যে এ দিয়ে অনেক সময় বড় বড় বাড়ীর জলের পাইপের মুখ বন্ধ করা হয়। আগুন লাগলে ওই মুখ সহজেই গলে খুলে যায়, আর জল বেরিয়ে আগুনের ব্যাপ্তি রোধ করে।

উড্-ন্যাপ্‌থা—একটা বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থ; বিশেষ কৌশলে কাঠ চোলাই (ডিস্টিলেসন ↑) করে পাওয়া যায়। এজন্যে একে উড্-স্পিরিট বা উড্-অ্যালকোহলও বলে। এর রাসায়নিক নাম মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH)। উপযুক্ত দ্রাবক হিসেবে বিভিন্ন রসায়ন শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। অ্যালকোহলের (ইথাইল) ↑ সঙ্গে এই বিষাক্ত পদার্থটা মিশিয়ে জ্বালানি হিসেবে মেথিলেটেড স্পিরিট ↑ তৈরী করা হয়।

উল্‌ফ্রাম — মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 183·92, পারমাণবিক সংখ্যা 74, সাংকেতিক চিহ্ন W. উলফ্রাম ধাতুকে টাংষ্টেন-ও ↑ বলে। ধাতুটা অত্যন্ত কঠিন, অথচ সহজেই এর সরু তার বা পাত করা যায়; এতে আবার মরচেও ধরে না। অত্যধিক তাপ সহন-ক্ষমতার জন্যে এ-দিয়ে বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট ↑ তৈরী হয়; এর গলনাংক 3370° সেন্টিগ্রেড।

উলফ্রামাইট — উল্‌ফ্রাম ↑ বা টাংষ্টেন ↑ ধাতুর স্বভাবজাত লৌহ-মিশ্রিত অক্সাইড, $FeWO_4$; সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই উল্‌ফ্রাম ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

এ

একর—ভূমির আয়তন পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক; =4840 বর্গগজ; এ-দেশের প্রায় তিন বিঘা।

একা-অ্যালুমিনিয়াম — সম্প্রতি-আবিষ্কৃত যে মৌলিক ধাতব পদার্থকে **গ্যালিয়াম** নাম দেওয়া হয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতুর সমগোত্রীয় এ-রকম একটা মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবল ↑ থেকে অনুমান করা হয়েছিল। আবিষ্কৃত না হওয়া

পর্যন্ত ধাতুটা এই বিশেষ নামে অভিহিত হোত।

এক্সপ্লোসিভ্ — বিস্ফোরক পদার্থ; যে সব পদার্থে অতি দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, আর প্রচুর গ্যাস ও তাপের উদ্ভব হয়। গান-পাউডার ↑, নাইট্রো-গ্লিসারিন ↑, অ্যামাটল ↑ প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিলে বা আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরক পদার্থের উপাদানগুলোর মধ্যে দ্রুত রাসায়নিক পরিবর্তন বা প্রক্রিয়ার ফলেই এই বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলেই কামান, বন্দুক প্রভৃতির আবদ্ধ খোলের মধ্যে সহসা প্রচুর গ্যাস, ধূম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়; তারই প্রচণ্ড চাপে গোলা-গুলি মহাবেগে ছুটে বেরোয়।

এক্সপোন্যান্ট — গণিতশাস্ত্রে যে সংখ্যার দ্বারা কোন রাশির মূল্যমানের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়; যেমন—x^3 রাশির মূল রাশি x এর এক্সপোন্যান্ট হোল 3; একে মূল রাশির ঘাত বা সূচক সংখ্যাও বলে।

এক্সোথার্মিক — যে সব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপশক্তি উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপের সৃষ্টি হয়। এক্সোথার্মিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে এক্সোথার্মিক কম্পাউণ্ড বলে। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ↑ একটা এক্সোথার্মিক কম্পাউণ্ড; $H_2 + Cl_2 = 2HCl +$ 43,600 ক্যালোরি ↑ ।

এক্স-রে — রঞ্জন-রশ্মি; জার্মাণ বিজ্ঞানী রঞ্জেন 1895 খৃষ্টাব্দে যে এক রকম অদৃশ্য ভেদকারী রশ্মি আবিষ্কার করেন। এটা আলোক ও বেতার তরঙ্গের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (এক সেন্টিমিটারের লক্ষাধিক গুণ ছোট) এক বিশেষ তরঙ্গ স্পন্দনের ফলে এই রশ্মির সৃষ্টি হয়। এক্স-রে-টিউব হোল বিশেষ আকারের বায়ুশূন্য একটা কাঁচ-গোলক। বিশেষ ব্যবস্থায় ওই টিউবের ভিতরে ইলেক্ট্রন কণিকার ধারা অতি

এক্স-রে টিউব
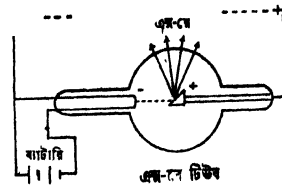
দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে একটা ধাতব চাকতির উপর পড়ে এবং সেখান থেকে এই অদৃশ্য রশ্মির বা এক্স-রে'র উদ্ভব ঘটে থাকে। সাধারণ আলোকরশ্মি যে-সব পদার্থ

ভেদ করতে পারে না, এক্স-রশ্মি তা ভেদ করে চলে যায়। দেহের মাংস-পেশী ভেদ করে এক্স-রশ্মির সাহায্যে ভিতরের হাড় ও যন্ত্রাদির ছায়া ফটোগ্রাফিক ↑ প্লেটে মুদ্রিত করা যেতে পারে; এভাবে দেহাভ্যন্তরের অস্থি-পঞ্জরের অবস্থা সহজে ধরা পড়ে। আবার বিভিন্ন স্ফটিকাকার পদার্থের পারমাণবিক গঠনও এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়; এই প্রক্রিয়াকে বলে এক্স-রে-অ্যানালিসিস।

এক্স-রে স্পেক্ট্রোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে রঞ্জন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপা যেতে পারে। এই যন্ত্রে ফটোগ্রাফিক প্লেট লাগিয়ে বিভিন্ন কৌশলে এক্স-রশ্মির এক রকম আলোকচিত্র তোলবার ব্যবস্থা করা যায়, তখন যন্ত্রটাকে বলা হয় এক্স-রে স্পেক্ট্রোগ্রাফ।

এন্‌জাইম—বিভিন্ন জীবধর্মী ছত্রাকের দেহকোষ থেকে নিঃসৃত জৈব পদার্থ। বিভিন্ন রকম এন্‌জাইমের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষমতা আছে; ক্যাটা-লিটিক ↑ পদার্থের মত এরা বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এক এক রকম এন্‌জাইমের এক এক রকম নির্দিষ্ট রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। ঈষ্টের ↑ ছত্রাক-কোষ বা জীবাণু থেকে যে এন্‌জাইম সৃষ্টি হয়, তা শর্করাকে অ্যাল-কোহলে ↑ পরিবর্তিত করে। মুখের লালাতে টায়ালিন ↑ নামক একরকম এন্‌জাইম সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়। পেপ্‌সিন নামক এন্‌জাইম আমিষ জাতীয় খাদ্য হজম করায়।

এনামেল—কাঁচ জাতীয় পদার্থের সঙ্গে টিন-ডাইঅক্সাইড (SnO_2) প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে তৈরী হয়। বিভিন্ন ধাতব বাসনপত্রের উপর এর একটা পাতলা মসৃণ আবরণ দিয়ে সুদৃশ্য করা হয়। মাটি বা পোর্সিলেন ↑ পাত্রাদির উপরেও অনেক সময় এরূপ এনামেল করা হয়ে থাকে।

এনার্জি—শক্তি; কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা। এনার্জি--পোটেন্‌সিয়্যাল ও কাইনেটিক, এই দু-রকম অবস্থায় থাকতে পারে। পাহাড়ের উপর যে জল সঞ্চিত আছে তার পোটেন্‌সিয়্যাল এনার্জি (স্থৈতিক-শক্তি) রয়েছে। উচ্চে অব-স্থিতির জন্যে ওই জল একটা শক্তি বা কর্মক্ষমতা লাভ করেছে। যখন প্রবাহিত হয়ে নীচে নামবে তখন ওই শক্তি জলের বেগে মাটি কেটে পাথর ভেঙ্গে প্রকাশ পাবে; পোটেন্‌সিয়্যাল এনার্জি এ-ভাবে

কাইনেটিক এনার্জিতে (গতীয় শক্তিতে) পরিবর্তিত হবে। শক্তির বিনাশ নেই; বিশেষ ব্যবস্থায় এক শক্তিকে অপর শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় মাত্র। এরূপ তাপশক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের শক্তির বিকাশ দেখা যায়।

এণ্ডোথার্মিক—যে সব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ হ্রাস পায়, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপ কমে যায়। এ-রকম রাসায়নিক ক্রিয়াকে বলে এণ্ডো-থার্মিক রিঅ্যাকসন, এবং এর ফলে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে বলে এণ্ডোথার্মিক কম্পাউণ্ড। হাইড্রোজেন ↑ ও আইওডিনের ↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন হাইড্রায়োডিক অ্যাসিড একটা এণ্ডোথার্মিক কম্পাউণ্ড; $H_2 + I_2 = 2HI - 12,200$ ক্যালোরি ↑।

এণ্ডোটক্সিন — যে সব টক্সিন ↑ বা বিষরস জীবাণুবিশেষের দেহের অংশ স্বরূপ; যা ছেঁকে বা ধুয়ে পৃথক করা যায় না; যেমন—টাইফয়েড টক্সিন, যা টাইফয়েড জীবাণুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। টিটেনাস্ জীবাণুর টক্সিন পৃথক করা যায় বলে তাকে বলা হয় এক্সোটক্সিন।

এণ্ডোক্রাইন গ্ল্যাণ্ড—দেহাভ্যন্তরস্থ যে সব নালীশূন্য গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড ↑ থেকে বিভিন্ন হর্মোন ↑ নিঃসৃত হয়ে রক্তে মিশ্রিত হয়। যেমন—হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড থেকে অ্যাড্রিনেলিন ↑ নামক হর্মোন রস নিঃসৃত হয়ে রক্তে মিশে যায়; যার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়, গাত্রচর্ম ফ্যাকাশে হয়ে যায়। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে এ-রকম পিটুইটারি, থাইমাস্, থাই-রয়েড্ প্রভৃতি আরও নানা রকম অন্তঃনিস্রাবী নালীশূন্য গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড আছে। এগুলো থেকে বিভিন্ন হর্মোন নিঃসৃত হয়ে দেহযন্ত্রের বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

এণ্ডোস্পার্ম—উদ্ভিদের বীজকোষের অভ্যন্তরভাগে সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার; ভাবী উদ্ভিদ-শিশুর জন্যে সঞ্চিত এই বীজ-শাঁস মানুষ ও অপরাপর জীব-জন্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে; যেমন—ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি।

এপিডায়াস্কোপ — এক রকম ছায়াচিত্রের যন্ত্র। একে এপিস্কোপ ও ডায়াস্কোপ উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়। এর বিশেষ ব্যবস্থায় স্বচ্ছ স্লাইড বা ফিল্মের উপর আলোক-রশ্মি ফেলে দেয়াল বা পর্দার উপরে ওই ছবির প্রতিচ্ছায়া ফেলা যায়। তীব্র আলোক-

রশ্মি প্রতিফলক লেন্সের সাহায্যে সংহত করে স্লাইড বা ফিল্মের ভিতর দিয়ে পর্দার উপর ছায়াছবি ফেলা হয়। একে বলে ডায়াস্কোপ।

ডায়াস্কোপের ব্যবহার

এপিস্কোপের ব্যবহার
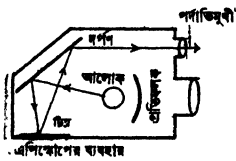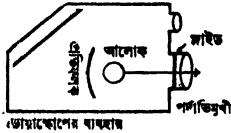
এপিডায়াস্কোপ

এপিস্কোপের কৌশলও প্রায় এরূপ; কেবল এর মধ্যে আলোক-রশ্মি একটা দর্পণে প্রতিফলিত করে কোন বস্তু বা ছবির উপর ফেলা হয়, তা থেকে প্রতিফলিত রশ্মি আবার ওই দর্পণেই পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে পর্দায় ছায়া ফেলে। চিত্র থেকে উভয়ের পার্থক্য সহজে বুঝা যাবে।

এবোনাইট—খুব শক্ত কালো এক রকম পদার্থ; রাবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তৈরী। এতে গন্ধকের পরিমাণ থাকে 30%; একে ভাল্কেনাইট বা ভাল্কেনাইজড্ রাবারও বলা হয়। জিনিসটার তড়িৎ বা তাপ পরিবহনের ক্ষমতা নেই বলে বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়।

এমারি—কোরাণ্ডাম ↑ নামক খনিজ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও আয়রন-অক্সাইড গুঁড়া করে মিশিয়ে এমারি তৈরী হয়। অত্যন্ত কঠিন বলে এ-দিয়ে ঘসে ধাতব পদার্থ পরিষ্কার করা হয়। মোটা কাগজে এমারি চূর্ণ শিরিষের আঠার সাহায্যে লাগিয়ে তৈরী করা হয় এমারি-পেপার।

এলিমেণ্ট—মৌলিক পদার্থ। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটিকে মৌলিক পদার্থ হিসেবে পঞ্চভূত আখ্যা দিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ-গুলোকে মৌলিক পদার্থ বলা যায় না। এমন কি, সবগুলো পদার্থের সংজ্ঞার মধ্যেও পড়ে না; যেমন—তেজ হোল শক্তি, পদার্থ নয়। যে সব পদার্থ একই প্রকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, কোন রকম বিশ্লেষণেই যে পদার্থে অন্য কোন গুণ বা ধর্মের অণু পরমাণু মেলে না, তাদের বলে এলিমেণ্ট বা মৌলিক পদার্থ। পৃথিবীতে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে; অপরাপর যাবতীয় পদার্থই ওই সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন যৌগিক রূপ। ইদানিং আরও ছয়টি দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—কাজেই এখন

মৌলিক পদার্থের সংখ্যা 98টি বলা যায়। মৌলিক পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রিবিধ অবস্থারই আছে। (পরিশিষ্টে মৌলিক পদার্থগুলোর তালিকা ↑)।

এস্টার — বিশেষ এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যা বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যালকোহলের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়; যেমন — ইথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিলনে হয় ইথাইল অ্যাসিটেট; যাকে ইথাইল বা অ্যাসিটিক এস্টারও বলে। প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ তৈল ও চর্বিতে বিভিন্ন রকম এস্টার রয়েছে। অনেক এস্টার সুগন্ধযুক্ত তরল পদার্থ; তাই সেগুলো সুগন্ধী প্রসাধন দ্রব্য, সিরাপ প্রভৃতি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

এসেন্সিয়্যাল অয়েল — স্বভাবজাত সুগন্ধ তৈলাক্ত পদার্থ; বিভিন্ন ফুলে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মায়। রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে এগুলো এস্টার শ্রেণীর জৈব যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আজকাল অনুরূপ কৃত্রিম সুগন্ধ তৈল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

ও

ওঅ্যারলেস্—(বেতার) কোনরূপ তারের যোগাযোগ ব্যতীতই সঙ্কেত অথবা শব্দ প্রেরণের কৌশল। ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গপ্রবাহের সাহায্যেই এরূপ সঙ্কেত প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। ওঅ্যারলেস বা বেতার-যন্ত্রে এরূপ সঙ্কেত প্রেরণ ও সংগ্রহের কৌশল ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কোনি 1895 খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কার করেন।

ওকার—মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি মিশ্রিত অবিশুদ্ধ প্রাকৃতিক ফেরিক-অক্সাইড (Fe_2O_3); লৌহ ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ বিশেষ। হলদে আভাযুক্ত লাল বর্ণের জন্য জিনিসটা রং বা পেইন্ট হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

ওপ্যাল — মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ; সাধারণতঃ এটা গোদন্ত-মণি নামে পরিচিত। জিনিসটা দুধের মত সাদা ও উজ্জ্বল, ভিতরে বিভিন্ন বর্ণের চাকচিক্য দেখা যায়।

ওপেক—(অস্বচ্ছ) যার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না; যাতে আলোকরশ্মি প্রতিহত হয়, ভিতরে প্রবেশ করে না। যেমন, কাঁচ হোল স্বচ্ছ বা ট্রান্সপ্যারেন্ট পদার্থ; কিন্তু কাঠ অস্বচ্ছ বা ওপেক পদার্থ।

ওম্—পদার্থমাত্রই তড়িৎপ্রবাহে কিছু

না কিছু বাধা দেয় ; যে পদার্থে এই বাধা যত কম পদার্থটা তত ভাল তড়িৎ-পরিবাহী হবে। তড়িৎশক্তি পরিবহনে পদার্থের এই স্বাভাবিক বাধা পরিমাপের একক হোল ওম্। কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের এই বাধা এক ওম্ হবে, যদি এক ভোল্ট ↑ তড়িৎ-চাপের ফলে ওর মধ্যে মাত্র এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয়। সাধারণ ইলেক্ট্রিক লাইটের ফিলামেন্টের মধ্যে তড়িৎ-পরিবহনের এই বাধা প্রায় 400 থেকে 700 ওম্ হয়ে থাকে।

ওম্‌স্‌-ল — কোন তড়িৎপরিবাহী পদার্থের তারের মধ্যে প্রবাহিত তড়িৎশক্তি ওর প্রান্তদ্বয়ের তড়িৎ-চাপের (ভোল্টেজ ↑) পার্থক্যের সঙ্গে আনুপাতিক হয়ে থাকে। যেমন—দুই ভোল্ট তড়িৎ-চাপ থাকলে যদি এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ হয়, তাহলে চার ভোল্ট তড়িৎ-চাপে দুই অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ হবে। এভাবে দেখা যায়, কোন পদার্থের তড়িৎ-চাপ (ভোল্ট) ÷ তড়িৎপ্রবাহ (অ্যাম্পিয়ার) = তড়িৎপ্রবাহের বাধা (ওম্‌স্)।

ওজোন্ — অক্সিজেন গ্যাসের প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর সমবায়ে গঠিত (O_2) ; কোনপ্রকারে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু মিলিত হলে সৃষ্টি হয় ওজোন গ্যাস (O_3)। এজন্যে ওজোন হোল অক্সিজেনের একটি অ্যালোট্রোপ ↑। গ্যাসটা সামান্য নীলাভ, বিশেষ রাসায়নিক শক্তি সম্পন্ন, বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান। সমুদ্রতীরের বায়ুতে ওজোনের ভাগ বেশী বলে সমুদ্রবায়ু স্বাস্থ্যকর। বায়ু বা অক্সিজেনের মধ্যে নিঃশব্দ তড়িৎস্ফুরণের ফলে ওজোন সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ওয়াট্—শক্তি পরিমাপের একক ; প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ শক্তি উদ্ভূত বা ব্যয়িত হয়। এক ওয়াট হোল প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল ↑ শক্তির সমান। সাধারণতঃ তড়িৎশক্তির পরিমাপ করতেই ওয়াট কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় ; ইলেক্ট্রিক ল্যাম্পের তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা ওয়াটে বুঝান হয়। তড়িৎপ্রবাহের অ্যাম্পিয়ার সংখ্যাকে তড়িৎচাপের ভোল্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে তড়িৎশক্তির পরিমাপক এই ওয়াট সংখ্যা। 1000 ওয়াট = 1 কিলোওয়াট = $1\frac{1}{3}$ হর্স-পাওয়ার ↑ (অশ্ব-শক্তি)।

ওয়াটার গ্যাস—এক রকম জ্বালানি গ্যাস ; কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। উত্তপ্ত কয়লার উপর জলীয় বাষ্পের প্রভাবে

উৎপন্ন হয় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে ওয়াটার (জলীয়) গ্যাস। উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে কয়লার স্তর উত্তপ্ত করে তার মধ্যে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করা হয়। জলীয় বাষ্পে কয়লা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আবার উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ চালান হয়। বার বার এরূপ করবার ফলে কয়লা আংশিকভাবে পুড়ে ওই সংমিশ্রিত জ্বালানি গ্যাসের উদ্ভব হয়।

ওয়াটার গ্লাস — সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেটের ↑ ঘন জলীয় দ্রব; পদার্থটা কাঁচের মত স্বচ্ছ। কোন জিনিসের উপর এর একটা পাতলা আবরণ দিলে হাওয়া প্রবেশ করতে পারে না; এভাবে অনেক সময় ডিম সংরক্ষণ করা হয়। এ দিয়ে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করাও চলে। সাবান ও পেষ্টবোর্ড শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ওয়াটার অব ক্রিস্ট্যালিজেসন— স্ফটিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পদার্থের সঙ্গে যে জলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিক গঠনে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক জলীয় অণু সংযুক্ত হয়। আবার কোনরূপে এই জল বিশুষ্ক বা বিদূরিত করলে স্ফটিকের আকার ও গঠন নষ্ট হয়ে যায়। কপার সালফেট অর্থাৎ তুঁতের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে জলের পাঁচটি অণু মিলে কপার-সালফেটের স্ফটিক গঠিত হয় ($CuSO_4, 5H_2O$); ফিট্‌কিরি বা অ্যালামের ↑ স্ফটিকে থাকে 24টি জলীয় অণু।

ওয়াশিং সোডা — সাধারণ কাপড় কাঁচা সোডা; সাদা, ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ। অবিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট ($Na_2CO_3, 10H_2O$)।

ওয়াশার—বল্টু বা স্ক্রু শক্ত করে আঁটবার জন্যে চামড়া বা কোন ধাতু-নির্মিত এক রকম ছিদ্র-যুক্ত যে চাকৃতি পরান হয়।

ওয়েল্ডিং — ধাতব পদার্থ জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া; অক্সি-অ্যাসিটিলিন ফ্লেম ↑।

ওয়েভ লেংথ — তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য; আলোক, শব্দ, বেতার প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নরূপ তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। স্থির জলে একটা ঢিল ফেললে যেমন জলের তরঙ্গ

ওয়েভ লেংথ

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এদেরও তেমনি হয়। একে বলে শক্তির তরঙ্গ-গতি (ওয়েভ-মোশন)। বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গের আকার ও দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এরূপ কোন একটি তরঙ্গের এক শীর্ষ

থেকেপরবর্তী তরঙ্গের অনুরূপ শীর্ষের ব্যবধান বা দূরত্বের মাপকে বলে ওয়েভ-লেংথ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। দৃশ্য আলোক-রশ্মির ওয়েভ-লেংথ মোটামুটি 4×10^{-5} থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার ↑; এক্স-রশ্মির ↑ ওয়েভ লেংথ প্রায় 10^{-6} থেকে 10^{-9} সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। 10^{-5} সেন্টিমিটার = ·00001 অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ।

ক

কণ্টুর লাইন—মানচিত্রে যে-সকল রেখা টেনে কোন দেশের সমান উচ্চতা-বিশিষ্ট বিভিন্ন স্থান সমূহ দেখান হয়।

কণ্টুর লাইনস্

কন্‌জার্ভেসান অব এনার্জি শক্তির অবিনশ্বরতা। জগতে কোন-রূপ শক্তিই মূলতঃ সৃষ্টি করা যায় না, শক্তির বিনাশও নেই; এক রকম শক্তিকে অন্য রকম শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় মাত্র। ইলেক্‌ট্রিক হিটার, স্টোভ প্রভৃতিতে তড়িৎ-শক্তিকে তাপ-শক্তিতে পরিণত করা হয়। ইঞ্জিনে কয়লার তাপ-শক্তিকে কৌশলে গতীয় শক্তিতে (কাইনেটিক এনার্জি ↑) রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু মূলতঃ আমরা কোন শক্তি সৃষ্টি করতে পারি না, বা কোন শক্তিকে একেবারে বিনষ্ট করতেও পারি না। এই ব্যাপারটাকেই বলে প্রিন্সিপ্‌ল অব কন্‌জার্ভেসান অব এনার্জি। এ কথা পদার্থের বেলায়ও সত্য; পদার্থেরও সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, বিভিন্ন ব্যাপারে পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র। একে বলে কন্‌জার্ভেসান অব ম্যাটার, বা পদার্থের অবিনশ্বরতা।

কঞ্জাংটিভা—চক্ষুগোলকের উপরি-ভাগে বিস্তৃত স্বচ্ছ আচ্ছাদন পর্দা; যার মধ্যভাগ মোটা হয়ে চোখের তারকা অংশের সৃষ্টি হয়েছে।

কঞ্জাংটিভা

কাঞ্জাংটিভার ওই মধ্যভাগকেই বলা হয় কর্ণিয়া।

কনিফেরা—ফার, পাইন প্রভৃতি জাতীয় যে-সব উদ্ভিদের বীজ কোন বীজাধারে (ওভারি) আবদ্ধ থাকে না। এরূপ উন্মুক্ত বীজোৎপাদক উদ্ভিদকে জাইমোস্পার্ম-ও বলা হয়। বায়ুর সাহায্যে এদে[র] ফুলে রেণু-নিষেক ঘটার ফ[লে]

ওইরূপ বীজ উৎপন্ন হয়। চিত্রে 'প' পাইন, 'ফ' ফার গাছ এবং 'ব' এ-জাতীয় বীজ দেখান হয়েছে।

কনিফেরা

কম্পোস্ট — এক রকম উদ্ভিজ সার; লতাপাতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে এরূপ সার প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এর মধ্যে উদ্ভিদের পরিপোষক নাইট্রোজেন-বহুল উৎকৃষ্ট সার জন্মায়।

কম্পোজিটা — উদ্ভিদের এক শ্রেণী বিশেষ; ডেইজি প্রভৃতি যে সব স-পুষ্পক উদ্ভিদের ফুল বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পূর্ণ ফুলের একত্র সমাবেশে গঠিত হয়।

কম্পোজিটা

কমেট — ধূমকেতু; উজ্জ্বল গ্যাসীয় জ্যোতিষ্ক বিশেষ। সূর্যের আকর্ষণে সুদীর্ঘ অধিবৃত্ত কক্ষপথে এরূপ জ্যোতিষ্ক মহাবেগে ছুটে চলে। কদাচিৎ সৌর মণ্ডলে প্রবেশ করায় পৃথিবী থেকে অল্প কালের জন্যে দেখা যায়। এর একটা অত্যুজ্জ্বল কেন্দ্র ও অনুজ্জ্বল দীর্ঘ পুচ্ছ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

কমিউটেটর--এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যার সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহের গতি পরিবর্তন করা হয়। বিভিন্ন ইলেকৃট্রিক সার্কিটের ↑ তড়িৎ-প্রবাহকে পর পর সংগ্রহ করা, বা তড়িৎ-প্রবাহকে বিভিন্ন সার্কিটে প্রেরণ করার এ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ডায়নামো ↑ যন্ত্রে প্রয়োজনানুসারে অল্টারনেটিং (এ সি.) ↑ কারেন্টকে ডাইরেক্ট (ডি. সি.) কারেন্টে পরিবর্তিত করবার জন্যেই এই কমিউটেটর যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।
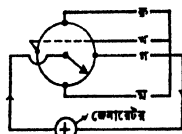
কমিউটেটর

করোলা — ফুলের বীজকোষের চারি দিকে চক্রাকারে সজ্জিত দল বা স্তবক; এর প্রধান কাজ হোল বর্ণশোভায় আকৃষ্ট করে রেণু-নিষেকের সাহায্যের জন্যে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট করা।

করোলা

কস্‌মিক-রে — মহাজাগতিক রশ্মি; মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন মৌলিক কণিকা, বিশেষ করে তড়িতাবিষ্ট (আয়ন ↑) কণিকাসমূহ বায়ুমণ্ডল

ভেদ করে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে অহরহ বর্ষিত হচ্ছে। এই তড়িৎ কণিকার ধারা আসছে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে, আর তা আলোক-রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ছে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় এর নিউট্রন, প্রোটন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন কণিকার পরস্পর সংঘাতে মেসন ↑ নামে এক রকম নূতন কণিকার সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠে যে কস্‌মিক রশ্মি পৌঁছায় তার প্রায় তিন চতুর্থাংশই এই মেসন কণিকা। জগতের সৃষ্টি রহস্যের মূলে এর প্রভাব কতখানি তা বিশেষ গবেষণার বিষয়।

কাইমোগ্রাফ — শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎ-স্পন্দন প্রভৃতির গতি-নির্দেশক এক রকম যন্ত্র বিশেষ। ভূষা কালি মাখানো একটা গোলাকার পাত্রের গায়ে একরকম কলমের অগ্রভাগ লাগানো থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় ও ই কলম বিভিন্ন
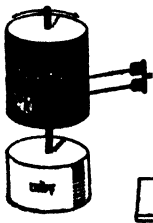
কাইমোগ্রাফ

স্পন্দনের গতি অনুযায়ী চলাচল করে তড়িৎ-প্রভাবে ঘূর্ণায়মান পাত্রটার গায়ে রেখাপাত করে।

কার্টিলেজ—প্রাণীদেহের নরম হাড়; উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ↑ না থাকায় এরূপ অস্থি নমনীয় ও স্থিতি-স্থাপক হয়ে থাকে। শিশুর দেহে যথেষ্ট কার্টিলেজ থাকে, যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম পেয়ে কঠিন হাড়ে পরিণত হয়।

কার্বন—মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন C, পারমাণবিক ওজন 12·01 পারমাণবিক সংখ্যা 6; খনিজ কয়লা, কাঠ-কয়লা, ভূষাকালি, গ্র্যাফাইট ↑, হীরক প্রভৃতি পদার্থের প্রধান মৌলিক উপাদান। খাদ্যের কার্বন অংশের দহনক্রিয়ার ফলেই জীবদেহে তাপ ও শক্তির সঞ্চার
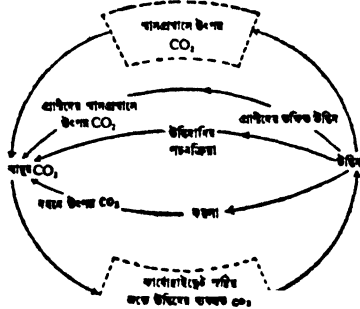
কার্বন সাইক্‌ল

হয়। বিভিন্ন ধাতব পদার্থের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন কার্বাইড ↑ সল্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাতাসে কিছু কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে, এজন্যে চুণের জল খোলা বাতাসে রাখলে সাদা হয়ে যায়, ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী

হয়। জীবের দেহাভ্যন্তরে শ্বাসবায়ুর অক্সিজেন খাদ্যের কার্বন অংশ পুড়িয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ↑ গ্যাস সৃষ্টি করে, আর তা প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ুতে মিশে যায়। এদিকে উদ্ভিদ আবার সেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে তার কার্বন অংশে দেহের পুষ্টি সাধন করে, অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। আবার সেই কার্বন-বহুল উদ্ভিজ্জ খাদ্য খেয়ে প্রাণীরা বেঁচে থাকে। এভাবে কার্বন প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরছে; এই ব্যাপারটাকে বলে কার্বন সাইকল বা কার্বনের চক্রগতি।

কার্বাইড — কার্বাইড নানারকমের হতে পারে, বিশেষভাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড বুঝায়; ক্যালসিয়াম ও কার্বনের যৌগিক পদার্থ, CaC_2; বিশুদ্ধ অবস্থায় সাদা থাকে, সাধারণতঃ ধূসর বর্ণের কঠিন পদার্থরূপেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে জল দিলে এসিটিলিন ↑ গ্যাস (C_2H_2) জন্মায়, যা বার্ণারে জ্বালালে আলো দেয়। একেই বলে কার্বাইড লাইট। ক্যালসিয়াম অক্সাইড ↑ বা চুণের সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে ইলেক্ট্রিক চুল্লীতে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে কার্বাইড তৈরী করা হয়।

কার্বোহাইড্রেট — এক শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যোগিক পদার্থ; সাধারণ রাসায়নিক সূত্র HCOH. শ্বেতসার, শর্করা, গ্লুকোস, ↑ সেলুলোজ ↑ (কাঠের আঁস) প্রভৃতি হোল বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট পদার্থ। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট অংশই জলে পুড়ে হজম হয়ে দেহের তাপ ও শক্তি জোগায়।

কার্বনিক অ্যাসিড — কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের জলীয় দ্রব, H_2CO_3; অত্যন্ত মৃদু অ্যাসিড। উন্মুক্ত রাখলে প্রায় সম্পূর্ণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যায়। এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন সল্টই হোলো বিভিন্ন কার্বনেট। অনেক সময় এ থেকে (অ্যাসিড সল্ট ↑) বাইকার্বোনেটও সৃষ্টি হয়। চাপ প্রয়োগ করে কৌশলে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত করে সোডা ওয়াটার তৈরী হয়; মূলতঃ জিনিসটা কার্বনিক অ্যাসিড।

কার্বলিক অ্যাসিড — এর অপর নাম ফিনল; রাসায়নিক সূত্র C_6H_5OH; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়, বিষাক্ত পদার্থ, তীব্র অ্যাসিড-ধর্মী, যাতে লাগে পুড়ে যায়। একটা বিশেষ গন্ধ আছে। বীজাণুরোধক (ডিস্-

ইন্‌ফ্যাক্ট্যান্ট) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; রং ও প্লাস্টিক↑ শিল্পেও এর যথেষ্ট প্রয়োজন।

কার্বুরেটর — পেট্রল-চালিত ইঞ্জিনের একটা যন্ত্রাংশ; এর সাহায্যে জ্বালানি তেলের সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ বায়ু মিশ্রিত হয়ে সিলিণ্ডারের মধ্যে যায়; সেখানে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের (ইলেক্‌ট্রিক স্পার্ক) সংস্পর্শে ও ই মিশ্রিত পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ইণ্টারন্যাল
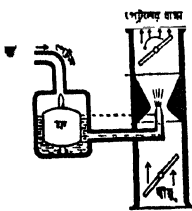
কার্বুরেটর

কম্বাস্‌সন↑ বা আভ্যন্তরীন দহন-ক্রিয়া। এর তাপে উৎপন্ন গ্যাসের সাহায্যে ইঞ্জিন চলে।

কার্বোর‍্যাণ্ডাম—গাঢ় ধূসর বর্ণের এক রকম স্ফটিকাকার পদার্থের বিশেষ নাম; রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা সিলিকন কার্বাইড (SiC)। এর কাঠিন্য প্রায় হীরকের মত; ধাতব পদার্থের ধার তীক্ষ্ণ করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। সিলিকা↑ (SiO_2) বা বালি ও কয়লা মিশিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেসে↑ প্রায় 2000° সেণ্টিগ্রেড তাপে গলিয়ে পদার্থটা উৎপন্ন হয়।

কাস্ট আয়রন — অবিশুদ্ধ ভঙ্গুর লৌহ, যাকে পিগ-আয়রন বলা হয়। খনিজ লৌহ থেকে ব্লাষ্ট ফার্নেস-এর সাহায্যে এই অবিশুদ্ধ লৌহ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 2% থেকে 4·5% কার্বন, কিছু ম্যাঙ্গানিজ↑, গন্ধক, সিলিকন প্রভৃতি থাকে। গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে এ দিয়ে রেলিং, কড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী হয়। ভঙ্গুর বলে এ-রকম লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে কোন জিনিস তৈরী করা যায় না; আগে একে স্টীল↑ বা রট্‌-আয়রন করে নিতে হয়

কিউমুলাস্‌—ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ; যে মেঘরাশি আকাশের গায়ে জমে ঘণীভূত হওয়ার ফলে তার প্রান্তদেশ সুস্পষ্ট রেখায় পরিদৃষ্ট হয়।

কিউমুলাস্‌

কিপ্‌স অ্যাপারেটাস—রসায়নাগারে বিভিন্ন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। উত্তাপ ব্যতিরেকে কঠিন পদার্থের উপর তরল পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কোন গ্যাস উৎপন্ন হলে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যতক্ষণ ওই গ্যাস ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে গ্যাসটা

উৎপন্ন হতে থাকে। নির্গমন-নল বন্ধ করলে গ্যাসের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়।

কিপ্‌স অ্যাপারেটাস
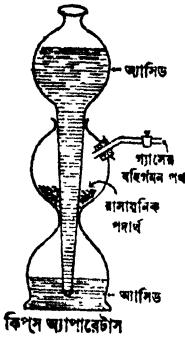
কিলো—মেট্রিক একককে হাজার অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়; যেমন—কিলোগ্র্যাম—এক হাজার গ্র্যাম↑, কিলোমিটার—এক হাজার মিটার↑ ইত্যাদি।

কেফিন — সাদা স্ফটিকাকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ; গলনাংক 235° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কফি ও চায়ের পাতা থেকে নিষ্কাশিত একটা অ্যাল্‌কালয়েড↑ পদার্থ। ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়; হৃৎপিণ্ডের উপর এর বিশেষ ভেষজ-শক্তি আছে।

কেজিন—দুধের প্রোটিন অংশ; শুষ্ক ছানা। সামান্য হলদে পদার্থ। গরম দুধে অ্যাসিড বা কোন অম্ল পদার্থ মেশালে কেজিনের ভাগ পৃথক হয়ে যায়। কৃত্রিম সূতা, প্ল্যাস্টিক, রং, পেইন্ট প্রভৃতি নানা শিল্পে এর ব্যবহার আছে। কেজিন দিয়ে যে প্ল্যাস্টিক তৈরী হয় তাতে সহজেই সুদৃশ্য রং ধরে, দামেও সস্তা পড়ে। এ-দিয়ে বোতাম, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়।

কস্টিক অ্যালকালি — কস্টিক পটাস বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH) এবং কস্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH)। এ-গুলো অত্যন্ত ক্ষারধর্মী, হাতে লাগলে হাত জ্বলে যায়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এই অ্যালকালি↑ দুটার যথেষ্ট প্রয়োজন হয়।

কেমোথিরাপি — চিকিৎসা পদ্ধতি বিশেষ; যাতে কোনরূপ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা হয়, কিন্তু রোগীর শরীরের উপর তার কোন প্রভাব বিস্তার করে না; যেমন—নিউ-মোনিয়া রোগে সাল্‌ফোনেমাইড দেওয়া হয়, সিফিলিসে স্যাল্‌ভার্সন। সাধারণ ঔষধে রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গগুলো কমায়, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়; কিন্তু কেমোথিরাপির ঔষধে কেবল জীবাণুনাশের কাজ করে মাত্র।

কোকেন—অ্যালক্যালয়েড↑ শ্রেণীর এক রকম সাদা কঠিন উদ্ভিজ্জ পদার্থ কোকা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ

থেকে প্রাপ্ত। পদার্থটা বিশেষ অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু এর উগ্র মাদকতা দোষ আছে, দুরন্ত নেশার জিনিস। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারেই [illegible] প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

কোচিনিল—কক্কাস-ককৃটি নামব এক প্রকার পোকার শুষ্ক মৃতদে থেকে যে [illegible] পাওয়া যায়।

কোলন—বৃহদন্ত্র বিশেষ; ক্ষুদ্রান্ত্রে নিম্নাংশ থেকে যে অপেক্ষাকৃ মোটা নল ডান দিক থেকে সোজ উপরে উঠে ঘুরে আবার বাঁ-দি থেকে নীচে নে গেছে। এর ওই ড দিকের অংশকে বা উধ্বর্গামী কোল পরবর্তী অংশ সমা রাল কোলন, অ বাঁ-দিকের অংশকে বলে নিম্নগা কোলন।

কোলন

কোলয়েড—কর্দমাক্ত জলে কাদ মাটির কণিকাগুলো অপেক্ষাকৃ বড় বড়, জলে মিশে যায়, বি সময়ে থিতিয়ে তলায় জ লবণ গোলা জলে লবণের অ গুলো জলের অণুর সঙ্গে ওতপ্রো ভাবে মিশে যায়; দ্রাব্য ও দ্রা নিজে থেকে আর আলাদা হতে পারে না। এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি হলে দ্রাব্য পদার্থকে কোলয়েড বলে। কোন পদার্থ কোলয়েড অবস্থায় এমন সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হয় যে, দ্রাবক পদার্থের মধ্যে সেগুলো সমানভাবে সর্বক্ষণ ভেসে থাকে। প্রকৃত দ্রবের ন্যায় একেবারে দ্রাবকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায় না সত্য, কিন্তু ফিল্ট্রেসনেও ↑ পৃথক করা যায় না। পদার্থের এরূপ অবস্থাকে বলে কোলয়েড্যাল স্টেট। কোন তরল দ্রবের মধ্যে কোন কঠিন দ্রাব্য বস্তু কোলয়েড্যাল অবস্থায় থাকলে ওই দ্রবকে কোলয়েড্যাল সল্যুসন ↑ বলা হয়। দুধকে এরূপ একটা কোলয়েড্যাল সল্যুসন বলা যেতে পারে।

কোমা—সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগীর এরূপ অচৈতন্য অবস্থাকে কোমা স্টেজ বলা হয়।

কোপারনিকাস্ সিস্টেম—ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী কোপারনিকাস্ প্রচার করেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সব আপন আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে; জ্যোতির্বিদ্যায় সৌর পরিবারের গতি সম্পর্কীয় এই বিধান। আগে টলেমি

নামক এক পণ্ডিতের এরূপ এক ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই সূর্য ও গ্রহগুলি ঘুরে চলেছে; যেমন আমরা সহজ বুদ্ধিতে সাদা চোখে দেখতে পাই।

কোরাণ্ডাম্— অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের স্ফটিকাকার কঠিন দানা। এর কাঠিন্যও কার্বোর্যাণ্ডামের ↑ মত, প্রায় হীরকের তুল্য। এর র্ণ দিয়ে অস্ত্রাদিতে শান্ দেওয়ার গোলাকার পাথর তৈরী হয়।

ক্যাকোডিল — আর্সেনিক-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ; বিশেষ এক রকম দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত। পদার্থটা মিশিয়ে তরল রাবার তাড়াতাড়ি ঘণীভূত করে প্রয়োজনানুরূপ কঠিন করা যেতে পারে।

ক্যাড্মিয়াম—মৌলিক ধাতু; সাদা নরম পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Cd; পারমাণবিক ওজন 112·41, পারমাণবিক সংখ্যা 48. জিঙ্ক ↑ বা দস্তার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় খনিজরূপে পাওয়া যায়। অতি নিম্ন-গলনাংকের বিভিন্ন সংকর ধাতু তৈরী করার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ↑ ব্যবস্থায়ও এর ব্যবহার আছে।

ক্যানাডা ব্যাল্সাম্ — রজন জাতীয় এক রকম উদ্ভিজ্জ আঠালো পদার্থ। ব্যালসাম্ মাত্রেরই একটা সুগন্ধ আছে। উদ্বায়ী পদার্থ, নানা রকম ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এ-দিয়ে কাঁচের উপর কাঁচ এঁটে লাগান যেতে পারে।

ক্যাণ্ডেল পাওয়ার — আলোকের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের একক। আলোকের কোন উৎস থেকে কতটা আলোকরশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তা আজকাল ক্যাণ্ডেলা এককে প্রকাশ করা হয়; পূর্বে হোত একটা নির্দিষ্ট মাপের মোমবাতির বিকিরিত আলোকের হিসেবে। ক্যাণ্ডেলা হোল এক বর্গ সেণ্টি-মিটার আয়তনের কোন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ 1773·5° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড (প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর গলনাংক) তাপে যতটা আলো বিকিরণ করে তার 60 ভাগের এক ভাগ। এই ঔজ্জ্বল্যকে নিউ-ক্যাণ্ডেল পাওয়ার-ও বলা হয়। একটা 40 ওয়াটের ↑ সাধারণ ইলেক্ট্রিক বাতির ঔজ্জ্বল্য প্রায় 36 ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বা ক্যাণ্ডেলা; 100 ওয়াটের বাতির ঔজ্জ্বল্য সাধারণতঃ প্রায় 120 ক্যাণ্ডেল পাওয়ার হয়ে থাকে।

ক্যাট্-আয়ন — ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন কণিকা। ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ধাতব পদার্থের এই ক্যাট-আয়নগুলোই ঋণ-তড়িৎদ্বার বা

ক্যাথোড ↑ প্লেটের আকর্ষণে তার গায়ে গিয়ে লেগে যায়।

ক্যাটালিস্ট — অনুঘটক ; যে সব পদার্থ অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর করে, অথচ নিজে ওই রাসায়নিক ক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না, অপরিবর্তিত থাকে। এরূপ পদার্থকে **ক্যাটালাইট**-ও বলা হয়। রসায়ন শিল্পে নানা-রকম ধাতব ক্যাটালিস্ট ব্যবহৃত হয়। সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর সামান্য পরিমাণ চূর্ণ, বা কোন ধাতব অক্সাইড মেশালে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **ক্যাটালিসিস**। আবার অনেক সময় কোন কোন জৈব পদার্থও ক্যাটালিস্টের কাজ করে থাকে (এনজাইম ↑) ; যেমন, ঈস্টের ↑ সাহায্যে চিনি অ্যাল-কোহলে পরিণত হয়।

ক্যাথোড—ঋণ-তড়িৎদ্বার (নেগেটিভ ইলেক্ট্রোড়); ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ ,আর্ক ল্যাম্প ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-প্রবাহের ঋণ-তড়িৎ প্রান্ত। ধন-তড়িৎ প্রান্তকে বলে অ্যানোড। ক্যাথোড ↑ ও অ্যানোড ↑ উভয় তড়িৎ-দ্বারই বিশেষ বিশেষ তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থে তৈরী হয়। ক্যাথোড থেকে ঋণ-তড়িতাবিষ্ট ইলেক্ট্রন কণিকা ধারাকারে ছুটে গিয়ে অ্যানোডে পৌছায়। এভাবে এক্স-রে টিউব ↑ , রেডিও ভাল্ব ↑ প্রভৃতি-তেও ইলেক্ট্রন-গুলো ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে অল্প পরিমাণ গ্যাসে পূর্ণ বা প্রায় বায়ুশূন্য ব্যবধান অতিক্রম করে ধারাকারে অতি দ্রুত অ্যানোডে চলে যায়।
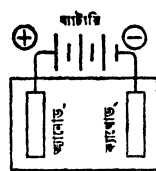
ক্যাথোড্

ক্যাথোড-রে-টিউব — সামান্য পরিমাণ গ্যাসে ভর্তি বা মোটামুটি বায়ুশূন্য যে টিউবের অভ্যন্তরস্থ ঋণ-তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড ↑) থেকে ইলেক্ট্রন ↑ কণিকার ধারা-প্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়। এই ধারা-প্রবাহের ধর্ম অদৃশ্য আলোক রশ্মির অনুরূপ ; এজন্যে একে ক্যাথোড-রশ্মি বলা হয়। এই ক্যাথোড-রে-টিউব নামক যন্ত্রে ওই ক্যাথোড রশ্মিগুলোকে বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ মাখানো পর্দার উপর ফেলা হয়। এর ফলে যে যে জায়গায় ওই রশ্মি পতিত হয় সেই সেই জায়গাগুলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে নানা রকম বৈদ্যুতিক স্পন্দনের পরিমাপ ও তথ্যাদি নিরূপণ করা চলে।

এজন্যে এরূপ যন্ত্রকে ক্যাথোড-রে অসিলোস্কোপ-ও বলা হয়।

ক্যামেরা-লুসিডা — দর্পণের মত একটা যন্ত্রাংশ বিশেষ। এর সাহায্যে মাইক্রোস্কোপে ↑ দৃষ্ট বস্তুর হুবহু ছবি পার্শ্বস্থিত কাগজের উপরে ফেলা যায়। মাইক্রোস্কোপে কোন ক্ষুদ্র জিনিসের বর্ধিতাকার প্রতিচ্ছবি থেকে তার ভিতরকার সূক্ষ্ম খুঁটি-নাটি পর্যবেক্ষণ করা যায় সত্য, কিন্তু তা থেকে সোজাসুজি ছবি এঁকে রাখা যায় না। এজন্যে মাইক্রোস্কোপের আইপিসের ↑ কাছে বিশেষ ধরণের এরূপ একখানা শয়ান দর্পণ সংলগ্ন করে তার সাহায্যে সেই বর্ধিতাকার ছবি পার্শ্বস্থ কাগজের উপরে প্রতিফলিত করা হয়। এর উপরে পেন্সিল টেনে সহজেই সেই ছবি হুবহু এঁকে রাখা যেতে পারে।

ক্যারেট — (1) সোনা, মণি, মুক্তা প্রভৃতি ওজন করবার এক রকম মাপ; প্রায় $\frac{1}{5}$ গ্রাম ↑, বা 3·17 গ্রেণ। (2) সোনার বিশুদ্ধতা পরিমাপের একক হিসেবেই ক্যারেট কথাটা সবিশেষ প্রচলিত। সোনায় কতটা খাদ আছে তা এ-দিয়ে প্রকাশ করা হয়। খাদ মেশান সোনার 24 ভাগের মধ্যে কত ভাগ খাটি সোনা আছে তা এই ক্যারেটের হিসেবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে; যেমন—24 ক্যারেট সোনা হোল খাটি সোনা; 18 ক্যারেট সোনা বললে 24 ভাগের মধ্যে 18 ভাগ খাটি সোনা আছে বুঝতে হবে।

ক্যাল্‌সাইট — স্বাভাবিক ক্যাল-সিয়াম কার্বনেট: কঠিন স্ফটিকাকার পদার্থ। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রস্তর এই পদার্থে গঠিত।

ক্যালসিয়াম—সাদা ও নরম এক প্রকার মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Ca, পার-মাণবিক ওজন 40·08, পার-মাণবিক সংখ্যা 20; এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ প্রকৃতিতে নানা ভাবে নানা আকারে ছড়িয়ে আছে। এর হাইড্রক্সাইড হোল সাধারণ চূণ, $Ca(OH)_2$; ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCO_3$ হোল খড়িমাটি (চক্ ↑) ও বিভিন্ন পাথর; ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড $CaCl_2$ অন্য পদার্থের জল শুষে নেয়; রঞ্জন শিল্পেও এর যথেষ্ট দরকার হয়। ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) তাড়াতাড়ি শুকিয়ে শক্ত হয় বলে এ-দিয়ে প্ল্যাষ্টার-অব-প্যারিস তৈরী হয়। প্রাণীদেহের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে (CaO)

কুইক-লাইম বলে ; এর মধ্যে জল দিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, যার রাসায়নিক নাম স্লেক্‌ড্‌ লাইম, সাধারণ চুণ

ক্যাল্‌কুলাস — গণিত শাস্ত্রের অংশ বিশেষ। ক্রমাগত পরিবর্তনশীল রাশি সম্পর্কে বিভিন্ন গাণিতিক সমাধানের কৌশল এতে আলোচিত হয়। ক্যালকুলাস দু-রকম— ডিফারেন্সিয়্যাল ও ইণ্টিগ্র্যাল এর সাহায্যে নানারকম উচ্চতম গাণিতিক জটিল তথ্যের সমাধান করা সম্ভব হয়ে থাকে।

ক্যালিস্‌ — অবিশুদ্ধ স্বাভাবিক সোডিয়াম নাইট্রেট ↑ ($NaNO_3$) ; চিলি রাজ্যে খনিজরূপে প্রচুর পাওয়া যায়, তাই একে চিলি সল্ট-পিটারও বলে। বাংলায় সোরা নামে পরিচিত।

ক্যালিপার্স — সামান্য দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য নিখুঁতভাবে মাপার এক রকম যন্ত্র। কোন তার বা রডের ব্যাস এ-দিয়ে সহজে মাপা যায়। সরু পাইপের ভিতর ও বাহিরের ব্যাস মাপবার জন্যেও এ-টা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্যালিপার্স

ক্যালোমেল —পারদ ও ক্লোরিনের একটা যৌগিক পদার্থ, যার রাসায়নিক নাম মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড (Hg_2CL_2)। বিশেষ ভারী, সাদা, অদ্রাব্য পদার্থ ; জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালোরি — কোন পদার্থে নিহিত মোট উত্তাপ বা তাপশক্তি পরিমাপের একক বিশেষ। এক গ্রাম জল 1° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপ দরকার হয়, অন্য কথায় 1° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত 1 গ্র্যাম জল ঠাণ্ডা করলে যতটা তাপ পাওয়া যায়, তাই হোল এক ক্যালোরি। এক গ্র্যাম জল 14·5° থেকে 15·5° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, সেই তাপকে এক 'স্মল ক্যালোরি' বা 'গ্র্যাম ক্যালোরি' বলা হয়। আর 1000 গ্র্যাম-ক্যালোরি তাপকে বলে 'কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি' বা এক 'লার্জ ক্যালোরি'। বিভিন্ন খাদ্যের তাপ উৎপাদনের শক্তি এর সাহায্যে উল্লেখ করা হয়।

ক্যালোরিফিক ভ্যালু — কোন জ্বালানি পদার্থের তাপ উৎপাদন শক্তির পরিমাপ। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি সম্পূর্ণরূপে জ্বলে ভস্মীভূত হলে যে পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাকেই বলে পদার্থটার

'ক্যালোরিফিক ভ্যালু'। যেমন—এক পাউণ্ড কয়লা জলে যত পাউণ্ড-ক্যালোরি তাপ সৃষ্টি হয় ওই কয়লার ক্যালোরিফিক ভ্যালু বা 'থার্মাল ইউনিট' ↑ হবে তত।
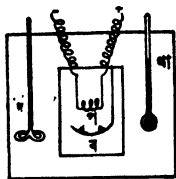
ক্যালোরিমিটার — কোন পদার্থে নিহিত বা পরিবাহিত তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবার জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। এরূপ সাধারণ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে তামা বা অন্য কোন ধাতুর একটা বিশেষ আকারের পাত্র; ধাতুটার স্পেসিফিক হিট্ ↑ জানা থাকলে ওই পাত্রে রেখে কৌশলে অন্যান্য পদার্থের তাপ থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে সহজেই বার করা যায়।

ক্যালোরিমিটার

ক্রায়োলাইট — সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড, Na_3AlF_6; খনিজ পদার্থ। অ্যালুমিনিয়াম ↑ ধাতু সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

ক্রোমিক অ্যাসিড—ক্রোমিয়াম ট্রাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত করে উৎপন্ন হয় (H_2CrO_4); এর বিভিন্ন সল্টকে বলে ক্রোমেট। বিভিন্ন ক্রোমেট সল্ট রং তৈরী ও ফটোগ্রাফি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। লেড্-ক্রোমেটকে বলে ক্রোম-ইয়েলো; এক রকম হলদে রং। ক্রোম-অ্যালাম হোল ক্রোমিয়াম পটাসিয়াম সালফেট, যা রঞ্জন শিল্পে ও চামড়া ট্যান করবার কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ক্রোমিয়াম—মৌলিক ধাতু, সাদা কঠিন পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Cr, পারমাণবিক ওজন 52·01, পারমাণবিক সংখ্যা 24; প্রাকৃতিক ক্রোম-আয়রন (ক্রোমাইট) থেকে নিষ্কাশিত হয়। মরিচাহীন ইস্পাত তৈরী করতে এবং ক্রোমিয়াম প্লেটিং-এর (ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ↑) কাজে প্রয়োজন হয়।

ক্রোমোসোম—জীবের দেহ-কোষের কেন্দ্রীনে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ। কোন রং মেশালে জীবকোষের একটা অংশে রং ধরে, বাকী অংশ বর্ণহীন থেকে যায়। এই রঙিন অংশকে বলে ক্রোম্যাটিন। কোন জীব-কোষ ভেঙে ফেললে ওই ক্রোম্যাটিন অংশ অতি সূক্ষ্ম কাঠির মত ক্রোমোসোমগুলোর গায়ে লেগে যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এ-সব নানাভাবে পরিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহকোষে বিভিন্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। মানুষের

কোষে 48টি ক্রোমোসোম রয়েছে। এ-রকম বিভিন্ন প্রাণীর দেহকোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে ; অর্থাৎ একই জাতীয় জীবের প্রত্যেকটি কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের উপর জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রকৃতি, দোষ গুণ প্রভৃতি নির্ভর করে (জিন্ ↑)।

ক্রোনোমিটার—সময়-নিরূপক এক রকম ঘড়ি। সঠিক সময় নিরূপণের জন্যে এই যন্ত্র আজকাল বিভিন্ন মানমন্দিরে ও সমুদ্রগামী জাহাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্রোমোস্ফিয়ার—সূর্যের বহির্ভাগের জ্যোতিঃ স্তর ; এই স্তর সূর্যের ফোটোস্ফিয়ার ↑ অংশকে বেষ্টন করে আছে। সূর্য-গ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সৌর গোলকের এই স্তরের উজ্জ্বল আলোকছটা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয়।

ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল—কোন ঘন পদার্থের (যেমন, কাঁচ) মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা পদার্থের (যেমন, বায়ু) মধ্যে প্রবেশ করবার সময়ে ওই আলোকরশ্মি দুই মাধ্যমের সাধারণ তলে যে আপতন-কোণ (রিফ্রেক্‌সন্ ↑) সৃষ্টি করবে তা যদি একটা নির্দিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণের বেশী হয়, তাহলে ওই আলোক রশ্মি হাল্‌কা পদার্থে (বায়ুতে) আর প্রতিসরিত হয় না, সাধারণ তল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ঘন পদার্থেই ফিরে যায়। আলোকরশ্মির এরূপ প্রতিফলনকে বলে ইণ্টারন্যাল রিফ্লেক্‌সন্। আর ওই নির্দিষ্ট কোণকে বলা হয় ওই পদার্থের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল। কাঁচের এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল হোল 42°ডিগ্রি।

ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গল

ক্রিটিক্যাল প্রেসার—কোন গ্যাসীয় পদার্থ তার নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের ↑ উষ্ণতা বা তাপমাত্রায় উপনীত হলে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের ফলে তাকে তরল করা সম্ভব হয়। কোন গ্যাসকে তার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় অত্যধিক চাপ প্রয়োগ করেও তরল করা সম্ভব হয় না।

ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার — যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পৌছালে কোন গ্যাসকে কেবলমাত্র চাপ (ক্রিটিক্যাল প্রেসার ↑) প্রয়োগ করেই তরল

করা সম্ভব হয়। ওই তাপমাত্রার উর্দ্ধে কেবলমাত্র চাপের পরিমাণ বাড়িয়েই কোন গ্যাস কখন তরল করা সম্ভব হয় না।

ক্রিয়োজোট — এক রকম পাংশু-বর্ণের তৈলাক্ত পদার্থ; আলকাতরা থেকে বাষ্পীকরণ (ডিস্টিলেসন ↑) প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। কাঠ থেকেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পদার্থটা বেরোয়। এর মধ্যে ফিনল ↑ ও ক্রিসল নামক তরল রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কাঠ সংরক্ষণের জন্যে এই ক্রিয়োজোট তেল মাখান হয়। এর বীজাণু প্রতিরোধক (ডিস্ইন্ফেক্টিং ↑) গুণও আছে। সাধারণ ফিনাইল তৈরী করতে ক্রিয়োজোট ব্যবহৃত হয়।

ক্রিপ্টন—মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 83·7, পারমাণবিক সংখ্যা 36; বায়ুমণ্ডলের প্রায় 10 লক্ষ ভাগের এক ভাগ হোল এই গ্যাস। এর কোন রকম রাসায়নিক ক্রিয়াই নেই।

ক্রিপ্টল—কাদা মাটি, গ্রাফাইট ↑ ও কোরাণ্ডামের ↑ একটা সংমিশ্রণের বিশেষ নাম। তড়িৎ রোধক পদার্থ হিসেবে জিনিসটা ইলেক্ট্রিক ফার্নেসে (তড়িৎ-চুল্লী) ব্যবহার করা হয়।

ক্রুসিফেরা — উদ্ভিদের বিশেষ এক শ্রেণীর নাম; যাদের ফুলে মাত্র চারটি দল বা পাপড়ি থাকে।

ক্রুসিফেরা

ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার—ক্লিনিক্যাল কথাটার অর্থ হোল শয্যাশায়ী রোগী সম্পর্কীয়। তাই রোগীর দেহের তাপ নির্ধারণের জন্যে বিশেষ ধরণের যে থার্মোমিটার ↑ বা তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এর তাপমাত্রা ফারেন্হাইট ↑ স্কেলে নিরূপিত হয়ে থাকে।

ক্লোর্যাল — বর্ণহীন, কটুগন্ধবিশিষ্ট এক প্রকার তৈলাক্ত রসায়নিক পদার্থ, $CCl_3.CHO$; অ্যালকোহেলের ↑ সঙ্গে ক্লোরিনের ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঘুমের ঔষধ (নার্কোটিক ↑) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন পদার্থকে বলে ক্লোর্যাল হাইড্রেট; সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ।

ক্লোরিন—মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 35·457, পারমাণবিক সংখ্যা 17, সাংকেতিক চিহ্ন Cl; সবুজাভ হলদে ভারী

গ্যাস—শ্বাসরোধ-কারী তীব্র গন্ধ-বিশিষ্ট ও বিষাক্ত। এর বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ পৃথিবীতে নানা আকারে প্রচুর ছড়ান রয়েছে। সাধারণ লবণ হোল সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl ; পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসেই কম বেশী লবণ বিদ্যমান। সমুদ্রের জলে প্রচুর লবণ দ্রবীভূত আছে (সি-ওয়াটার ↑)। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl ; যার বিভিন্ন সল্ট হোল ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড-মিশ্রিত সমুদ্রজল থেকে ইলেক্ট্রো-লিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন সহজে প্রস্তুত করা যায়। এই গ্যাসের সাহায্যে পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করা হয়। বস্ত্রাদি সাদা (ব্লিচিং ↑) করতে ও জীবাণু-নাশক পদার্থ (ব্লিচিং পাউডার ↑) প্রভৃতি তৈরীর কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরোফর্ম—বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ; সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত ; রাসায়নিক সূত্র $CHCl_3$। অ্যানেস্থেটিক শক্তির জন্যে অস্ত্র চিকিৎসার সময়ে এ-দিয়ে রোগীকে অনুভূতি-শূন্য করে নেওয়া হয়।

ক্লোরোমাইসিটিন—ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার জৈব পদার্থ থেকে নিঃসৃত জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ। টাইফয়েড রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাতীয় ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাক আজ কাল রাসায়নাগারে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

ক্লোরোফিল—পত্র-হরিৎ ; উদ্ভিদের পত্রাদির কোষে সবুজবর্ণের যে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ-কণিকা রয়েছে। আধুনিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্লোরোফিল দু-রকম—ক্লোরোফিল-এ হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণ; আর ক্লোরোফিল-বি নীলাভ সবুজ। সূর্য কিরণের মাধ্যমে উদ্ভিদ এই ক্লোরোফিলের সাহায্যে শক্তি আহরণ করে ; এবং বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে শর্করা উৎপন্ন করে, অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে পুনরায় বাতাসে মিশে যায়। উদ্ভিদের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, ক্লোরোফিল ক্যাটালিষ্টের ↑ কাজ করে মাত্র (ফটো-সিন্থেসিস্ ↑)।

ক্লোরোপিক্রিন — এক রকম তৈলাক্ত তরল রাসায়নিক পদার্থ, CCl_3NO_2 ; পিক্রিক ↑ অ্যাসিডের সঙ্গে ক্লোরিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন। মারাত্মক বিষাক্ত। জীবাণু-নাশক ও ছত্রাকধ্বংসী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ

গল ব্লাডার — পিত্তাশয় ; যকৃৎ (লিভার) থেকে নিঃসৃত সবুজ বর্ণের পিত্তরস (বাইল) খাদ্যের তৈলাক্ত অংশ পরিপাকে সাহায্য করে। এই পিত্তরস লিভারের কাছে যে থলিতে সঞ্চিত হয় তাকে বলে গল-ব্লাডার।

গল ব্লাডার

গাটাপার্চা — প্রায় রাবারের মত এক প্রকার পদার্থ। মালয়ে উৎপন্ন এক শ্রেণীর উদ্ভিদের রস (ল্যাটেক্স) থেকে গাটাপার্চা তৈরী হয়ে থাকে। অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ ; তড়িৎ রোধক পদার্থ হিসেবে অনেক সময় বৈদ্যুতিক তারে এর আবরণ দেওয়া হয়।

গান কটন — নাইট্রোসেলুলোজ ↑, বা সেলুলোজ নাইট্রেট। অতি উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ। তুলা প্রভৃতি সেলুলোজ ↑ জাতীয় পদার্থের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়।

গান পাউডার—পটাসিয়াম নাইট্রেট (সল্টপিটার), গন্ধক ও কয়লার গুঁড়ার সংমিশ্রণে তৈরী বিস্ফোরক পদার্থ। এই বারুদে আগুন দিলে অতি দ্রুত সংঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে, এর ফলে প্রচুর গ্যাস ও ধূম জন্মায়। কামান বন্দুকের আবদ্ধ খোলের মধ্যে এরূপ বিস্ফোরণের ফলেই প্রচণ্ড শব্দ হয় ও উৎপন্ন গ্যাসের চাপে গোলা-গুলি ছুটে বেরোয়।

গান মেটাল — তামা, দস্তা (জিঙ্ক) ও টিনের সংকর ধাতু। এক প্রকার ব্রোঞ্জ ↑ ; সামান্য নীলাভ ধূসর বর্ণ। এর মধ্যে প্রায় 90% তামা, 6 থেকে 8% টিন ও 2 থেকে 4% দস্তা থাকে।

গাম অ্যারাবিক — অ্যাকেসিয়া নামক উদ্ভিদের বিশুদ্ধ রস ; সাধারণ গঁদের আঠা। আঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ঔষধেও লাগে। আরও নানারকম গাম আছে ; সবই উদ্ভিজ্জ পদার্থ।

গামা-আয়রন — অত্যধিক তাপসহনশীল এক রকম (ইস্পাত) লোহা, যাকে অষ্টেনাইট-ও বলা হয়। সামান্য কার্বন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ ↑ প্রভৃতি মিশিয়ে সাধারণ লোহাকে এরূপ ষ্টিল ↑ বা ইস্পাতে পরিণত করা হয়। বিশেষ কঠিন এক রকম ব্রাস ↑ বা পিতলকে গামা-ব্রাস বলে।

গামা-রে — গামা রশ্মি ; বিভিন্ন স্বয়ম্প্রভ (রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑) পদার্থ থেকে যে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এই রশ্মি এক্স-রশ্মির ↑ অনুরূপ ; কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও কম। এটা প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ-

চৌম্বকীয় তরঙ্গ মাত্র। রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রনের তরঙ্গধারা (বিটা-রশ্মি ↑) বিচ্ছুরণের সঙ্গে সঙ্গে এই গামা-তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয়। গামা-রশ্মি খুব মোটা ধাতব বাধাও ভেদ করতে পারে; কিন্তু দু-মাইলের অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে যেতে পারে না। এই রশ্মি প্রাণী দেহের রক্ত-উৎপাদক কোষ নষ্ট করে ফেলে, কাজেই প্রাণীদের পক্ষে এটা বিশেষ মারাত্মক।

গেস্‌লার-টিউব — বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের দীপ্তি এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরীক্ষা করা হয়। এটা একটা লম্বা কাচের টিউব মাত্র। (অবশ্য এই কাচেরটিউব বিভিন্ন আকৃতিরও হতে পারে)

গেস্‌লার টিউব

টিউবটা থাকে প্রায় বায়ুশূন্য, সামান্য পরিমাণ কোন গ্যাসে পূর্ণ। ওর ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে গ্যাসের পরমাণুগুলো ইলেক্ট্রনের সংঘাতে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে এ-রকম দীপ্তি বিভিন্ন বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

গেলুসাক্স-ল — দুটা গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থটাও যদি গ্যাসীয় হয়, তবে ওই উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন উৎপাদক গ্যাস দুটার আয়তনের আনুপাতিক হবে। এই নিয়ম অনুযায়ী এক ঘন ফুট অক্সিজেন ও দুই ঘন ফুট হাইড্রোজেনের মিলনে হবে দুই ঘন ফুট জলীয় বাষ্প। অবশ্য 100° সেন্টিগ্রেডের বেশী তাপে এই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটান চাই, নতুবা উৎপন্ন পদার্থ গ্যাসীয় হবে না, হবে জল। আবার সর্বদা একই তাপ ও চাপে গ্যাসগুলোর আয়তন মাপতে হবে। ফরাসী বিজ্ঞানী গে-লুসাক্ এই তথ্য নির্ধারণ করেন।

গেজ — পরিমাপক যন্ত্র; যেমন—পেট্রল-গেজ, প্রেসার-গেজ ইত্যাদি। আবার সরু তারের ব্যাস নিখুঁত-ভাবে মাপবার জন্যে মাইক্রোমিটার গেজ ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোমিটার গেজ.

রেল লাইনের দুটা রেলের মাঝে 7 ফুট ব্যবধান থাকলে বলে **ব্রড-গেজ** এবং 3 ফুট 6 ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে বলে **ন্যারো-গেজ** লাইন।

গেইজার—(1) উষ্ণ-প্রস্রবণ; ভূগর্ভ থেকে স্বভাবতঃ গরম জলের যে ধারা উৎসারিত হয়। (2) যে যন্ত্রে প্রবিষ্ট জল বিশেষ ব্যবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে নল পথে

বেরিয়ে আসে। শীতপ্রধান দেশে এরূপ যন্ত্র স্নানের ঘরে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রের উপর দিকের নলপথে জল প্রবেশ করে। সেই জল অভ্যন্তরস্থ অনেকগুলো উত্তপ্ত চাকৃতির উপর দিয়ে গড়িয়ে নামে। এভাবে জল গরম হয়ে নীচের নলপথে বেরিয়ে আসে। যন্ত্রটার নিম্নভাগে গ্যাসের উনান জ্বালান থাকে, তার উত্তাপে ভিতরের ওই চাকৃতিগুলো উত্তপ্ত হয়।
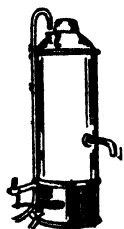
গেইজার

গ্যালভ্যানাইজ্‌ড আয়রন—জিঙ্ক অর্থাৎ দস্তার একটা পাতলা আবরণ দেওয়া লোহার জিনিস। দস্তা গলিয়ে তার মধ্যে লোহার জিনিস ডুবিয়ে নিলেই এরূপ গ্যালভ্যানাইজ্‌ড হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে গ্যালভ্যানাইজিং। লোহায় মরিচা ধরা বন্ধ করবার জন্যে এরূপ প্রক্রিয়া করা হয়। ঘরের চালার ঢেউ-টিন এভাবে তৈরী হয়; প্রকৃতপক্ষে জিনিসটা টিন ↑ নয়, জিঙ্কের ↑ আস্তরণযুক্ত লোহা মাত্র।

গ্যালভ্যানোমিটার — সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব নির্দেশক এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। সাধারণ গ্যালভ্যানোমিটারে একটা বৃত্তাকার স্কেলের উপর একটা কাঁটা ঘুরে তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশ করে; তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবেই এরূপ হয়। বিশেষ ধরণের গ্যালভ্যানোমিটারের চৌম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে আবার ওই সূক্ষ্ম কাঁটার সঙ্গে ক্ষুদ্র একখানা দর্পণ ঝুলানো থাকে; অতি সামান্য তড়িৎ-প্রবাহের ফলেও ওই দর্পণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি পরিবর্ধিত কোণে ঘুরে গিয়ে অতি সামান্য তড়িতের অস্তিত্বও জ্ঞাপন করে থাকে। গ্যালভ্যানোমিটারে তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব নির্দেশ করে মাত্র, অ্যাম্‌-মিটারের ↑ মত এ-দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ মাপা যায় না।

গ্যালভ্যানোমিটার

গ্যালাক্সি—ছায়াপথ; অসংখ্য নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমাবেশে গঠিত। এরূপ অগণিত গ্যালাক্সি মহাশূন্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। আমাদের সৌর পরিবার ও দৃষ্ট নক্ষত্ররাজি এরূপ বিভিন্ন ছায়াপথের অন্তর্গত। এরূপ জ্যোতিষ্ক সমাবেশকে আবার মিল্‌কি-ওয়েও বলে।

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইটালীয়

বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। গ্রহ, নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্যে গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আইপিসে ↑ ব্যবহৃত হয়েছিল একখানা অবতল (কন্‌কেভ ↑) লেন্স। এরূপ বিশেষ ধরণের আইপিস-যুক্ত টেলিস্কোপকে ↑ বলা হয় গ্যালিলিও-টেলিস্কোপ।

গ্যালিনা— খনিজ লেড-সালফাইড, PbS; বাংলায় বলে সীসাঞ্জন; ভারী স্ফটিকাকার চকচকে পদার্থ। বেশীর ভাগ সীসা এই খনিজ থেকেই নিষ্কাশিত হয়। এর মধ্যে কিছু রৌপ্যও মিশ্রিত থাকে।

গ্যালিক অ্যাসিড—ওক, চা প্রভৃতি উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত একটা জৈব অ্যাসিড, $C_6H_2(OH)_3COOH$; চামড়া ট্যান্ করতে ও কালি তৈরীর কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ওক ওয়াটল্, গরাণ প্রভৃতি গাছের ছালে ট্যানিক ↑ অ্যাসিডের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় গ্যালিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়

গ্যালিয়াম — মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 69·72, পারমাণবিক সংখ্যা 31; খনিজ দস্তার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাদা নরম ধাতব পদার্থ। এর গলনাংক মাত্র 30° সেন্টিগ্রেড; কাজেই একে সাধারণতঃ পারার (মার্কারি ↑) মত তরল অবস্থায়ই দেখা যায়। একে পূর্বে এক-অ্যালুমিনিয়াম ↑ বলা হোত।

গ্যামাক্সেন — বিশেষ এক প্রকার আণবিক গঠনের বেঞ্জিন-হেক্সাক্লোরাইড ($H_6C_6Cl_6$) নামক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। সাদা গুঁড়া আকারে পাওয়া যায়; বিশেষ শক্তিশালী কীট-পতঙ্গনাশক পদার্থ।

গ্যাস কার্বন — কোল-গ্যাস উৎপাদনের জন্যে যে সুবৃহৎ বক-যন্ত্রে (রেটর্ট ↑) কয়লা চোলাই করা হয়, তার গায়ে এক রকম বিশুদ্ধ কার্বন জমে যায়; একেই গ্যাস-কার্বন বলে। এরূপ বিশুদ্ধ কার্বন একটা উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ; এ-দিয়ে সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির ইলেক্ট্রোড ↑ তৈরী হয়।

গ্যাস ম্যান্টেল—গ্যাস-লাইটে যে জালি আবরণটা প্রদীপ্ত হয়ে আলো দেয়। সিল্ক জাতীয় সুতায় বোনা জালি প্রায় 99% থোরিয়াম অক্সাইড ও 1% সিরিয়াম অক্সাইডের সংমিশ্রণের প্রক্রিয়ায় জিনিসটা অদাহ্য হয়ে পড়ে এবং ওই ধাতব পদার্থ প্রদীপ্ত হয়েই আলো ছড়ায়। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জালিটাকে এরূপ করা হয়।

গ্যাস মাস্ক — গ্যাস-মুখোস; যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাস ও ধূম্র থেকে

রক্ষা পাওয়ার জন্তে সৈনিকেরা যে মুখোস পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্তে এর ছিদ্র পথে কার্বনের গুঁড়ার একটা স্তর ও তার গায়ে একটা ফিল্টার প্যাড্ থাকে। এর ভিতর দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে কিন্তু ভারী বিষাক্ত গ্যাস ও ধূম আঁটকে যায়। কার্বন মনক্সাইড, কোল-গ্যাস প্রভৃতি হাল্কা বলে এতে আঁটকায় না। কেবল রাসায়নিক যুদ্ধের ভারী বিষাক্ত গ্যাসগুলো থেকেই এরূপ মাস্কের ব্যবহারকারী রক্ষা পায়।

গ্যাসোমিটার — গ্যাস-সরবরাহ কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস সংরক্ষণের উপযোগী বিশেষ ধরণের এক রকম আধার। সাধারণ গ্যাসোমিটার হোল, ইট ও সিমেণ্টের তৈরী প্রকাণ্ড পাতকুঁয়ার মত একটা জলপূর্ণ পাত্র, যার মধ্যে ধাতব পাতে তৈরী একটা প্রকাণ্ড ড্রাম বসান থাকে। উৎপাদিত
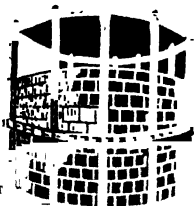
গ্যাসোমিটার

গ্যাস নলপথে ওই জলপূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করালে জল অপসারিত হয়ে ড্রামের ভিতরে গ্যাস জমতে থাকে। আবদ্ধ গ্যাসের চাপে ড্রামটা ক্রমে জলের উপরে ভেসে ওঠে। প্রয়োজন অনুসারে ওই সঞ্চিত গ্যাস পৃথক নলপথে সরবরাহ করা হয়ঃ আবদ্ধ গ্যাস বেরিয়ে যেতে ড্রামটা আবার ক্রমে জলে নিমজ্জিত হতে থাকে।

গ্যাষ্ট্রাইটিস্—রোগ বিশেষ ; পাকস্থলীর প্রদাহ। সাধারণতঃ অত্যধিক মদ্যপান, বিশেষ গুরুপাক খাদ্যাদি ভোজন প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে এ রোগ জন্মায়।

গ্যাসোলিন—খনিজ তৈল ; পেট্রল, মোটর-স্পিরিট প্রভৃতির বিশেষ নাম। পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ।

গ্যাস্ট্রোপোডা—শামুক জাতীয় যে সব জীব দেহাভ্যন্তরস্থ নরম এক রকম মাংসপেশী খোলসের মুখে বিস্তার করে

গ্যাষ্ট্রোপোডা

চলাফেরা করে, এবং ওই মাংসপেশীর সাহায্যেই অবলম্বনস্থানে লেপ্টে থাকে।

গ্র্যাম — সি. জি. এস. সিষ্টেমে পদার্থের ওজন পরিমাপের একক ; 4° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে এক ঘন সেন্টিমিটার ↑ জলের ওজনের প্রায় সমান। 1000 গ্র্যাম = 1 কিলোগ্র্যাম।

গ্র্যাম অ্যাটম — গ্র্যাম এককে মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন; যেমন, গন্ধকের (সালফার ↑) গ্র্যাম অ্যাটমিক ওয়েট ↑ হোল 32·066 গ্র্যাম।

গ্র্যাম মলিকিউল—গ্র্যাম এককে কোন রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের আণবিক ওজন। একে **মোল**ও বলা হয়। যেমন, জলের মোল বা গ্র্যাম-মলিকিউল হোল 18 গ্র্যাম।

গ্র্যানাইট—মোটা দানাযুক্ত কঠিন এক শ্রেণীর প্রস্তর বিশেষ। এর মধ্যে ফেলস্পার ↑, কোয়ার্জ ↑ প্রভৃতি পাথরে সাধারণতঃ কিছু অভ্র (মাইকা ↑) মিশ্রিত থাকে। গ্র্যানাইট পাথরের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে ওঠে; এ-জন্যে একে সাধারণ কথায় বলে চকমকি পাথর।

গ্র্যাফাইট — কার্বন জাতীয় পদার্থ; কার্বনের একটা অ্যালোট্রোপ ↑। একে **ব্ল্যাক লেড** বা **প্লাম্বেগো**-ও বলে। আমরা যাকে লেড-পেন্সিল বলি তার শিষ্ গ্র্যাফাইটে তৈরী, লেড (সীসা) নয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

গ্র্যাভিটেসন — মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। সকল বস্তুকেই পৃথিবী অবিরত টানছে; পৃথিবীর এই আকর্ষণ শক্তির ফলেই গাছের ফল মাটিতে পড়ে। একেই বলে ফোর্স অব গ্র্যাভিটি বা গ্র্যাভিটেসন; বাংলায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কেবল পৃথিবী নয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই পরস্পর পরস্পরকে টানছে, একে বলা হয় অভিকর্ষণ শক্তি। পদার্থের এই অভিকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র (ল-অব গ্র্যাভিটেসন) হোল এই যে, বিভিন্ন পদার্থের এই পারস্পরিক আকর্ষণের শক্তি তাদের বস্তুভর (মাস্ ↑) ও ব্যবধানের উপর নির্ভর করে; আর তা তাদের ওই ভরের গুণফলের সমানানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের বিপরীত আনুপাতিক হয়ে থাকে।

গ্রীন ভিট্রিয়ল—ফেরাস্ সালফেট; লোহার সঙ্গে সালফিউরিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটা সালফেট সল্টের বিশেষ নাম। স্ফটিকাকার, সবুজ বর্ণ; রাসায়নিক সূত্র $FeSO_4 \cdot 7H_2O$; বাংলায় বলে হিরাকস।

গ্রেন — ইংলণ্ডীয় ওজনের একক বিশেষ। এক পাউণ্ডের ↑ 7000 ভাগের এক ভাগ; = ·0648 গ্র্যাম।

গোল্ড — সোনা; মৌলিক ধাতু, পারমাণবিক ওজন 197·2, পারমাণবিক সংখ্যা 79, সাংকেতিক চিহ্ন Au, উজ্জ্বল হলদে নমনীয় পদার্থ। সহজেই একে পাত ও

তারে পরিণত করা যায়; মরিচা ধরে না, কোন অ্যাসিডেও গলে না। কেবল অ্যাকোয়া-রিজিয়াতে ↑ সোনা দ্রবীভূত হয়। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-রেণু পাওয়া যায়। আবার কোথাও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ও প্রস্তরাদির সহিত মিশ্রিত অবিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। পূর্বে এরূপ অবিশুদ্ধ খনিজ থেকে অ্যামালগাম ↑ প্রক্রিয়ায় সোনা নিষ্কাশিত হতো। তামা বা রূপা মিশিয়ে সোনার সংকর ধাতু তৈরী করা হয়, এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন বলে এ-দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়। সোনার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফির কাজে ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ্লবার্‌স সল্ট — সোডিয়াম সালফেট, যাকে সাধারণভাবে সোডা-সাল্‌ফ বলে। স্ফটিকাকার পদার্থ, রাসায়নিক সূত্র $Na_2SO_4 . 10H_2O$; জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

গ্লাস—কাঁচ; কঠিন ভঙ্গুর স্বচ্ছ পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেট ↑ সল্ট। বালি (সিলিকা ↑), সোডিয়াম কার্বনেট ও চুণ (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$) গলিয়ে সাধারণ সোডা-গ্লাস তৈরী হয়। সোডিয়াম কার্বনেটের বদলে লেড, পটাসিয়াম, বেরিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুর কার্বনেট দিয়ে, আর সিলিকার বদলে বোরন-অক্সাইড গলিয়ে ক্রাউন গ্লাস, ফ্লিন্ট গ্লাস প্রভৃতি নানা রকমের কাঁচ তৈরী হয়। উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যানিলিং ↑ করে কাঁচের সহজ-ভঙ্গুরতা দোষ দূর করা হয়।

গ্লাস উল—কাঁচের নরম পিণ্ড থেকে সুতার মত যে পদার্থ তৈরী হয়। অদ্রাব্য বলে অ্যাসিড প্রভৃতি এর মধ্য দিয়ে ছেঁকে (ফিল্ট্রেসন ↑) পরিষ্কার করা হয়।

গ্লিসারিন—সিরাপের মত ঘন, মিষ্ট-স্বাদযুক্ত তরল পদার্থ; রাসায়নিক সূত্র $CH_2OH . CHOH . CH_2OH$; জলে দ্রবণীয়। একে **গ্লিসারল**-ও বলা হয়। বিভিন্ন চর্বি ও তেলের মধ্যে ফ্যাটি-অ্যাসিডের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সাবান তৈরীর সময়ে (স্যাফোনিফিকেসন ↑) এই গ্লিসারিন পৃথক হয়ে যায়। প্ল্যাস্টিক ↑, বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ, ঔষধ প্রভৃতি নানা কাজে এর যথেষ্ট দরকার হয়।

গ্লিসারাইড—জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন পদার্থ। গ্লিসারাইড নানা রকম হতে পারে। এ-গুলো সব গ্লিসারিনের

এস্টার ↑ জাতীয় পদার্থ। জান্তব চর্বিও হোল এক রকম গ্লিসারাইড।

গ্লুকোজ—শর্করা বিশেষ, $C_6H_{12}O_6$, একে ডেক্স্‌ট্রোজ বা গ্রেপ-সুগারও বলা হয়। বর্ণহীন, স্ফটিকাকার, জলে দ্রবণীয়। ফুলের মধু ও সুমিষ্ট ফলে পাওয়া যায়। সাধারণ চিনি ও কার্বোহাইড্রেট ↑ জাতীয় পদার্থগুলো মানুষের দেহাভ্যন্তরে ক্রমে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়; আর তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় দেহের তাপ ও শক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শ্বেতসার (স্টার্চ) ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট থেকে কৃত্রিম উপায়ে আজকাল প্রচুর গ্লুকোজ তৈরী করা হয়।

গ্লুকোসাইড — গ্লুকোজের বিভিন্ন অ্যালকালয়েড ↑ ; যার গঠনে গ্লুকোজের ↑ একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর জায়গায় কোন জৈব র‍্যাডিক্যাল ↑ জুড়ে যায়। পদার্থটা আর শর্করা থাকে না, মিষ্টত্ব হারায়। বিভিন্ন প্রয়োজনে উদ্ভিদ স্বভাবতঃই তার দেহের মধ্যে এরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়, গ্লুকোসাইড সৃষ্টি হয়। অ্যাস্পিরিন, ডিজিটেলিন, ইণ্ডিক্যান প্রভৃতি এরূপ পদার্থ।

গ্লাইকোজেন — জান্তব শ্বেতসার, (কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট); বিভিন্ন শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সঙ্গে গ্লুকোজের ↑ রাসায়নিক মিলনে প্রাণীদেহের যকৃৎ ও অন্যান্য স্থানে এরূপ পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা একপ্রকার জটিল গঠনের হাইড্রো-কার্বন ↑। প্রাণীদেহের মাংস পেশীর মধ্যেও এ-পদার্থ যথেষ্ট আছে।

গ্লেসিয়্যাল অ্যাসিটিক অ্যাসিড—বিশুদ্ধ অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑; এর হিমাংক মাত্র 16·8° সেণ্টিগ্রেড। এর কম তাপে অ্যাসিডটা কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন এটা বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ।

চ

চক্ — ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$; প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক আণুবীক্ষণিক জীবের কঠিন খোলা জমে এর সৃষ্টি হয়েছে; বাংলায় বলে খড়িমাটি। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা এক রকম নরম পাথর বিশেষ। স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডে যে পেন্সিল-চক দিয়ে লেখা হয়, তা সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সালফেটে ($CaSO_4$) তৈরী, কার্বনেট নয়।

চারকোল্ — কয়লা, অবিশুদ্ধ কার্বন ↑ বিশেষ। নানারকম চার-কোল আছে—বায়ুহীন অবস্থায় কাঠ পুড়িয়ে হয় উড্ চারকোল (কাঠ-

কয়লা) ; আর প্রাণীদেহের হাড়-মাংস ইত্যাদি এভাবে পুড়িয়ে হয় অ্যানিম্যাল-চারকোল ↑ । সব রকম চারকোলই হয় অত্যন্ত ছিদ্রবহুল ; এ-জন্যে তরল ও বায়বীয় পদার্থ শুষে নেয়। বিভিন্ন পদার্থের দ্রব বর্ণহীন করতে বিভিন্ন চারকোল উৎকৃষ্ট ফিল্টারের ↑ কাজ করে।

চাইনিজ হোয়াইট—জিঙ্ক অক্সাইড, ZnO ; পদার্থটা জলে গলে না, তেলে মিশিয়ে এ দিয়ে সাদা রং তৈরী হয়। বাংলায় বলে সফেদা।

চার্লস-ল—গ্যাস মাত্রেরই 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে যে আয়তন থাকে তা প্রতি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপ-বৃদ্ধিতে 1/273 ভাগ বৃদ্ধি পায় ; অবশ্য সেই গ্যাসের চাপ সর্বদা যদি সমান থাকে। এটাই হোল বিজ্ঞানী চার্লসের প্রবর্তিত গ্যাসীয় তাপ ও আয়তন সম্বন্ধীয় সূত্র। অন্য কথায় বলা যায়, অপরিবর্তিত চাপে সব গ্যাসের আয়তনই অ্যাবসোলিউট ↑ তাপের সমানানুপাতিক হয়ে থাকে।

চায়না ক্লে — প্রাকৃতিক অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$; উত্তপ্ত করলে এর জলীয় অংশ (ওয়াটার অব ক্রিস্ট্যালিজেসন) চলে গিয়ে রাসায়নিক গঠন বদলে যায়, শক্ত হয়ে পড়ে। এ-দিয়ে পোর্সিলিন ↑ তৈরী হয়। পদার্থটাকে কেওলিন-ও বলে।

চিলি সল্টপিটার — প্রাকৃতিক অবিশুদ্ধ সোডিয়াম নাইট্রেট, $NaNO_3$; চিলিতে পদার্থটা খনিজ আকারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সল্টপিটার ↑ বা নাইটার বলতে পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) বুঝায়।

চেঞ্জ অব স্টেট (পদার্থবিদ্যা)—পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। উপযুক্ত তাপ ও চাপের প্রভাবে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থান্তর ঘটান যায় ; একেই বলে 'চেঞ্জ অব স্টেট'। তরল জল উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে জমে কঠিন বরফে পরিণত হয় ; উত্তপ্ত করলে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই হোল জলের 'চেঞ্জ অব স্টেট'। এমন যে কঠিন লোহা, তা-ও অত্যধিক উত্তাপে গলে তরল, এমন কি, গ্যাসীয় অবস্থায়ও উপনীত হতে পারে।

চেইন (অ্যাটমিক) — রাসায়নিক পদার্থের গঠনে পরমাণুগুলো যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ থাকে, যেন শিকলে বাঁধা। পরমাণুর এই সংযোগ দু-রকমের হতে পারে—সারিবদ্ধভাবে, যাকে বলে 'ওপেন চেইন' ; আবার আংটির মত গোল হয়ে জুড়তে পারে, এরূপ হলে

বলা হয় 'ক্লোসড্ চেন'। বেঞ্জিনের (C_6H_6) পারমাণবিক গঠনে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো ক্লোসড্ চেইনে সংবদ্ধ; আর বুটেনের ↑ (C_4H_{10}) গঠন হোল ওপেন চেইনের একটা দৃষ্টান্ত।

চেইন রিঅ্যাকসন — পরমাণুর কেন্দ্রীন ভাঙ্গার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নিউট্রন ↑ কণিকার সংঘাতে কোন কোন পদার্থের কেন্দ্রীন পর্যায়ক্রমে যেভাবে ভাঙ্গতে থাকে (ফিসন ↑)। অ্যাটমিক বোমার প্রচণ্ড ধ্বংসকারী শক্তি এরূপ চেইন রিঅ্যাক্সনের ফলেই উদ্ভূত হয়। পদার্থের কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস) বিভাজনের কাজ অতি সামান্য সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে সমগ্রভাবে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। এরূপ ধারাবাহিক ক্রিয়াকে চেইন রিঅ্যাকসন বলা হয়।

চোক ড্যাম্প — কয়লার খনিতে ফায়ার ড্যাম্প ↑ (মিথেন গ্যাস, CH_4) জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়। এর ফলে কার্বন মনক্সাইড (CO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণকে বলে আফটার ড্যাম্প ↑ বা চোক ড্যাম্প ; কারণ এই গ্যাসে মানুষের দম আটকে যায়।

জ

জাইমস্—খমির বা ঈস্টের ↑ মধ্যে যে এঞ্জাইম ↑ শ্রেণীর জৈব পদার্থ শর্করাকে অ্যালকোহলে পরিণত করে। মূলতঃ এটা একটা প্রোটিন ↑ জাতীয় জৈব পদার্থ। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় এরূপ জাইমস্ ক্যাটালিষ্ট ↑ রূপে কাজ করে।

জাইরেসন—কোন স্থির অক্ষ বা কেন্দ্রের চারদিকে কোন কিছুর ঘূর্ণন বা আবর্তনের গতি।

জাইরোস্কোপ—এক রকম যন্ত্র; প্রকৃতপক্ষে এটা কুমারের চাকা বা লাট্টুর মত, একটা অক্ষদণ্ডের চারদিকে ঘূর্ণায়মান একটা ভারী চক্র মাত্র।

জাইরোস্কোপ
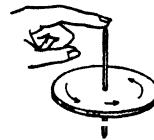
দণ্ডটাকে যেদিকে মুখ করে চক্রটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, অবস্থান-নিরপেক্ষভাবে ওই দণ্ডটা সর্বদা সেই দিকেই মুখ করে থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় (সাধারণতঃ তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে) চক্রটা সমভাবে আবর্তিত হতে থাকে; আর ওই আবর্তিত চক্রসমেত যন্ত্রটার পাদ-পীঠ যেদিকেই ঘুরে বা বেঁকে যাক না কেন, অক্ষ-দণ্ডটা সর্বদা পূর্ব নির্দিষ্টমুখী থাকবে।

অবশ্য চক্রটার ঘূর্ণনবেগ হ্রাস পেলে দণ্ডটার এই ধর্ম লোপ পায়। ওই

ঘূর্ণায়মান চক্রের অক্ষ-দণ্ডের দিক পরিবর্তনের এই নিষ্ক্রিয়তাকে বলে **জাইরোস্কোপিক ইনার্সিয়া**। যন্ত্রটা অতি সাধারণ : কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অপরিসীম। এর সাহায্যে চালক-হীন এরোপ্লেন, রকেট ↑, টর্পেডো প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিষ্ট লক্ষ্য-বস্তুর দিকে সোজা চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

জাইরো-কম্পাস — এক প্রকার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র : যাতে জাইরো-স্কোপের ↑ সাহায্যে ভৌগোলিক দিক সহজেই নির্ণীত হয়। সাধারণ কম্পাসের ↑ মত কোন চৌম্বক শলাকা না থাকায় এরূপ কম্পাসে ম্যাগ্নেটিক ষ্টর্ম ↑ প্রভৃতির জন্যে কখন দিক-নির্ণয়ের কোন অসুবিধা
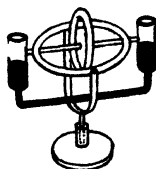
জাইরো-কম্পাস

ঘটে না। সাধারণতঃ সমুদ্রগামী জাহাজে এই জাইরো - কম্পাস ব্যবহৃত হয়। এর ফ্রেমে আঁটা জাইরোস্কোপের ↑ অক্ষদণ্ডটা ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত করে তড়িৎ-প্রভাবে চক্রটাকে সমভাবে ঘূর্ণায়মান রাখা হয়। জাহাজ যে দিকেই ঘুরে যাক, অক্ষদণ্ডটা সর্বদা উত্তর-দক্ষিণেই মুখ করে থাকে ; ফলে সহজেই দিক-নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যন্ত্রটার ফ্রেমে সংলগ্ন পরস্পর-যুক্ত দুদিকে দুটা পারদ-ভর্তি পাত্র থাকে ; পৃথিবীর

আবর্তনের ফলে জাইরোস্কোপের অক্ষ-তলের যে ব্যতিক্রম ঘটে ওই পারদ প্রয়োজনানুরূপ চলাচল করার ফলে তা সংশোধিত হয়।

জাইরোস্ট্যাট্ — জাইরোস্কোপের যেরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমুদ্র-বক্ষে
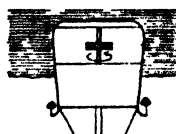
জাইরোষ্ট্যাট্

জাহাজ স্থির রাখা হয়। এরূপ যন্ত্রকে কখন কখন জাইরো-ষ্ট্যাবিলাইজারও বলা হয়। জাহাজের তলায় সাধারণতঃ খাড়াভাবে ঘূর্ণায়মান একটা প্রকাণ্ড জাইরোস্কোপ ↑ চক্র লাগান হয় ; এর ফলে তরঙ্গাঘাতে জাহাজ সহজে দোল খায় না। এ-ছাড়া মনোরেল সিষ্টেম (একটা মাত্র লাইনের উপরে রেল গাড়ীর

চলাচল) জাইরোস্ট্যাটের বিশেষ ব্যবহারের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

জার্মেনিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ge, পারমাণবিক ওজন 72·6, পারমাণবিক সংখ্যা 32; সাদা ও ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। পদার্থটার বিভিন্নমুখী তড়িৎ-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এর এই ধর্মের জন্যেই অধুনা-আবিষ্কৃত ট্র্যান্‌জিস্টর↑ যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

জার্মান সিল্‌ভার— সাদা এক রকম সংকর ধাতু। তামা, দস্তা ও নিকেল ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত। বিভিন্ন অনুপাতে এদের মেশানো হয়। সাধারণতঃ 5 ভাগ তামা, 2 ভাগ দস্তা ও 2 ভাগ নিকেল মিশিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

জার্মিসাইড— জীবাণুনাশক পদার্থ; যে সব রাসায়নিক পদার্থের বিভিন্ন জার্ম বা জীবাণু ধ্বংস করবার শক্তি আছে।

জিওলাইট — খনিজ ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। আজকাল খরজল (হার্ড ওয়াটার↑) নরম করবার জন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য পদার্থকেও সাধারণভাবে জিওলাইট বলা হয়।

জিওলজি—ভূ-বিদ্যা; ভূ-স্তরের মাটি, পাথর প্রভৃতি সহ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা, প্রকৃতি, গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয়।

জিঙ্ক—দস্তা; মৌলিক ধাতু, পারমাণবিক ওজন 65·38, পারমাণবিক সংখ্যা 30, সাংকেতিক চিহ্ন Zn; নীলাভ সাদা কঠিন পদার্থ। এর খনিজ কার্বনেট (ক্যালামাইন, $ZnCO_3$) ও সালফাইড (জিঙ্ক ব্লেণ্ড, ZnS) থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। পিতল (ব্রাস↑) প্রভৃতি সংকরধাতু তৈরী করতে ও লোহা গ্যালভ্যানাইজ↑ করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

জিঙ্ক ব্লেণ্ড—স্বাভাবিক 'জিঙ্ক সালফাইড', ZnS; এই খনিজ ধাতব পদার্থ থেকেই বেশীর ভাগ জিঙ্ক নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

জিন—জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার। জীবকোষের কেন্দ্রীনের মধ্যে থাকে ক্রোমোসোম↑; বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহকোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম রয়েছে। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের তারতম্যেই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। আবার, অতি সূক্ষ্ম দানার মত কতকগুলো জিন মিলে (মালার মত গ্রথিত) এক একটি সূত্রাকার

ক্রোমোসোম গঠিত। এর প্রত্যেকটি জিনে দেহ ও মনের এক একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এ-রকম বিভিন্ন জিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে এক এক জীবের এক এক রকম আকৃতি-প্রকৃতি গঠিত হয়ে থাকে। মানুষের প্রজনন-কোষের কেন্দ্রীনে 24-টি ক্রোমোসোম থাকে ; সংস্থলিত বা নিষিক্ত কোষে থাকে 24 জোড়া অর্থাৎ 48-টি। ইঁদুরের দেহকোষে থাকে 4 জোড়া অর্থাৎ 8-টি ক্রোমোসোম। অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে যে গামা-রশ্মির ↑ উদ্ভব হয় তাতে ক্রোমোসোমের উপাদান-স্বরূপ বিভিন্ন জিন নষ্ট হয়ে যায় দেখা গেছে।

জিলাটিন — প্রাণীদেহের হাড় ও কার্টিলেজ ↑ জলে ফুটালে জেলির ↑ মত যে ঘন পদার্থ বেরোয়। জিনিসটা এক রকম জটিল গঠনের প্রোটিন ↑ জাতীয় পদার্থ ; জলে দ্রবণীয়। এই জিলাটিন নানা রকম খাদ্যাদিতে মেশানো হয় ; ফটোগ্রাফি ↑, বস্ত্রশিল্প প্রভৃতিতেও এর ব্যবহার আছে।

জুওলজি — প্রাণিবিদ্যা ; বিভিন্ন জীবজন্তু সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

জুপিটার—বৃহস্পতি গ্রহ ; সৌর-পরিবারের বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক। পৃথিবীর প্রায় 318 গুণ বড় ; সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 4,830 লক্ষ মাইল। সূর্যের গ্রহগুলোর দূরত্বের ক্রমপর্যায়ে এর পঞ্চম স্থান ; মঙ্গল ও শনি গ্রহের মাঝামাঝি এক নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর প্রায় 12 বছরে বৃহস্পতির এক বছর হয় ; অর্থাৎ নিজ কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর হিসেবে এর লাগে প্রায় 12 বছর। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে এর 12-টা উপগ্রহ বা চাঁদ দেখা গেছে। সম্ভবতঃ গ্রহটা কঠিন অবস্থায় নেই ; উপরিভাগ অত্যন্ত শীতল, প্রায় –150° সেন্টিগ্রেড হবে।

জুল — সাধারণভাবে তড়িৎ-শক্তির একক বিশেষ ; আবার যে কোন কর্মশক্তির একক হিসেবেও অনেক সময় জুল কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ফুট-পাউণ্ডাল ↑)। এক জুল = 10^7 আর্গ ↑। এক অ্যাম্পিয়ার ↑ তড়িৎপ্রবাহ এক ওম্ ↑ তড়িৎবাধা অতিক্রম করে এক সেকেণ্ড চলতে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তির প্রয়োজন হয়, তাই হোল এক জুল। বৃটিশ বিজ্ঞানী জুলের নামানুসারে।

জেট— (1) অত্যন্ত কঠিন চকচকে এক রকম খনিজ পদার্থ ; রাসায়নিক হিসেবে অ্যানথ্রাসাইট জাতীয় কার্বন। প্রাচীনকালে এ দিয়ে অলঙ্কারাদি তৈরী হোত ; সে যুগের

অনেক পুরাতন কবরের মধ্যে এর তৈরী অলঙ্কারপত্র পাওয়া গেছে। (2) গ্যাস বা তরল পদার্থ নির্গমনের সরু নলপথ।

জেট্ প্লেন — জেট-চালিত বিমান পোত। এক বিশেষ কৌশলে এর ইঞ্জিনে গতি সঞ্চারিত হয়, যাকে বলে জেট-প্রোপালসন। মোটামুটি এর কৌশলটা হোল: সামনে দিয়ে হাওয়া সবেগে ভিতরে ঢুকে ইঞ্জিনের জ্বালানি তেলের সঙ্গে (পেট্রল ↑) মিশ্রিত হয়। আবদ্ধ পাত্রে উচ্চ চাপের বায়ুর মধ্যে ওই তেল প্রজ্বলিত হলে উৎপন্ন গ্যাস-মিশ্রিত বায়ু সরু নল পথে মহাবেগে পেছন দিক থেকে বেরুতে থাকে। গ্যাসীয় পদার্থের ওই পশ্চাৎগতির ফলে বিমানপোত সম্মুখগতি লাভ করে। বন্দুক ছুঁড়লে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল চাপে গুলিটা সবেগে সামনে বেরিয়ে যায়; আর তার ফলে পেছন দিকে বন্দুকের একটা ধাক্কা লাগে। বন্দুকের এই পশ্চাৎ-গতির বৈজ্ঞানিক কারণ অনেকটা জেট-প্রোপালসনের অনুরূপ। শূন্যপথে হাউই যে কারণে সবেগে উপরে উঠে যায়, জেট্ প্লেনের গতিও সেইরূপ।

জেনেটিক্স — বংশানুক্রম বা উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক তথ্যাদির বিজ্ঞান। জীবকোষের (পুংকোষ ও ডিম্বকোষ) ক্রোমোসোম ↑ পরস্পর সম্মিলিত হওয়ার ফলে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানে পরিচালিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্যান্য কারণে অবশ্য এর কিছু কিছু স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ-সব সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক মতবাদকে বলা হয় জেনেটিক্স। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি এই শাখায় পর্যালোচিত হয়।

জেনিথ—কোন ব্যক্তির সোজা মাথার উপরে নভোমণ্ডলে অবস্থিত সর্বোচ্চ যে বিন্দু কল্পনা করা হয়। জ্যোতি-বিদ্যায় সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে ↑ এই-রূপ সর্বোচ্চ (জেনিথ) বিন্দু কল্পনা করে নিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিভিন্ন গণনাদির সমাধান করা হয়।

জেনারেটর—তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র। বিভিন্ন পাওয়ার-ষ্টেশনে বিভিন্ন রকমের জেনারেটর ব্যবহৃত হয়। জেনারেটর মোটামুটি দু-রকম— থার্ম্যাল ও হাইড্রলিক। কয়লা, জ্বালানি তেল প্রভৃতি পুড়িয়ে সেই তাপের সাহায্যে চালিত যন্ত্রে তড়িৎ উৎপাদিত হলে সেই যন্ত্রকে বলা হয় থার্ম্যাল জেনারেটর; আর জলস্রোতের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করে যে জেনারেটর চালান হয় তাকে বলে হাইড্রলিক জেনারেটর।

জেল—জেলির মত ঘন কোলয়ড্যাল সলিউসন ↑; এর আঠাল ঘনত্ব এত বেশী যে, তা প্রায় স্থিতিস্থাপক কঠিন পদার্থের মত হয়। জিলাটিন ↑ অল্প জলে মেশালে এরূপ হয়ে থাকে।

জেলিগ্নাইট — বিস্ফোরক পদার্থ বিশেষ। নাইট্রোগ্লিসারিন ↑, নাইট্রোসেলুলোজ ↑, সল্টপিটার (পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3) ও কাঠের গুঁড়া মিশিয়ে পদার্থটা তৈরী হয়।

জোডিয়াক্ — সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারের ↑ যে অংশের উপর দিয়ে সূর্যের বার্ষিক গতি লক্ষিত হয়। সারা বছরে সূর্যকে আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ একটি নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করতে দেখা যায়। (প্রকৃতপক্ষে সূর্য স্থির রয়েছে, পৃথিবীর গতির জন্যে এরূপ দেখায়।) সূর্যের এই আপাতদৃষ্ট ভ্রমণপথকে বলা হয় জোডিয়াক্। জ্যোতির্বিদ্যায় এই জোডিয়াক্ বা রাশিচক্রকে 12 ভাগে ভাগ করে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি দ্বাদশ রাশি গণনা করা হয়ে থাকে।

জ্যাভেলি ওয়াটার — পটাসিয়াম হাইপোক্লোরাইডের (KOCl) জলীয় দ্রব; একে ইউ-ডি-জ্যাভেলিও বলে। পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের (KOH) ঠাণ্ডা জলীয় দ্রবের মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস চালালে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর উৎপত্তি ঘটে। বস্ত্রাদি বর্ণহীন (ব্লিচ্) করতে ও বীজাণু-নাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ট

টটোম্যারিজম্ — কোন যৌগিক পদার্থে তার দু-রকম আইসোমার ↑ এক সঙ্গে মিশে থাকার অবস্থা। ওই দুই রকম আইসোমারের পারস্পরিক অনুপাত মোটামুটি স্থির থাকে। এক রকম আইসোমার যদি আলাদা করে ফেলা যায় তাহলে অন্য আইসোমারটার কতক অংশ বদলে গিয়ে প্রথমটার মত হয়ে অনুপাতের স্থিরতা লাভ করে। এ রকম পদার্থকে টটোম্যারিক পদার্থ বলে। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় মনে হয়, এর মধ্যে এক রকম বিশেষ আইসোমার আছে; আবার কোন ক্ষেত্রে মনে হয়, যেন পদার্থটার মধ্যে অন্য আর এক রকম আইসোমার রয়েছে।

টন — ইংলণ্ডীয় ওজনের একক বিশেষ; প্রায় 27 মণ। কয়লা প্রভৃতি ওজন করতে ব্যবহৃত হয় **লঙ্ টন**, =2240 পাউণ্ড; যুক্তরাষ্ট্রে ধাতব পদার্থাদি ওজন করতে ব্যবহার করে **শর্ট টন**, =2000

পাউণ্ড। মেট্রিক টন হোল 1000 কিলোগ্র্যাম ↑, বা 2204·6 পাউণ্ড। একে আবার টনি-ও বলা হয়।

টক্সিন — আণুবীক্ষণিক জীবাণুর দেহতন্তুর মধ্যে যে সব বিষ ছড়ায় দেহের কোন জীবাণুদুষ্ট অংশ থেকে এই টক্সিন রক্তপ্রবাহে মিশে গেলে রক্তের **টক্সিমিয়া** অবস্থা বলে যে সব প্রোটিন পদার্থ দেহে প্রবেশ করিয়ে কোন টক্সিনের বিষক্রিয় নষ্ট করা যায় তাকে বলে **টক্সয়েড** আর, কোন টক্সিনের বিষক্রিয় প্রতিরোধ করবার জন্যে দেহমধে যে বিষঘ্ন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাবে বলে **অ্যান্টিটক্সিন**।

টক্সিকোলজি — জীবদেহে বিভিন্ন বিষের ক্রিয়া ও তার ফলাফল বিষয়ক তথ্যাদির বিজ্ঞান।

টক্স্যামিন—যে সব পদার্থ দেহমধ্যে ভিটামিনের কার্যকরী শক্তি নষ্ট করে ফেলে ; যেমন, ভিটামিন-বি ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমন পদার্থের সৃষ্টি করে যাতে ওই ভিটামিন ↑ দেহের আর কোন কাজেই আসে না। এখানে ডিমের সাদা অংশকে টক্স্যামিন বা ভিটামিন-নাশক পদার্থ বলা হয়।

টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম — এক মুখ-বন্ধ অন্তান 32 ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁচ নলের মধ্যে পারা ভর্তি করে আর একটা পারাভর্তি পাত্রে উপর উল্টে ধরলে ওই কাঁচনলে মধ্যস্থ পারা খানিকটা নেমে যায় এভাবে কাঁচনলটার উপরের দিবে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়, সেখানে বা থাকে না, সামান্য পারার বাষ্প থাবে মাত্র। এরূপ বায়ুশূন্য স্থানকে বলে টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম। ইতালীয় বিজ্ঞানী টরিসেলি এরূপ কাঁচনলে পারা-স্তম্ভের উচ্চতা মেপে বায়ু চাপ নির্ধারণের কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। কৌশলটা এক রকম সাধারণ ব্যারোমিটার ↑ (বায়ুর চাপমান-যন্ত্র) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টলুইন—মিথাইল বেঞ্জিন, $C_6H_5CH_3$; বর্ণহীন দাহ্য তরল পদার্থ কোল-টার ↑ অর্থাৎ অলকাতরা থেকে পাওয়া যায়। একে অনেক সময় টলুঅল-ও বলা হয়। এ থেকে নানা রকম রং ঔষধ, স্যাকারিন, প্রভৃতি পাওয়া যায়। টি-এন-টি ↑ (ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন) প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করতে এর প্রয়োজন হয়।

টাইপ মেটাল—সীসা, অ্যান্টিমনি ও টিনের সংকর ধাতু ; এর মধ্যে সাধারণতঃ 6 % সীসা, 30% অ্যান্টিমনি এবং 10% টিন থাকে মুদ্রণ কার্যের জন্যে এ দিয়ে ছাপার টাইপ তৈরী হয়। অ্যান্টিমনি

থাকায় তরলীকৃত সংকর ধ ঢালাই করে জমালে আয়তনে ছোট না হয়ে বরং একটু বেড়ে যায় ; ফলে নিখুঁত পরিষ্কার অক্ষরগুলো ওঠে।

টাইটেনিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; পারমাণবিক ওজন 47·9, পারমাণবিক সংখ্যা 22 ; অনেকটা লোহার অনুরূপ ধাতু। সহজেই এর তার ও পাত করা যেতে পারে। এর খনিজ যৌগিক পদার্থ অনেক পাওয়া যায়। এর অক্সাইড, TiO_2, সাদা ভার্নিস রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টাইটেনিয়াম মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর ধাতুও তৈরী হয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী করতে টাংস্টেনের ↑ সঙ্গে সামান্য টাইটেনিয়ামও লোহার সঙ্গে মেশান হয়ে থাকে। কাঁচ-শিল্পেও এর ব্যবহার আছে।

টাংস্টেন — মৌলিক ধাতু ; এর অপর নাম উলফ্রাম ↑। বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেণ্ট ↑ এ-দিয়ে তৈরী করা হয়। বিশেষ ধরণের ইস্পাত (টাংস্টেন-স্টিল) তৈরী করতেও এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

টার্পেণ্টাইন — তারপিন তেল ; পাইন গাছ থেকে নিঃসৃত রঞ্জন-জাতীয় আঠালো রস চোলাই করে এই তেল পাওয়া যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা বিশেষ এক শ্রেণীর তরল হাইড্রোকার্বন ↑ মাত্র। উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ। কিছু ভেষজ গুণও আছে।

টারবাইন — এক রকম যন্ত্র বিশেষ ; যার সাহায্যে মোটর বা ইঞ্জিনের কার্যকরী শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর যান্ত্রিক কৌশলটা হোল : সরু নলপথে জলীয় বাষ্প, বায়ু বা জল-প্রবাহ এসে সবেগে একটা প্রকাণ্ড চাকার চওড়া ব্লেডগুলোর উপর পর্যায়ক্রমে আঘাত করতে থাকে ; এর ফলে চাকাটা দ্রুত ঘুরতে আরম্ভ করে। ওই চাকার সঙ্গে সংযুক্ত ইঞ্জিন বা মোটরও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। এভাবে গ্যাস টারবাইন বা ওয়াটার টারবাইনের সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্র চালান হয়। টারবাইনের কৌশলে চালিত যন্ত্রকে **টার্বো** বলে : যেমন—টার্বো ইঞ্জিন, টার্বো জেনারেটর ↑ ইত্যাদি।

টার্টারিক অ্যাসিড — একটা জৈব অ্যাসিড। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয় ; রাসায়নিক সূত্র $COOH.(CH.OH.)_2COOH$; আঙুর ফলের রস থেকে পাওয়া যায়। আর্গল ↑ থেকেই বেশীর ভাগ টার্টারিক অ্যাসিড মেলে। এর বিভিন্ন সল্টকে বলে টার্টারেট। রঞ্জন শিল্পে, কাপড় ছাপার কাজে

প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বেকিং পাউডার ↑, সিড্‌লিজ্‌ পাউডার ↑ ইত্যাদিতেও প্রয়োজন হয়।

টার্টার — অ্যাসিড পটাসিয়াম টার্টারেটকে বলে ক্রিম-অব-টার্টার, যা মদ্য প্রস্তুতকালে মদ্যভাণ্ডের মধ্যে জমে। জিনিসটা জোলাপ হিসেবে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পটাসিয়াম ও অ্যান্টিমনির মিলিত টার্টারেট-কে বলে টার্টার-এমিটিক, যা সর্দি-কাশির একটা বিশিষ্ট ঔষধ; কিন্তু পরিমাণ বেশী হলে এর বিষক্রিয়া দেখা যায়। দাঁতের উপর যে পদার্থের সাদা আবরণ পড়ে তা প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট; সাধারণ কথায় একে বলা হয় টার্টার।

টি. এন. টি — ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন নামক বিস্ফোরক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম। ফিকে হলদে, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। বিশেষ নাইট্রেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে টলুইনের ↑ সঙ্গে নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। পদার্থটাকে আবার অনেক সময় **টোটাইল**-ও বলে।

টিন — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 118·7, পারমাণবিক সংখ্যা 50. সাংকেতিক চিহ্ন Sn, (ষ্ট্যানাম)। রূপোর মত সাদা; সহজেই এর তার ও পাত করা যায়। এর খনিজ অক্সাইড SnO_2 (টিন-স্টোন) বিশেষ প্রক্রিয়ায় কার্বনের সঙ্গে উত্তপ্ত করে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জল বা বায়ুর সংস্পর্শে এর কোন বিকৃতি ঘটে না; কিন্তু 18° সেন্টিগ্রেডের কম তাপে ধূসর বর্ণ (অ্যালোট্রপিক টিন) হয়ে যায়, একে বলে **টিন প্লেগ**। নানারকম সংকর ধাতু তৈরী ও টিন-প্লেটিং-এর কাজে প্রয়োজন হয়। লোহার চাদরে টিনের পাতলা আস্তরণ দিয়ে সাধারণ টিন-প্লেট তৈরী হয়ে থাকে।

টিণ্ড্যাল এফেক্ট — আলোক-রশ্মির পথে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকা পড়লে ওই আলোকের যে বিচ্ছুরণ ঘটে। ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে রোদ ঢুকলে ঘরের বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাগুলো এর ফলে পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়; ধূলিকণার উপর আলোকের প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। অতি সূক্ষ্ম কণিকার উপর নীল আলোক-তরঙ্গ বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত হয়। আকাশের রং মোটামুটি এ-জন্যেই নীল দেখায়। আলট্রা-মাইক্রোস্কোপ ↑ যন্ত্রে এই টিণ্ড্যাল এফেক্টের জন্যেই জলে ভাসমান অদৃশ্য কণিকাগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ে

ওঠে। বৃটিশ বিজ্ঞানী টিণ্ড্যাল এই তথ্য উদ্ঘাটন করেন।

টেম্পারেচার — উষ্ণতা বা তাপ-মাত্রা; কোন পদার্থ কতটা উত্তপ্ত বা ঠাণ্ডা, অর্থাৎ তার তাপের অবস্থা এর বিভিন্ন এককে প্রকাশিত হয়। পদার্থের মধ্যে উষ্ণতার, অর্থাৎ তার টেম্পারেচারের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে নির্ধারিত হয়। কোন পদার্থে নিহিত মোট তাপশক্তিকে বলে হিট ↑। হিট্ ও টেম্পারেচার এক জিনিস নয়। টেম্পারেচার পদার্থের উষ্ণতার মাত্রা সম্বন্ধীয় ধারণা জন্মায় মাত্র। আর পদার্থের হিট্ বা মোট তাপশক্তির পরিমাণ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন থার্মোমিটারে ↑ বিভিন্ন স্কেলের এককে টেম্পারেচার মাপা হয়; যেমন—সেণ্টিগ্রেড ↑, ফারেনহাইট ↑, রুমার ↑।

থার্মোমিটার

টেম্পারিং অব স্টিল — ইস্পাতে পান্ দেওয়া। তৈরী ইস্পাতে উপযুক্তরূপ কাঠিন্য দেওয়ার জন্যে তাকে বিশেষভাবে উত্তপ্ত করে সহসা তেল বা জলে ডুবিয়ে সাধারণতঃ টেম্পার করা হয়। যাকে বাংলায় বলে পান দেওয়া। বিভিন্ন স্টিলে ↑ টেম্পারিং এর কৌশল বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

টেলিফোন — বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সঙ্গে কথা বলার যন্ত্র। শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণের জন্যে এর প্রধান অংশ হোল ট্রান্সমিটার ও রিসিভার যন্ত্র। ট্রান্সমিটারে থাকে একটা কার্বন মাইক্রোফোন ↑; ওর মুখে কথা বললে শব্দ-তরঙ্গের সংঘাতে ওই মাইক্রোফোনের পর্দা শব্দানুযায়ী কম্পিত হয়। এর ফলে মাইক্রোফোনের তড়িৎপ্রবাহ-পথে প্রতিবন্ধকতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং তদনুযায়ী তড়িৎপ্রবাহ দূরবর্তী রিসিভার যন্ত্রে গিয়ে পৌঁছে। রিসিভার যন্ত্রে থাকে একটা বাঁকানো চুম্বকের দুই প্রান্তে সংলগ্ন লোহার টুকরোর (পোল পিস্) গায়ে জড়ানো তার-কুণ্ডলী (কয়েল)। লোহার একখানা পাতলা পর্দা (ডায়াফ্রাম) ওই কয়েল দুটার সামনে আলুতোভাবে সংলগ্ন থাকে। ট্রান্সমিটার থেকে আগত বৈদ্যুতিক প্রবাহ রিসিভারের ওই কয়েলে সঞ্চারিত হয়, আর ওই লোহার পর্দাখানা তদনুযায়ী স্পন্দিত হতে থাকে। ওই পর্দা বা ডায়াফ্রামের স্পন্দনে পুনরায় তদনুযায়ী শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে শ্রুতিগোচর হয়।

টেলিগ্রাফ — বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করবার যন্ত্র। এর ট্রান্সমিটার বা প্রেরক-যন্ত্রের একটা চাবি টিপলে তড়িৎস্রোত দূরবর্তী গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় (ক্লোসড্ সার্কিট ↑), চাবিটা ছেড়ে দিলেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। প্রেরকযন্ত্রের চাবিটা চেপে ধরা ও ছেড়ে দেওয়ার সময়ের কম বেশীর উপর গ্রাহক-যন্ত্রে দু-রকম শব্দ সৃষ্টি করে—হ্রস্ব শব্দ 'টরে' ও দীর্ঘ শব্দ 'টক্কা'। মোর্স নামে এক বিজ্ঞানী ইংরাজীর 26-টা অক্ষর এই 'টরে' ও 'টক্কা' শব্দ দুটা বিভিন্ন রকমে সাজিয়ে একটা সাংকেতিক ভাষার উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবস্থায় গ্রাহক-যন্ত্রের ওই শব্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে অক্ষরগুলো বুঝে নেওয়া হয়। পরে অক্ষরগুলো সাজিয়ে সমস্ত সংবাদটা এর থেকে বুঝা যায়। প্রেরকযন্ত্র থেকে গ্রাহকযন্ত্রে আগত মৃদু তড়িৎপ্রবাহকে অবশ্য রিলে ↑ করে বাড়িয়ে নেওয়া হয়।

টেলিপ্রিণ্টার — টেলিগ্রাফের সাহায্যে দূরাগত সংবাদের স্বয়ংক্রিয় লিখন-যন্ত্র। বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শব্দ আপনা থেকে যন্ত্রস্থ কাগজের উপর বিন্দু ও রেখা অঙ্কিত করে এক রকম সাংকেতিক লেখার সৃষ্টি করে। আজকাল আবার এর এমন উন্নত যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যার সাহায্যে টেলিগ্রাফে আগত সংবাদ একেবারে টাইপ-রাইটারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। এরূপ যন্ত্রকে বলে টেলিপ্রিণ্টার বা টেলিটাইপ।

টেলিফটো লেন্স— দূরের জিনিস পরিষ্কারভাবে দেখবার উপযোগী যে এক রকম টেলিস্কোপের লেন্স ↑ ফটোগ্রাফিক ক্যামেরায় লাগিয়ে দূরবর্তী বস্তুর সুস্পষ্ট ছবি তোলা হয়। এরূপ লেন্স ব্যবহারের ফলে দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছবি ক্যামেরার ফোকাসের ↑ মধ্যে এসে যায় এবং ফটোগ্রাফির ↑ সাধারণ নিয়মে তার ফটো ওঠে। এতে ক্যামেরার সাধারণ লেন্সের জায়গায় বিশেষ ধরণের একখানা কন্‌কেভ ↑ ও একখানা কনভেক্স ↑ লেন্স একসঙ্গে লাগান থাকে।

টেলিভিসন — যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু বা দৃশ্যের ছায়াচিত্র কৌশলে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা যায়। যে বস্তুর প্রতিকৃতি দূরে পাঠাতে হবে তার উপর আলোকপাত করলে প্রেরক-যন্ত্রের মধ্যে আলো-ছায়ার তীব্রতার তারতম্যানুযায়ী যান্ত্রিক কৌশলে তড়িত্তরঙ্গ উৎপাদিত হয় এবং

তা বেতার-তরঙ্গের (ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) ন্যায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তড়িত্তরঙ্গ
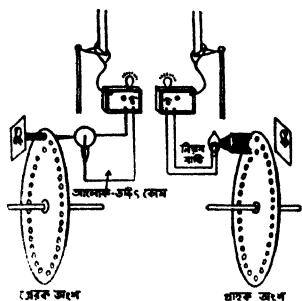
টেলিভিসন যন্ত্রের মোটামুটি নক্সা

গ্রাহকযন্ত্রে উপস্থিত হয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় তার মধ্যস্থ নির্দিষ্ট আলোক-রশ্মির তীব্রতার তারতম্য ঘটায়। এভাবে প্রেরক-যন্ত্রস্থ আলোকরশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুযায়ী গ্রাহক-যন্ত্রের আলোকরশ্মিরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে ও তদনুযায়ী আলো-ছায়ার সৃষ্টি করে। এভাবে দূরবর্তী প্রেরক যন্ত্রের সম্মুখস্থ চিত্র বা দৃশ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি গ্রাহক-যন্ত্রের সম্মুখস্থ পর্দায় ফুটিয়ে তোলে। শত শত মাইল দূরবর্তী লোকের অঙ্গভঙ্গি সহ সম্যক চিত্র এভাবে গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায় ফুটে ওঠে। রেডিওতে তার মুখের কথাও সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়।

টেলিস্কোপ — দূরবীক্ষণ যন্ত্র; বহু দূরবর্তী পদার্থের প্রতিচ্ছবি বর্ধিতাকারে দেখবার জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র। 1603 খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করেন; ক্রমে অবশ্য এ-যন্ত্রের নানারূপ উন্নতি সাধিত হয়েছে। সম্প্রতি মাউন্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারের 200″ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতিফলক-লেন্সযুক্ত টেলিস্কোপে লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ (লাইট-ইয়ার ↑) দূরের জ্যোতিষ্কও দেখা যাচ্ছে। **রিফ্র্যাক্টিং টেলিস্কোপ** যন্ত্রের অব্জেক্টিভে ↑ থাকে একখানা অপেক্ষাকৃত বড় উত্তল (কনভেক্স ↑) লেন্স, যার ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে দৃশ্য পদার্থের ক্ষুদ্র কিন্তু পরিষ্কার প্রতিচ্ছায়া যন্ত্রের ভিতর পড়ে। ওই প্রতিচ্ছায়া আবার আইপিসের অবতল (কন্‌কেভ ↑) লেন্সের ভিতর দিয়ে বর্ধিতাকারে দৃষ্টিগোচর হয়। **রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপের** অব্জেক্টিভে থাকে লেন্সের বদলে একখানা অবতল (কন্‌কেভ) দর্পণ, যাতে প্রতিফলিত হয়ে দৃশ্য পদার্থের ছায়া যন্ত্রের

ভিতরে পড়ে, যা আবার আইপিসের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে বর্ধিতাকারে দেখা যায়। এ-সব দূরবীক্ষণ গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হয়; এতে দৃশ্য পদার্থের উল্টো ছায়া পড়ে বলে ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী জিনিস দেখা অসুবিধাজনক। এজন্যে আবার একখানা প্রিজম ↑ বিশেষ ব্যবস্থায় এরূপ টেলিস্কোপে লাগান হয়, যার ফলে উল্টো ছায়া সোজা হয়ে দর্শকের চোখে পড়ে। (বাইনোকুলার ↑)

ট্যানিং — জীবজন্তুর কাঁচা চামড়াকে যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরী-চামড়ায় (লেদার) পরিণত করা হয়। এজন্যে ট্যানিক অ্যাসিড, বিভিন্ন ট্যানিন ↑, অ্যালাম ↑ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া করা হয়ে থাকে। ক্রোমিয়াম ↑ ঘটিত বিভিন্ন সল্টও ট্যানিং-এর কাজে দরকার হয়।

ট্যানিক অ্যাসিড — এক প্রকার উদ্ভিদের গল্‌-নাট নামক ফল থেকে নিষ্কাশিত রাসায়নিক পদার্থ; সাদা গুঁড়া, জলে দ্রবণীয়। হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি দেশীয় নানা রকম উদ্ভিজ্জ ফল থেকেও এ জাতীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, এগুলো সব 'ট্যানিন' নামে পরিচিত। এর মধ্যেও ট্যানিক অ্যাসিড থাকে। চর্ম-শি[illegible] (ট্যানিং ↑) ও কালি তৈরী কর[illegible] ব্যবহৃত হয়।

ট্যাল্‌ক — নরম এক রকম পাথরে[illegible] মসৃণ চূর্ণ। পদার্থটা দিয়ে সাধারণ[illegible] গায়ে মাথার (ট্যালকাম্‌) পাউডা[illegible] তৈরী হয়। রাসায়নিক হিসে[illegible] পাথরটা হোল ম্যাগ্নেসিয়া[illegible] সিলিকেট ↑।

ট্যালো — বিশোধিত জান্তব চর্বি[illegible] বিশেষভাবে গরু, ভেড়া প্রভৃতি[illegible] চর্বি থেকেই বিভিন্ন প্রক্রিয়া[illegible] ট্যালো তৈরী হয়। রাসায়নি[illegible] হিসেবে নানা রকম গ্লিসারাইড পদার্থে গঠিত। বিভিন্ন খাদ্য-বস্তু[illegible] মিশ্রিত করা হয়; সাবান প্রস্তুতে[illegible] এর ব্যবহার আছে।

ট্রয়-ওয়েট — মণিমুক্তা, সোনা-রূপ[illegible] মাপবার ইংলণ্ডীয় ওজন পরিমাণ:

1 গ্রেণ = ·0648 গ্র্যাম
20 গ্রেণ = 1 স্ক্রুপল
24 গ্রেণ = 1 পেনিওয়েট
3 স্ক্রুপল = 1 ড্রাম
8 ড্রাম = 1 আউন্স ট্রয় = 1·1 আউন্স অ্যাভয়র্ড্‌পয়ে[illegible]

ট্রাইবেসিক অ্যাসিড — যে [illegible] অ্যাসিডের আণবিক গঠনে এ[illegible] তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণু থা[illegible] যেগুলোর ক্রমাগত বিচ্যুতি ঘটি[illegible] তিন রকম সল্ট গঠিত হ[illegible]

ফস্ফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) এ-রকম একটা অ্যাসিড। এর সোডিয়াম সল্ট তিন রকমের হতে পারে; Na_3PO_4, Na_2HPO_4, NaH_2PO_4 (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

ট্রিগনোমেট্রি — ত্রিকোণমিতি; গণিতশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা। ত্রিভুজের বাহু ও কোণের বিভিন্ন অনুপাত (রেসিও, যেমন—সাইন, কস্, ট্যান প্রভৃতি) নিয়ে এই শাখায় বিভিন্ন গাণিতিক তথ্যের সমাধান করা হয়।

ট্রান্সভার্স ওয়েভ — প্রবাহ-পথের লম্বভাবে স্পন্দিত বস্তুকণিকার সঞ্চরণ বা গতির ফলে যে তরঙ্গ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। এরূপ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হোল, স্পন্দিত পদার্থের কণিকাগুলোই উপরে নীচে ওঠা-নামা করার ফলে তরঙ্গের সৃষ্টি করে। আলোক ও বেতার-তরঙ্গ এরূপ; কিন্তু শব্দ-তরঙ্গ এরূপ
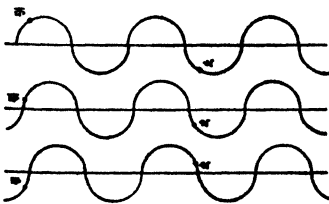
ট্রান্সভার্স ওয়েভ

ট্রান্সভার্স নয়—লঙ্গিচিউডিন্যাল ↑। জলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা ট্রান্সভার্স ওয়েভের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

টান্সমুাটেসন অব এলিমেন্ট — একটা মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠন বদলে ফেলে অন্য কোন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা। এক সময় অ্যালকেমিস্টরা ↑ এরই চেষ্টা করতেন; পরে এটা অসম্ভব বলে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু সম্প্রতি স্বয়ংপ্রভ (রেডিও-অ্যাকৃটিভ ↑) পদার্থের তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দেখা গিয়েছে, রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থে এরূপ পারমাণবিক মৌলিক পরিবর্তন অহরহঃই ঘটে থাকে। ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় পরিণত হয়ে যায়। তাছাড়া নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পরীক্ষাদিতে সাইক্লোট্রোন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে নিউট্রন কণিকা, আলফা ↑ কণিকা প্রভৃতির সংঘাতে বেরিলিয়াম ↑ ধাতুকে কার্বনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক রকম মৌলিক পদার্থকে অন্য রকম মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

ট্রান্সফর্মার — যে যন্ত্রের সাহায্যে অল্টারনেটিং (পরিবর্তী) তড়িৎ প্রবাহের তড়িৎ-চাপ (ভোল্টেজ ↑) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। এর মূল

ব্যবস্থা হোল : বৈদ্যুতিক তারের একটা ছোট কয়েলের চারদিক ঘিরে আর একটা বড় কয়েল (তার-কুণ্ডলী) এমনভাবে রাখা হয় যেন দুটার মাঝে কিছু ফাঁক থাকে। ছোট কয়েলটাকে বলে প্রাইমারি কয়েল, আর বড়টাকে বলে সেকেণ্ডারি কয়েল। ভিতরে প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে একটা লোহার রড দিলে
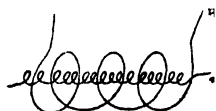
ট্রান্সফর্মার

আরও ভাল হয়। এখন প্রাইমারি কয়েলের মধ্যে অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রবাহিত হলে ইণ্ডাকসনের ↑
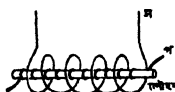
ট্রান্সফর্মার

ফলে সেকেণ্ডারি কয়েলেও ওই অল্টারনেটিং কারেন্টের তড়িৎ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তার ভোল্টেজ বদলে যায়। তড়িৎ-প্রবাহের ভোল্টেজের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে ওই দুই কয়েলে জড়ানো তারের পাকের সংখ্যার উপর। সেকেণ্ডারি কয়েলে প্রাইমারি কয়েল অপেক্ষা তারের পাক বেশী থাকলে ভোল্টেজ বেড়ে যায়। এরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'স্টেপ-আপ ট্রান্সফর্মার'। আর, সেকেণ্ডারি কয়েলে পাকের সংখ্যা কম হলে ভোল্টেজ কমে যায়। একে বলে 'স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মার'।

ট্রান্সইউরেনিক এলিমেন্ট— যে সব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন ইউরেনিয়ামের ↑ চেয়ে বেশী। মেণ্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবলে ↑ এরূপ কয়েকটা মৌলিক পদার্থের উল্লেখ আছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে — নেপচুনিয়াম (93), প্লুটোনিয়াম (94), অ্যামিরিসিয়াম (95), কুরিয়াম (96), বার্কেলিয়াম (97), ক্যালিফোর্নিয়াম (98)। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 92; এগুলোর তার চেয়ে বেশী। অদ্যাপি পৃথিবীতে এ-রকম স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি; তবে উপযুক্ত কৌশলে কেন্দ্রীন বিভাজনের (ফিসন ↑) সাহায্যে এগুলো পাওয়া যেতে পারে।

ট্রোপোস্ফিয়ার— পৃথিবীর নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলীয় স্তর। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 10 মাইল উচ্চতাবিশিষ্ট এই স্তরেই পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে এই স্তরের যত উপরে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা তত হ্রাস পায়।

ড

ডাইরেক্ট ডাই — যে সব রঞ্জক পদার্থ তুলা, রেয়ন ↑ বা অন্যান্য সেলুলোজ ↑ জাতীয় পদার্থকে সোজাসুজি (কোন 'মরড্যাণ্ট' ↑ ব্যতিরেকে) রঞ্জিত করতে পারে। সাধারণতঃ এসব রঞ্জক দ্রব্যের দ্রবণের সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে কিছু সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সালফেট মিশিয়ে নেওযা হয় মাত্র।

ডাইরেক্ট কারেণ্ট — যে তড়িৎ-স্রোত সর্বদা স্থিরভাবে একই দিকে প্রবাহিত হয়; অল্টারনেটিং (পরিবর্তী) কারেণ্টের মত ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে না। সংক্ষেপে বলে ডি. সি. প্রবাহ।

ডাচ্ মেটাল — তামা ও দস্তার সংকর ধাতু। এই শ্রেণীর বিভিন্ন সংকর ধাতুকে সাধারণতঃ বলা হয় পিতল বা ব্রাস।

ডাচ্ লিকুইড — ইথিলিন ডাইক্লোরাইড, $C_2H_4Cl_2$; বর্ণহীন তৈলাক্ত তরল পদার্থ। উৎকৃষ্ট দ্রাবক ও ধূম উৎপাদক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডাইমর্ফিজম্—কোন কঠিন পদার্থে দু-রকম বিভিন্ন আকারের স্ফটিক বা দানা গঠিত হওয়ার অবস্থা; এ রকম পদার্থকে বলে ডাইমর্ফাস।

ডাইভিং বেল — যে এক রকম ধাতব (ঘণ্টাকৃতি অথবা বাক্সের মত) আধারে করে পর্যবেক্ষণ বা কোন কাজকর্ম করবার জন্যে লোকে জলের নীচে নামে। এই বিরাট আধারটার তলার দিক থাকে খোলা, কিন্তু একটা পাইপ দিয়ে উপর থেকে এমনভাবে বাতাস পাম্প করে ঢোকান হয় যাতে নীচের
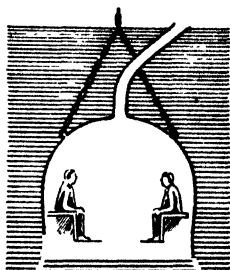
ডাইভিং বেল

জল আধারটার ভিতরে ঢুকতে পারে না; ডুবুরী স্বচ্ছন্দে ওর ভিতরে থাকতে পারে। প্রয়োজন শেষ হলে শিকলে বাঁধা আধারটাকে সময়মত টেনে উপরে তোলা হয়।

ডায়মণ্ড — হীরক; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা মূলতঃ কার্বন বা কয়লা; কার্বনের একটা স্বাভাবিক অ্যালোট্রোপ ↑। সাধারণতঃ বর্ণহীন, উজ্জ্বল, স্ফটিকাকার মূল্যবান পদার্থ। পরিচিত সকল

পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে কঠিন। কৃত্রিম উপায়ে হীরকের প্রায় অনুরূপ পদার্থ তৈরী করা যেতে পারে; প্রায় 3500° সেন্টিগ্রেডে গলিত লোহার মধ্যে কার্বন গলিয়ে ফেলে সহসা ঠাণ্ডা করে ফেললে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক-কণা পাওয়া যায়। ময়সাঁ নামে এক বিজ্ঞানী এভাবে এক রকম কৃত্রিম হীরক তৈরী করেছিলেন; কিন্তু প্রক্রিয়াটা ব্যয়-বহুল ও কষ্টসাধ্য বলে স্বভাবজাত হীরক অপেক্ষাও জিনিসটা অধিক মূল্যবান হয়ে পড়ে।

ডায়নামো — তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটা এক রকম জেনারেটর↑, যার সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই যন্ত্রে সাধারণতঃ ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডি. সি) উৎপন্ন হয়ে থাকে। মোটামুটি এর যান্ত্রিক কৌশলটা হোল: একটা শক্তিশালী ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটের↑ দুই প্রান্তের মাঝে বৈদ্যুতিক তার-কুণ্ডলি (কয়েল) স্থাপিত হয। ইলেক্ট্রো ম্যাগ্নেটটাকে বলে 'ফিল্ড ম্যাগনেট', আর ওই কয়েলকে বলে 'আর্মেচার'। ফিল্ড ম্যাগ্নেটটাকে সবেগে ঘোরানো হয়। এই ঘূর্ণনের ফলে ইণ্ডাকসনের↑ প্রভাবে আর্মেচারে তড়িৎ শক্তি সঞ্চারিত হয়। আর্মেচার থেকে এই তড়িৎশক্তি তড়িৎ-পরিবাহী তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে নানা কাজে লাগান হয়। বিভিন্ন পাওয়ার স্টেশনে বিভিন্ন রকম ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

ডায়েস্টেজ — গম, বার্লি প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত এক রকম এনজাইম↑ পদার্থ, যা শ্বেতসারকে শর্করায় রূপান্তরিত করে। ওই সব খাদ্য-শস্যের মণ্ড করে বিশেষ ব্যবস্থায় গাঁজিয়ে পরে শুকিয়ে ফেললে মল্ট তৈরী হয়, যার মধ্যে থাকে এই ডায়েস্টেজ। এই মল্ট পুনরায় গাঁজিয়ে মদ্য প্রস্তুতের সময়ে ওর ডায়েস্টেজ অংশ মল্টের প্রধান উপাদান স্টার্চ বা শ্বেতসার অংশকে **মল্টোজ**↑ নামক শর্করায় পরিবর্তিত করে ফেলে।

ডি ডি. টি. — কীটপতঙ্গ-নাশক এক রকম রাসায়নিক পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম; এর পূর্ণ নাম হোল, ডাই-ক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রা ই ক্লো রো-ইথেন। সাদা গুঁড়া, সামান্য সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত। বিভিন্ন কীটপতঙ্গ নাশক রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। একে কখন কখন 'ডিকোফেন'ও বলা হয়।

ডিউ পয়েন্ট — যে উষ্ণতা বা

তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমতে সুরু করে এবং জলে পরিণত হয়ে শিশির সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বাতাসে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে, তাপ কমে গেলে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্পেই ওই বাতাস অত্যধিক সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে, ফলে অতিরিক্ত বাষ্প জলে পরিণত হয়। রাত্রিকালে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে মোটামুটি এজন্যেই শিশিরপাত হয়।

ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক — এক রকম কাঁচ পাত্র, যার মধ্যে রেখে কোন পদার্থের উষ্ণতা বহুক্ষণ বজায় রাখা যায়। এর মধ্যে ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে, গরম জিনিস গরম থাকে—বাইরের তাপে ভিতরের জিনিসের তাপ সহসা পরিবর্তিত হয় না। এ রকম পাত্রকে সাধারণভাবে বলে থার্মো-ফ্ল্যাস্ক। এর কৌশলটা হোল : পাত্রটার গায়ে দুটা দেওয়াল থাকে, দুই দেয়ালের মাঝখানটা থাকে বায়ুশূন্য। এভাবে বাইরের বায়ুর সংস্রব-শূন্য হওয়ায় ভিতরের উত্তাপ পরিবাহিত হয়ে জিনিসটা সহজে ঠাণ্ডা হতে পারে না। আবার পাত্রটার বহির্গাত্রে পারদ ঘটিত একটা আস্তরণ দেওয়া থাকায় তাপের পরিবহন অনেকটা কম হয়। পাত্রটার মুখে মোটা কর্কের ছিপি আঁটা থাকে। ব্যবহারের সুবিধার জন্যে সাধারণতঃ এরূপ কাঁচপাত্র একটা টিনের খোলের মধ্যে এঁটে বসান থাকে।
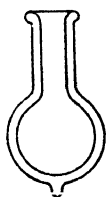
ডিউয়ার ফ্ল্যাস্ক

ডিকক্‌সন—উদ্ভিজ্জ পদার্থের ক্বাথ। ভেষজ গুণসম্পন্ন লতাপাতা জলে সিদ্ধ করে তার যে ক্বাথ তৈরী হয়। এরূপ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ক্বাথ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কবিরাজী পাচনগুলো সব এরূপ পদার্থ।

ডিকম্পোজিসন — যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলোর পৃথকী-করণ ; বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে এরূপ করা সম্ভব হয়। যেমন, মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করলে ডিকম্পোজিসন ঘটে, অর্থাৎ তার উপাদান মার্কারি (পারা) ও অক্সিজেন গ্যাস পৃথক (ডিকম্পোজড্) হয়ে যায়।

ডিটোনেটিং গ্যাস—দুভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ। এর মধ্যে সামান্য অগ্নি সংযোগ বা তড়িৎ-স্ফুরণ করলে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে রাসায়নিক মিলন ঘটে, জল উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থের মত এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণ

ডিটোনেট করে বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

ডিটোনেটর — মার্কারি-ফুলমিনেট ↑ ও অন্যান্য যে-সব পদার্থের মধ্যে অতি দ্রুত বিস্ফোরণ ঘটান সম্ভব হয়। রাইফেল, বন্দুক প্রভৃতির কার্তুজের মাথায় এ-রকম পদার্থ দেওয়া থাকে, এর বিস্ফোরণের ফলেই কার্তুজের বারুদও বিস্ফোরিত হয়ে থাকে।

ডিজেল ইঞ্জিন — এক রকম ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন ↑, যা ভারী তেল পুড়িয়ে চালানো হয়। মোটর গাড়ার ইঞ্জিনের মত এতে ইলেক্‌ট্রিক স্পার্ক ↑ দিয়ে তেল জ্বালান হয় না। এর ইঞ্জিনের আবদ্ধ কক্ষে প্রচণ্ড চাপে বাতাস উত্তপ্ত করে তোলা হয়, কৌশলে তার মধ্যে সূক্ষ্ম ধারায় ধীরে ধীরে তেল প্রবেশ করান হয়ে থাকে। বাতাসের উত্তাপে ওই তেল জ্বলে ওঠে; আর এর ফলে উৎপন্ন গ্যাসের প্রবল চাপে ইঞ্জিনে গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়।

ড্রিঙ্কার অ্যাপারেটাস্ — আয়রন লাংস ↑।

ডিক্যাণ্টেসন— কঠিন ও তরল পদার্থের কোন সংমিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থটাকে পৃথক করে ফেলার একটা সহজ প্রক্রিয়া। সংমিশ্রণটা স্থির ভাবে রেখে দিলে মিশ্রিত কঠিন পদার্থ সব থিতিয়ে তলায় জমে, উপর থেকে তরল পদার্থটা সাবধানে ঢেলে নেওয়া যায়। এ প্রক্রিয়া মিশ্রণের ক্ষেত্রেই খাটে। কঠিন পদার্থটা তরল পদার্থের মধ্যে দ্রবীভূত থাকলে এভাবে পৃথক করা সম্ভব হয় না।

ডিপোলারাইজার — বৈদ্যুতিক সেলের ↑ পজিটিভ প্লেটের উপর গ্যাস জমে গিয়ে তড়িৎ উৎপাদন হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে বলে সেলের **পোলারিজেসন**; যেমন, জিঙ্ক-কপার সেলে কপার (তামার) প্লেটের উপর হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা আস্তরণ পড়ে গিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে ফেলে। তড়িৎ উৎপাদনের এরূপ বাধা দূর করবার জন্যে যে সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাদের বলে ডিপোলারাইজার; যেমন, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) সাধারণ ড্রাই-সেলে ↑ ডিপোলারাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডিনামাইট — বিশেষ এক প্রকার বিস্ফোরক পদার্থ। 'কিসেলগার' নামক ছিদ্রবহুল এক রকম বালি-মাটির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন ↑ নামক তরল বিস্ফোরক পদার্থ মিশিয়ে তৈরী হয়। ডিনামাইটের

বিস্ফোরণে পাহাড় পর্য্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হয়।

ডিফ্র্যাক্সন — আলোক-রশ্মির অপ-বর্তন। সাধারণ আলোকরশ্মির তরঙ্গপ্রবাহ কোন অস্বচ্ছ পদার্থে বাধা পেলে সামান্ত বেঁকে যায়। কৌশলে ওই বাধাপ্রাপ্ত রশ্মি কোন পর্দার উপর ফেললে এক রকম বর্ণালীর (স্পেক্ট্রাম ↑) সৃষ্টি করে। কোন রঙ্গীন (এক-বর্ণী) রশ্মি হলে পর্দার উপর পর্যায়ক্রমে কালো রেখার সঙ্গে ওই বর্ণের রেখা ফুটে ওঠে। আলোক-তরঙ্গের এই গতি-প্রকৃতিকে ডিফ্র্যাক্সন বা অপবর্তন বলে। কেবল আলোক-তরঙ্গ নয়, অন্যান্য তরঙ্গের বেলায়ও এরূপ অপবর্তন দেখা যায়।

ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং— আলোকরশ্মি, বা অন্য কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহকে তার বিভিন্ন সংগঠক তরঙ্গমালায় বিশ্লিষ্ট করে ফেলার
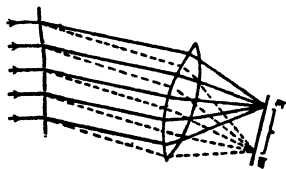
ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং

যন্ত্র। এর ফলে প্রাথমিক তরঙ্গ বিভিন্ন তরঙ্গে বিভক্ত হয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করে। এজন্যে সাধারণতঃ এক খণ্ড কাঁচের উপর সমদূরবর্তী ও সমান্তরাল ভাবে অসংখ্য দাগ কাটা হয়, প্রতি ইঞ্চিতে 14,... থেকে 20,000 পর্যন্ত এরূপ সূক্ষ্ম দাগ কাটা হয়ে থাকে। এর উপরে পড়ে প্রাথমিক রশ্মির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলো ওই অতি সূক্ষ্ম কাটা-দাগের উপর প্রতিসরিত হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এর ফলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে বিভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি করে, পর্দায় বর্ণালী ফুটে ওঠে। কোন রশ্মি বা তরঙ্গ-প্রবাহ কিরূপ বিভিন্ন তরঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত, তা এই কৌশলে ধরা যায়। কাঁচের বদলে এরূপ দাগ-কাটা ধাতব পাতও ব্যবহার করা যায়; এর উপর তরঙ্গমালা প্রতিফলিত হয়। একে তখন বলে **রিফ্লেক্সন গ্রেটিং**। এরূপ দাগ-কাটা কাঁচ বা ধাতব পাত সমতল বা অবতল দুইই ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডেক্স্ট্রিন — সামান্য অ্যাসিড মিশিয়ে শ্বেতসার পদার্থ জলে ফুটালে যে আঠালো পদার্থ পাওয়া যায়। একে স্টার্চগাম-ও বলে। শ্বেতসার (স্টার্চ ↑) পদার্থের আংশিক হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন কার্বো-হাই-ড্রেটের ↑ সংমিশ্রণে জিনিসটা সৃষ্টি

হয়। ডাকটিকেট, খাম প্রভৃতিতে এরূপ গাম বা আঠা লাগান হয়।

ডেক্স্ট্রোজ—গ্লুকোস ↑ বা গ্রেপ-সুগার ↑।

ডিস্টিলেসন—চোলাই করা; যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থকে উপযুক্ত তাপ প্রয়োগে বাষ্পীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে পুনরায় তাপ কমিয়ে তরল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে বিশুদ্ধ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বলে 'ডিস্টিলেট্'। অবিশুদ্ধ তরল পদার্থ এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ বা বিশোধিত করা হয়। উদ্বায়ী পদার্থ মিশ্রিত থাকলে অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় কাজ হয় না। আবার বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল পদার্থ মিশ্রিত থাকলেও এর সাহায্যে কৌশলে তাদের আলাদা করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে 'ফ্র্যাক্সন্যাল ডিস্টিলেসন' বলে।

ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন — আবদ্ধ পাত্রে কোন পদার্থ অত্যুত্তপ্ত করে তার রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করার প্রক্রিয়া, যার ফলে ওই পদার্থের বিভিন্ন উপাদান চোলাই (ডিষ্টিলেসন) হয়ে পৃথক হয়ে যায়। কয়লা থেকে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোল-গ্যাস, আলকাতরা (কোলটার ↓) প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। এভাবে কাঠ চোলাই করে মিথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায়।

ডেন্সিটি—বস্তুর ঘনত্বের পরিমাণ। কোন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনে কি পরিমাণ বস্তু বর্তমান আছে তা এর এককে প্রকাশ করা হয়। কোন পদার্থের এক ঘন সেন্টি-মিটার (সি. সি) আয়তনে যত গ্র্যাম ↑ বস্তু রয়েছে তাই হোল পদার্থটার ডেনসিটি। এ হিসেবে কোন পদার্থের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ ও ডেনসিটি সংখ্যাগত-ভাবে একই হয়ে থাকে।

ডেভি ল্যাম্প — বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি কয়লার খনিতে নিরাপদে ব্যবহারের উপযোগী যে বাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। একে ডেভিজ্ সেফ্টি ল্যাম্পও বলা হয়। কয়লার খনির মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন দাহ্য গ্যাস প্রচ্ছন্ন থাকে; অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এলেই এগুলো জ্বলে উঠে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিপদ নিবারণের জন্যে ডেভির

ডেভি ল্যাম্প

উদ্ভাবিত ল্যাম্পের বৈশিষ্ট্য হোল, এর আলোকশিখা একটা লোহার জালের চিমনির মধ্যে জ্বলে। দাহ্য গ্যাস ভিতরে ঢুকলে জ্বলে ওঠে সত্য, কিন্তু সে অগ্নিশিখা সহজে জালের বাইরে ছড়াতে পারে না। ওই ধাতব জাল উত্তাপ টেনে নেয়, ফলে বাইরের গ্যাস সহসা জ্বলে ওঠার মত উত্তপ্ত হতে পায় না।

ডেল্‌টা মেটাল — সংকর ধাতু ; এটা সাধারণতঃ 55% তামা, 43% দস্তা, সামান্য কিছু লোহা ও অপরাপর ধাতু মিশিয়ে তৈরী হয়।

ডেল্‌টা রে—অপেক্ষাকৃত মন্দগতির ইলেক্ট্রন কণিকার ধারা-প্রবাহ। অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থের উপর আলফা রশ্মি ↑ পড়লে এরূপ ডেল্‌টা-কণিকা ধারার উৎপত্তি হয়। এই ডেল্‌টা কণিকার ধারা (রশ্মি) আল্‌ফা কণিকার প্রবাহ পথের লম্বভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। (আল্‌ফা-কণিকা হোল হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণু-কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস।)

ডেলিকোয়েসেন্ট—যে সব পদার্থ বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই জলে দ্রবিত হয়। খোলা হাওয়ায় রাখলে ডেলিকোয়েসেন্ট পদার্থ সব এভাবে ক্রমে দ্রবিত হয়ে পড়ে।

ডেট্‌ লাইন—ইণ্টারন্যাশন্যাল ডেট্‌ লাইন ↑ ।

ডেসিকেটর—বিভিন্ন পদার্থ বিশুষ্ক রাখবার জন্যে রসায়নাগারে ব্যবহৃত এক রকম কাঁচপাত্র ; বিশেষতঃ ডেলিকোয়েসেন্ট পদার্থ বিশুষ্ক রাখার জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচের পাত্রটার মুখে থাকে বায়ু-রোধক ঢাক্‌না, তলদেশে ফসফরাস পেণ্ট-অক্সাইড (P_2O_5,) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) প্রভৃতি হাইগ্রোস্কোপিক ↑ (জল টেনে নেয় এমন) পদার্থ দেওয়া থাকে।

ডেসিকেটর

ডোলোমাইট—ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর স্বাভাবিক যুক্ত কার্বনেট ($MgCO_3$. $CaCO_3$) ; সাদাটে কঠিন প্রস্তর বিশেষ ; পর্বতাদি এ দিয়ে গড়া। একে **পার্ল স্পার**ও বলা হয়।

ড্যালটন্‌স অ্যাটমিক থিওরি—অ্যাটমিক থিওরি ↑ ।

ড্রাই সেল — তড়িৎ উৎপাদক ব্যাটারি ↑ বিশেষ। এর মধ্যে কোন তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না ; এজন্যেই একে শুষ্ক, অর্থাৎ ড্রাই-সেল বলে। 'লেক্‌ল্যান্স সেল' ↑ এরূপ।

জিঙ্কের তৈরী খোলের মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের এক রকম কাই ইলেক্ট্রোলাইট ↑ হিসেবে ভরতি থাকে। ভিতরে থাকে একটা কার্বন দণ্ডের ইলেক্ট্রোড। ডিপোলাইজার ↑ হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, MnO_2, ব্যবহৃত হয়। টর্চের ব্যাটারি সাধারণতঃ এরূপ একটা ড্রাই-সেল মাত্র।

ড্রাই আইস — অত্যধিক চাপে উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তরল হয়ে যায়। এই তরল পদার্থের তাপ আরও হ্রাস করলে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বলে ড্রাই-আইস। এর প্রধান বিশেষত্ব হোল এই যে, পদার্থটা কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তরল হয় না। রেফ্রিজারেটর ↑ (শীতল কক্ষ) যন্ত্রে অনেক সময় ড্রাই-আইস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ড্রেজার — মাটি কাটবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। বিশেষভাবে জলের তলা থেকে যে যন্ত্রের সাহায্যে কাদা মাটি তুলে ফেলে জলপথের গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়।

থ

থাইমল — ফেনল জাতীয় একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{14}O$; সাদা, স্ফটিকাকার, সামান্য গন্ধযুক্ত। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল থেকে পাওয়া যায়। পদার্থটার কিছু ভেষজ গুণ আছে; বীজাণু প্রতিরোধক শক্তিও কিছু বর্তমান।

থার্ম — উত্তাপ পরিমাপের একক বিশেষ; প্রায় 56 গ্যালন ↑ বরফ-জল যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগে ফুটে ওঠে, তাকে বলে এক থার্ম, প্রায় 252 লক্ষ ক্যালরির ↑ সমান। আবার এক থার্ম হোল এক লক্ষ বৃটিশ থার্মাল ইউনিট, সংক্ষেপে বি. টি. ইউ (B. T. U)। আবার সাধারণভাবে তাপের পরিমাণ বা শক্তি বুঝাতেও থার্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়। থার্মাল মানে, তাপ সম্বন্ধীয়। কোন পদার্থের থার্মাল ক্যাপাসিটি বললে বুঝতে হবে, যে পরিমাণ তাপে (যত বৃটিশ থার্মাল ইউনিটে) সেই পদার্থের তাপমাত্রা মাত্র এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়।

থার্ম্যাল নিউট্রন—অতি ধীরগতি ও তদনুযায়ী অত্যল্প শক্তিবিশিষ্ট নিউট্রন কণিকা। অ্যাটমিক পাইলে ↑ নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায়

ডয়েটেরন (হেভি হাইড্রোজেন ↑) ও গ্রাফাইট মডারেটরের সাহায্যে এই থার্ম্যাল নিউট্রন কণিকার উদ্ভব হয়

থার্মিট—অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ ও আয়রন অক্সাইডের সংমিশ্রণে গঠিত পদার্থ। একে থার্মাইট-ও বলা হয়। এই সংমিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আয়রন-অক্সাইডের অক্সিজেন অংশ অ্যালুমিনিয়ামের দহনকার্যে সহায়তা করে ; আর, এর ফলে উৎপন্ন তাপে আয়রন (লোহা) গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ওই গলিত লোহায় যন্ত্রাদির ভাঙ্গা অংশ জুড়ে মেরামত করা হয়ে থাকে।

থার্মোকাপ্‌ল—পদার্থের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের এক রকম যন্ত্র বিশেষ। দুটা বিভিন্ন ধাতব তারের (যেমন, তামা ও লোহা) দুই প্রান্ত জুড়ে নিয়ে দু-জায়গায়

থার্মোকাপ্‌ল (তথ্যগত চিত্র)
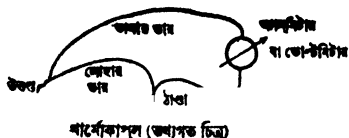
লাগান হয়। ওর এক জায়গার উষ্ণতা মাপা হবে, অপর জায়গা হবে অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপযুক্ত, অর্থাৎ ঠাণ্ডা, যার উষ্ণতা জানা থাকবে। ওই দুই স্থানের তাপের বিভিন্নতার জন্যে ওই সংযোজক তারের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হবে। এরূপে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তিকে বলা হয় **থার্মোইলেক্ট্রিসিটি**। গ্যালভ্যানোমিটার ↑ দিয়ে এই তড়িৎ-প্রবাহ মাপা হয় ; এর ভোল্টেজ ↑ জেনে ওই দুই স্থানের তাপ-বৈষম্যও জানা যেতে পারে। ওর এক স্থানের উষ্ণতা জানা থাকায় অপর স্থানের উষ্ণতা সহজেই নির্ধারিত হয়।

থার্মো-ইলেক্ট্রিসিটি—তাপশক্তি সরাসরি তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যে তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার বৈষম্যের ফলে থার্মোকাপ্‌ল ↑, থার্মোপাইল ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে এই থার্মোইলেক্ট্রিসিটির উদ্ভব ঘটে।

থার্মোকেমিষ্ট্রি— বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপের তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে কখন তাপ উদ্ভূত হয়, কখন বা আবার তাপ হ্রাস পায়। এরূপ তাপ-শক্তির পরিমাণ ও তথ্যাদি থার্মোকেমিষ্ট্রির আলোচ্য বিষয়।

থার্মোআয়নিক্স—উত্তাপের ফলে বিভিন্ন পদার্থ থেকে যে ইলেক্ট্রন কণিকার ধারা-প্রবাহ বা রশ্মি

নির্গত হয়, তদ্বিষয়ক বিবিধ তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

থার্মোগ্রাফ—এক রকম তাপমান যন্ত্র ; এর সাহায্যে কোন পদার্থের উষ্ণতার বিভিন্নতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই পদার্থের উষ্ণতার যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তা এ-রকম যন্ত্রে চিত্ররেখায় নির্দিষ্ট হয়ে যায়, এবং তা দেখে বিভিন্ন সময়ে তার উষ্ণতা সহজেই বুঝা যায়।

থার্মো-ডাইনামিক্স—উত্তাপের প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থে গতি-শক্তি, তড়িৎ-শক্তি প্রভৃতি যে বিভিন্ন রকম শক্তির উদ্ভব হয় তার নিয়ম ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় গাণিতিক বিজ্ঞান।

থার্মো-পাইল—কোন উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপ-রশ্মি (রেডিয়েসন ↑) পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ। অ্যান্টিমনি ও বিসমাথ ধাতুর কতকগুলো দণ্ড একটার পর একটার দুই প্রান্ত পরস্পর জুড়ে এ যন্ত্র তৈরী হয়। এভাবে প্রকৃতপক্ষে কয়েকটা থার্মো-কাপল ↑ শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। ওই ধাতব দণ্ডগুলো যাতে বিকিরিত তাপরশ্মি সম্যক শোষণ করতে পারে সেজন্যে অনেক সময়ে ওইগুলোর গায়ে ভূষা কালি মাখান হয়। বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের এরূপ সংযোগ-প্রান্তগুলো উত্তাপের মুখে রাখলে থার্মো-ইলেক্ট্রিক (থার্মো কাপল ↑) প্রবাহের উদ্ভব হয়। এই তড়িৎ-প্রবাহ সূক্ষ্ম গ্যালভ্যানোমিটার ↑ যন্ত্রের সাহায্যে মেপে বিকিরিত তাপের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

থার্মো-প্ল্যাস্টিক—যে সকল পদার্থ উত্তাপের সাহায্যে প্রয়োজনানুরূপ নমনীয় হয়ে যে-কোন আকার ধারণ করতে পারে ও ঠাণ্ডা হলে শক্ত হয়ে পড়ে। উত্তাপের সাহায্যে এ-রকম পদার্থ বার বার গলিয়ে নরম করে ফেলা যায়, কিন্তু পদার্থটার স্বকীয় ধর্ম বা গুণের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

থার্মোমিটার—তাপমান যন্ত্র, যার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ বা উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ধারণ করা যায়। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতঃই বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্নরূপ পরিবর্তন ঘটে ; এই পরিবর্তনের হার নির্ধারণ করেই পদার্থটার উষ্ণতারও পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এভাবে গ্যাস-থার্মোমিটার, মার্কারি-থার্মোমিটার,

থার্মো-কাপ্‌ল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের তাপ-পরিমাপক যন্ত্র হতে পারে। সাধারণ থার্মোমিটারে মার্কারি বা পারদ ব্যবহৃত হয়। পারদ একটা ছোট কাঁচ গোলকে ভর্তি থাকে ; ওই গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত একটা দাগ-কাটা বদ্ধমুখ সরু কাঁচনলের মধ্যে পারদ-সূত্র উষ্ণতা অনুযায়ী ওঠা-নামা করে। উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে ওই কাঁচ-গোলকের পারদ আয়তনে বেড়ে পারদ-সূত্র কাঁচ নলের মধ্যে উঠে যায়। কাঁচনলের গায়ে দাগকাটা ডিগ্রি-স্কেল দেখে তাপের তারতম্য নিরূপণ করা হয়।

থার্মোমিটার (ক্লিনিক্যাল)—জ্বর হলে যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় ; ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ↑ ।

থার্মোমিটার (গ্যাস)—যে তাপমান যন্ত্রে কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে সংলগ্ন পদার্থের উষ্ণতা নির্ধারিত হয়। গ্যাস-থার্মোমিটার দু-রকমের হতে পারে। কোন গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে তাপের তারতম্যে ওর গ্যাসীয় চাপের যে পরিবর্তন ঘটে ; অথবা, চাপ স্থির রেখে আয়তনের যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তা মেপে উষ্ণতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। তাপমান যন্ত্র হিসেবে গ্যাস-থার্মোমিটার তেমন সুবিধাজনক নয় ; এজন্যে সাধাণতঃ ব্যবহৃত হয় না। কেবল মাত্র অ্যাবসোলিউট টেম্পারেচার ↑ স্থির করবার জন্যে এর ব্যবহার আছে।

থার্মোমিটার (ম্যাক্সিমাম্ এণ্ড মিনিমাম্)—এক রকম বিশেষ ধরণের তাপমান যন্ত্র, যাতে বিভিন্ন সময়ে কোন বস্তুর উচ্চতম ও নিম্নতম উষ্ণতা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এ-রকম তাপমান যন্ত্রে কাঁচগোলকের মধ্যে অ্যালকোহল ↑ ভরতি থাকে, তার উপরে (কাঁচনলের নিম্নভাগে) সামান্য পারদ দেওয়া হয়। উত্তাপে অ্যালকোহল আয়তনে বাড়ে, আর তার চাপে পারদটুকু কাঁচের সরু নল-পথে উঠে যায়। কাঁচনলের ওই পারদ সূত্রের দু-দিকে লোহার দুটা ছোট টুকরা দেওয়া থাকে, যাকে বলে ইণ্ডেক্স। তাপ বৃদ্ধির ফলে ওই পারদ-
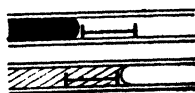
(পারদ নলের অংশমাত্র অঙ্কিত)
ম্যাক্সিমাম্ মিনিমাম্ থার্মোমিটার

সূত্র ইণ্ডেক্সটাকে ঠেলে উপরে তোলে, আর সেখানে ওটা আটকে থাকে। এর অবস্থান দেখে উচ্চতম (ম্যাক্সিমাম) তাপমাত্রা স্থির করা যায়। নীচের অপর

ইণ্ডেক্সটা যেখানে থেকে যায় সেখানকার স্কেল দেখে নিম্নতম (মিনিমাম্) তাপমাত্রা বুঝা যায়। এর কাঁচনলের গায়ে ডিগ্রি স্কেলে দাগ কাটা থাকে।

থার্মোস্টাট্—কোন আবদ্ধ স্থানের বা আধারের উষ্ণতা স্থির রাখবার জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম যন্ত্র। ইনকুবেটর ↑, রেফ্রিজারেটর ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ তাপ এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণতায় স্থির রাখা হয়। উত্তপ্ত হলে ধাতব পদার্থ মাত্রই আয়তনে বাড়ে, কিন্তু সব ধাতু সমান বাড়ে না। একই উত্তাপে লোহা ও পিতলের আয়তনবৃদ্ধির পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এখন লোহা ও পিতলের দুটো দণ্ডের দুই প্রান্ত জুড়ে একসঙ্গে বাঁকিয়ে চিত্রে প্রদর্শিত আকারে সংলগ্ন করা হয়।
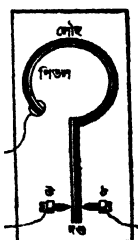
থার্মোস্ট্যাট্

কোন আবদ্ধ স্থানের অধিক উষ্ণতায় এর পিতলের দণ্ডটা অপেক্ষাকৃত বেশী বেড়ে গিয়ে বাঁকানো যুগ্ম-দণ্ডটা ক্রমে কিছু সোজা হয়ে 'ঠ' তড়িৎ-দ্বারে লেগে যায়; ফলে ওর সঙ্গে সংলগ্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ তাপ কমতে থাকে। আবার এভাবে যখন উষ্ণতা বেশী হ্রাস পায় তখন পিতলের দণ্ডটার আয়তন অপেক্ষাকৃত বেশী হ্রাস পাওয়ার ফলে যুগ্ম দণ্ডটা বেশী বেঁকে গিয়ে 'উ' তড়িৎদ্বারে লেগে যায়, 'ঠ' তড়িৎদ্বার বিযুক্ত হয়ে পড়ে, যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাপ আবার বাড়তে থাকে। এভাবে ওই আবদ্ধ স্থানের তাপ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী বা কম হতে পারে না, উষ্ণতা মোটামুটি স্থির থাকে। যন্ত্রটা যখন প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উষ্ণতায় থাকে তখন যুগ্ম দণ্ডটা 'উ' বা 'ঠ' কোন তড়িৎ-দ্বারেই লাগে না; উষ্ণতার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটাবার যান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিষ্ক্রিয় থাকে।

থ্যালিয়াম—মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Tl, পারমাণবিক ওজন 204·39, পারমাণবিক সংখ্যা 81. অনেকটা সীসার মত সাদা ও অপেক্ষাকৃত নরম পদার্থ। সহজেই এর সূক্ষ্ম তার ও পাত করা যায়।

থিয়োডোলাইট— দূরবর্তী কোন বস্তু বা স্থানের কৌণিক ব্যবধান পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ; জরিপ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান অংশ হোল একটা টেলিস্কোপ ↑, যা ডিগ্রি-চিহ্নিত

একটা গোলাকার স্কেলের উপর ঘুরিয়ে দূরের বস্তু লক্ষ্য করা হয়।

থিয়োডোলাইট (মোটামুটি গঠন)

থিয়োডোলাইট

যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ওই স্কেলের গায়ে দৃষ্ট বস্তুর অবস্থান-কোণ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

থেরাপিউটিক্স — রোগ নিরাময়ের জন্যে ঔষধাদির ব্যবস্থা; রোগের চিকিৎসা।

থোরিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Th, পারমাণবিক ওজন 232·12, পারমাণবিক সংখ্যা 90; গাঢ় ধূসরবর্ণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। মোনাজাইট ↑ নামক খনিজ পদার্থের মধ্যে সিরিয়াম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এর অক্সাইড (ThO_2) গ্যাস-ম্যান্টেল ↑ তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়।

থ্রম্বোসিস্—রোগ বিশেষ। এ-রোগে দেহের কোন কোন অংশের রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এরূপ জমাট-বাঁধা রক্ত কোনক্রমে হৃৎপিণ্ডে গেলে হঠাৎ মৃত্যু ঘটে; মস্তিষ্কে পৌঁছলে দেহের কর্মশক্তি লোপ পায়, অঙ্গ অসাড় হয়ে পড়ে। দেহের রক্ত এভাবে জমাট বেঁধে যাওয়ার অবস্থাকে বলে **থ্রম্বাস**।

নাইটার — সল্ট পিটার ↑; পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3.

নাইট্রিক অ্যাসিড — বর্ণহীন তরল অ্যাসিড, HNO_3; একে **অ্যাকোয়া ফর্টিস**-ও বলা হয়। তীব্র অ্যাসিড গুণসম্পন্ন, প্রায় সব পদার্থ ক্ষয় করে ফেলে। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম (নোবল মেটাল ↑) ব্যতীত সব ধাতু এতে দ্রবীভূত হয়, রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ধাতব নাইট্রেট ↑ উৎপন্ন হয়; বাদামী বর্ণের নাইট্রোজেনডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাস বেরোয়।
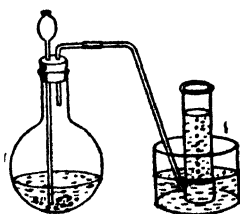
রাসায়নাগারে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত প্রণালী

পটাসিয়াম বা সোডিয়াম নাইট্রেটের (চিলি সল্টপিটার ↑) উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রসায়নাগারে

নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী হয়। আবার উত্তপ্ত প্ল্যাটিনামের ↑ উপর অ্যামোনিয়া ↑ গ্যাস মিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত করে অ্যাসিডটা প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় প্ল্যাটিনাম ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র, অ্যামোনিয়ার (NH_3) সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেন ↑ গ্যাস মিলে নাইট্রিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাইট্রাস অক্সাইড — বর্ণহীন, মিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থ, N_2O ; গ্যাসটা নাকে গেলে হাসির উদ্রেক করে, এজন্যে একে **লাফিং গ্যাস** ↑ বলা হয়। অ্যানেস্থেটিক ↑ শক্তির জন্যে গ্যাসটা দন্ত-চিকিৎসায় অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রিক অক্সাইড — বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ, NO (নাইট্রোজেন মনঅক্সাইড)। অক্সিজেন গ্যাস বা বাতাসের সংস্পর্শে এ-থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বা পারঅক্সাইড, NO_2, নামক বাদামী বর্ণের গ্যাসের সৃষ্টি হয়।

নাইট্রাইট — নাইট্রাস অ্যাসিডের (HNO_2) বিভিন্ন সল্টকে বলা হয় নাইট্রাইট, যেমন—সোডিয়াম নাইট্রাইট, $NaNO_2$, ইথাইল নাইট্রাইট প্রভৃতি। পটাসিয়াম নাইট্রাইট, KNO_2, হৃদ্‌রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রাইড — নাইট্রোজেন-ঘটিত বাইনারী ↑ কম্পাউণ্ড। অত্যধিক উত্তাপে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, বোরন প্রভৃতি ধাতব পদার্থের সঙ্গে নাইট্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন নাইট্রাইড সৃষ্টি হয়।

নাইট্রেট — নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) বিভিন্ন সল্ট ; জৈব বা অজৈব বেসের ↑ সঙ্গে নাইট্রেট আয়নের (NO_3) মিলনে গঠিত হয় ; যেমন—পটাসিয়াম নাইট্রেট, KNO_3, (নাইটার ↑ বা সল্ট-পিটার ↑) সোডিয়াম নাইট্রেট, $NaNO_3$, সেলুলোজ নাইট্রেট ইত্যাদি।

নাইট্রেসন—বিভিন্ন নাইট্রাইট ↑ সল্টের নাইট্রেট সল্টে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া ; যেমন, পটাসিয়াম নাইট্রাইট, KNO_2, নাইট্রেসনের ফলে পটাসিয়াম নাইট্রেটে, KNO_3, পরিবর্তিত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে এই নাইট্রেসন প্রক্রিয়া স্বভাবতঃ সংঘটিত হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন সাইক্ল ↑) উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ মাটিতে পচে বিভিন্ন জীবাণুর সাহায্যে এরূপ

নাইট্রেট-সল্ট সৃষ্টি হয়—জীবাণুদের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়—**নাইট্রিফিকেসন।**

নাইট্রোজেন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন N ; পারমাণবিক ওজন 14·008, পারমাণবিক সংখ্যা 7 ; অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বায়ুমণ্ডলের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগ অধিকার করে রয়েছে। গন্ধহীন, অদৃশ্য ও সাধারণ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় পদার্থ। এর স্বাভাবিক যৌগিক পদার্থ হোল চিলি সল্টপিটার ↑, $NaNO_3$। জীবজগতের পক্ষে নাইট্রোজেন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও নাইট্রোজেন ব্যতীত কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী বাঁচতে পারে না (নাইট্রোজেন সাইক্ল ↑)। খাদ্যের প্রোটিন অংশে নাইট্রোজেনই প্রধান উপাদান। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ জমির উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় (ফার্টিলাইজার ↑)।

নাইট্রোজেন সাইক্ল — প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থায় নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ খাদ্য হিসেবে উদ্ভিদ ও প্রাণিগণের প্রয়োজন মিটিয়ে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অজৈব নাইট্রেটে ↑ পরিণত হয় : উদ্ভিদ তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ওই সব নাইট্রেট টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদ দেহের নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন ↑ পদার্থ আবার প্রাণীরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ মাটিতে পচে মিশে যায়, প্রাণীদের মল-মূত্রও
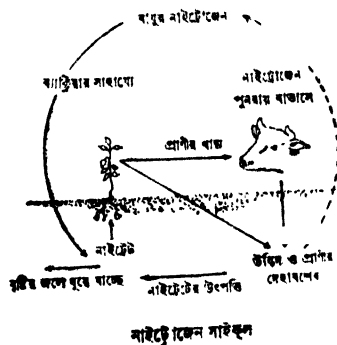
নাইট্রোজেন সাইক্ল

মাটিতে মেশে। এভাবে নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগিক পুনরায় মাটিতে চলে যায়। জীবাণুর প্রভাবে এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, আর কতকাংশ নাইট্রেট আকারে পুনরায় উদ্ভিদ-দেহে চলে যায়। এভাবে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে মাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলাচল করছে। এই ব্যাপারটাকে বলে নাইট্রোজেন-সাইক্ল।

নাইট্রোজেন ফিক্সেসন —

নাইট্রোজেন গ্যাস সংবদ্ধকরণ। জীবজগতের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে নাইট্রোজেন গ্যাসের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সে প্রয়োজন সোজাসুজি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে সিদ্ধ হয় না। এজন্যে গ্যাসটাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংবদ্ধ করে ব্যবহার উপযোগী যৌগিকে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এভাবে তৈরী করা হয় অ্যামোনিয়া (NH_3) ↑, বিভিন্ন নাইট্রেট সল্ট ও নাইট্রোজেন-ঘটিত অন্যান্য যৌগিক, যা জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। আবার মাটির মধ্যে নানারকম জীবাণুর প্রভাবে এ কাজ স্বভাবতঃও সিদ্ধ হয়ে থাকে (নাইট্রোজেন সাইক্‌ল ↑)।

নাইট্রো-চক — ক্যালসিয়াম কার্বনেট ↑ ($CaCO_3$) ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের (NH_4NO_3) সংমিশ্রিত পদার্থ। এই সংমিশ্রণ জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রো-গ্লিসারিন—গ্লিসারিন ↑ ও নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন তৈলাক্ত তরল পদার্থ, $C_3H_5(NO_3)_3$; একে আবার গ্লিসারাইল ট্রাই-নাইট্রেট-ও বলে। ঈষৎ হলদে বর্ণের ভারী পদার্থ। অতি সামান্য আঘাতেই জিনিসটা ভীষণ শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এটা এককভাবে বিস্ফোরক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আবার এর সংমিশ্রণে ডিনামাইট ↑ তৈরী হয়।

নাইট্রো-বেঞ্জিন — হলদে বর্ণের তৈলাক্ত তরল পদার্থ, $C_6H_5NO_2$; বেঞ্জিনের ↑ সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পদার্থটা থেকে পাওয়া যায় অ্যানিলিন ↑; এই অ্যানিলিন থেকে আবার বিভিন্ন রং ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি তৈরী হয়।

নাইট্রো-সেলুলোজ—তুলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ (সেলুলোজ ↑) পদার্থের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ। একে সেলুলোজের নাইট্রিক অ্যাসিড এস্টার-ও ↑ বলা যায়। অবশ্য একে সেলুলোজ নাইট্রেট বলাই সঙ্গত; কিন্তু নাইট্রো-সেলুলোজ কথাটাই বিশেষভাবে প্রচলিত। পদার্থটাকে গান-কটনও ↑ বলা হয়। উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ। বিভিন্ন শ্রেণীর নাইট্রো-সেলুলোজ, সেলুলয়েড ↑ ও কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তৈরীর জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

নাইলন — এক রকম প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থের সূতার ব্যবহারিক নাম। এই সূতা দিয়ে মোজা, জামার

কাপড় প্রভৃতি তৈরী হয়; দেখতে অনেকটা সিল্কের মত বলে একে আর্টিফিসিয়াল সিল্ক ↑ বলা যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হোল অ্যাডিপিক অ্যাসিডের এক রকম পলিমার ↑। এই অ্যাডিপিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ফিনল ↑ থেকে; এই অ্যাসিডের বিশেষ পলিমারিজেসনের ↑ ফলেই এই নাইলন প্ল্যাস্টিকের সৃষ্টি হয়। এই পলিমার পদার্থটাকে উত্তাপে তরল করে যন্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চেপে বার করা হয় ঠাণ্ডায় তা শক্ত হয়ে সুতার আকার ধারণ করে।

নাদির — কোন লোকের ঠিক মাথার উপরে সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে ↑ অবস্থিত সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলে জেনিথ ↑; জেনিথের বিপরীত বিন্দু, অর্থাৎ কোন লোকের বরাবর পায়ের নীচে (পৃথিবীর অপর দিকে) সেলেশ্চিয়াল স্ফিয়ারে অবস্থিত সর্বনিম্ন বিন্দুকে বলে নাদির। জ্যোতির্বিদ্যায় গণনাদিতে নভোমণ্ডলে এরূপ কল্পিত বিন্দুর সাহায্য নেওয়া হয়।

নার্কোটিক — ঘুমের ঔষধ; যে সব পদার্থের প্রভাবে নিদ্রার উদ্রেক করে, দেহে অবসাদ ও আচ্ছন্ন ভাব দেখা দেয়। আফিম ও মর্ফিন জাতীয় অ্যালক্যালয়েড ↑ এবং ভেরোনল, লুমিনল প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ নার্কোটিক ড্রাগ বলে পরিচিত।

ন্যাচার‍্যাল গ্যাস — কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ তৈলখনি অঞ্চলে, ভূগর্ভ থেকে যে সব গ্যাস স্বভাবতঃ নির্গত হয়। নানা রকম গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ↑ ও মৌলিক গ্যাস এর মধ্যে সংমিশ্রিত থাকে।

ন্যাট্রিয়াম — সোডিয়াম ↑ ধাতু; সোডিয়ামের এই ল্যাটিন নাম থেকেই এর সাংকেতিক চিহ্ন Na করা হয়েছে।

ন্যাট্রন — খনিজ পদার্থ বিশেষ; রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা হোল সোডিয়াম সেচ্‌কুইকার্বনেট, $Na_2CO_3 . NaHCO_3 . 2H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ।

ন্যাসেণ্ট গ্যাস — বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে গ্যাস উদ্ভূত হয়; উৎপত্তিকালে এরূপ গ্যাস বিশেষ রাসায়নিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। একে তখন ন্যাসেণ্ট গ্যাস, বা ন্যাসেণ্ট অবস্থার গ্যাস বলা হয়।

ন্যাপ্‌থা—বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণকে সাধারণভাবে ন্যাপ্‌থা বলা হয়। প্যারাফিন অয়েল ↑ ও আলকাতরা (কোল-টার ↑) প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন রকম ন্যাপ্‌থা পাওয়া যায়। ডেষ্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঠ থেকেও

এক রকম ন্যাপ্থা বেরোয়, যাকে বলে উড্-ন্যাপ্থা ↑। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে অবিশুদ্ধ মিথাইল অ্যালকোহল, CH_3OH.

ন্যাপ্থলিন—বিশেষ একটা হাইড্রো-কার্বন, $C_{10}H_8$; সাদা স্ফটিকাকার তীব্র গন্ধবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ। পেট্রোলিয়াম ↑ ও কোল-টার ↑ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। বাজারে ন্যাপথলিনের বল বিক্রি হয়, একে ইংরেজীতে বলে **মথ-বল**। জামা-কাপড়ে ন্যাপথলিন দিয়ে রাখলে এর গন্ধে পোকা-মাকড় আসে না। এ ছাড়া বিভিন্ন রঞ্জক দ্রব্য তৈরী করতেও ন্যাপথলিন দরকার হয়।

নিউক্লিয়াস — কেন্দ্রীয় বস্তু বা কেন্দ্রীন পদার্থ; পরমাণুর কেন্দ্র-স্থলে অবস্থিত ধন-তড়িৎবিশিষ্ট মূল বস্তু কণিকা। এই কেন্দ্রীয় বস্তু ধন-তড়িৎ বিভবের প্রোটন ↑ ও তড়িৎ-বিহীন নিউট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের প্রত্যেকটি কোষের অভ্যন্তরেও এক রকম কেন্দ্রীয় বস্তু, অর্থাৎ কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস রয়েছে।

নিউক্লিয়ার চার্জ—পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু বা নিউক্লিয়াসের প্রোটন ↑ কণিকায় যে ধন-তড়িৎশক্তি নিহিত থাকে। এই তড়িৎবিভবের পরিমাণ ওর চারিদিকের ইলেক্ট্রন ↑ কণিকাগুলোর ঋণ-তড়িৎবিভবের সমষ্টির সমান। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন কণিকার সংখ্যা ওর চারদিকের ইলেক্ট্রন কণিকার সংখ্যার সমান। মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা তার পরমাণুর কেন্দ্রীয় তড়িৎশক্তির একক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স — পদার্থ-বিজ্ঞানের যে শাখায় পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের গঠন ও বিভিন্ন সংগঠক কণিকা (প্রোটন ↑, নিউট্রন ↑ ইত্যাদি) সম্বন্ধীয় তথ্যাদির পরীক্ষা ও আলোচনা করা হয়। এক কথায়, পরমাণুর গঠন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

নিউক্লিয়ার ফিসন — ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ভারী পরমাণুগুলোকে দুই বা ততোধিক নূতন পরমাণুতে ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া। কথাটার মানেই হোল পরমাণু বিভাজন বা ভাঙন। অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে সাধারণতঃ নিউট্রন কণিকার সংঘাতে জটিল কৌশলে এরূপ পরমাণু ভাঙার কাজ নিষ্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রভূত পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব ঘটে (অ্যাটম বম্ ↑)।

নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেসন—কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস বিভাজনের (ফিসন ↑) ফলে তার আভ্যন্তরীণ গঠন বদলে যায়। এর ফলে ওই পদার্থ অপর কোন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এরূপ পরিবর্তনকে বলে নিউক্লিয়ার ট্রান্সম্যুটেসন। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজ-বিকিরণের ফলে স্বভাবতঃই এরূপ ঘটে থাকে (ট্রান্সম্যুটেসন অব এলিমেণ্ট ↑)।

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্সন — যে প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠন বদলে গিয়ে অপর কোন নতুন পদার্থের পরমাণুর উদ্ভব ঘটে, বা ওই পদার্থেরই আইসোটোপ ↑ সৃষ্টি হয়। রেডিওঅ্যাক্টিভ ↑ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে ক্রমাগত তেজ বিকিরণের ফলে স্বভাবতঃই এই প্রক্রিয়া ঘটে থাকে; আবার কৃত্রিম উপায়ে সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, নিউট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকার আঘাতেও পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এরূপ পরিবর্তন ঘটান সম্ভব হয়েছে।

নিউট্রিনো—তড়িৎ-বিহীন প্রাথমিক পদার্থ কণিকা। পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তথ্যের সমাধান করবার জন্যে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু-কণিকার কল্পনা করা হয়েছে। মেসন ↑ কণিকা এরূপ কল্পিত নিউট্রিনো কণিকার সমবায়ে গঠিত বলে মনে করা হয়।

নিউট্রন — পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে অবস্থিত তড়িৎবিহীন কণিকা (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)। ধন-তড়িৎবিশিষ্ট প্রোটন ↑ কণিকা ও তড়িৎবিহীন এই নিউট্রন কণিকার সমবায়ে মৌলিক পদার্থগুলোর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন গঠিত। প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের ভর সামান্য (শত-করা এক ভাগ) মাত্র বেশী। কেবলমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউট্রন কণিকা নেই; আছে মাত্র একটা প্রোটন, যার চারদিকে একটা মাত্র ইলেকট্রন ঘুরছে। ডেভি (ভারী)হাইড্রোজেনের ↑ নিউক্লিয়াসে অবশ্য একটা প্রোটন ও একটা নিউট্রন থাকে। তড়িৎবিহীন হওয়ার ফলে নিউট্রন কণিকাকে বিশেষ ব্যবস্থায় কেন্দ্রচ্যুত করে ফেলা যায়। মূলতঃ এভাবেই নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ সম্ভব হয়; একেই বাংলায় বলা হয় পরমাণু বিভাজন (অ্যাটম বম্ ↑)।

নিউটনস্ ল অব মোসন—বিখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী নিউটন পদার্থের গতি সম্পর্কে যে তিনটি সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন: (1) বহিস্থ কোন শক্তির প্রভাব ব্যতীত নিশ্চল বস্তু বরাবর নিশ্চল থাকবে, চলমান বস্তু

বরাবর একই দিকে একই বেগে চলতে থাকবে। (2) চলমান বস্তুর গতি-বেগের হার প্রযুক্ত শক্তির আনুপাতিক হবে; আর, তার ওই গতি হবে শক্তি যে দিকে প্রযুক্ত হয়েছে সেই দিকে। (3) কোন শক্তি প্রযুক্ত হলেই তার সমপরিমাণ একটা বিপরীত শক্তির উদ্ভব হবে (বন্দুক ছুড়লে সম্মুখগামী শক্তির প্রভাবে গুলিটা বেগে সামনে ছুটে যায়, আর উদ্ভূত বিপরীত শক্তির প্রভাবে বন্দুকটা পেছনে ধাক্কা দেয় (জেট্ প্লেন ↑)।

নিউটনস্ ল অব কুলিং — উত্তপ্ত পদার্থের তাপ নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে নিউটন যে সূত্র প্রবর্তন করেছিলেন: কোন পদার্থ যে-হারে তার তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়, তা ওই উত্তপ্ত পদার্থের সঙ্গে চারদিকের পদার্থের (বায়ুর) তাপ-বৈষম্যের আনুপাতিক হয়ে থাকে। পদার্থটা চারদিকের বায়ু অপেক্ষা 40° বেশী উত্তপ্ত হলে যদি প্রতি মিনিটে তার 10° তাপ কমে, তবে ওই তাপ-বৈষম্য 20° হলে মিনিটে ওর তাপ 5° হারে কমবে। অবশ্য এই তাপ-বৈষম্যের পরিমাণ অত্যধিক হলে অনেক সময় এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখা যায়।

নিকেল—মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ni, পারমাণবিক ওজন 58·69, পারমাণবিক সংখ্যা 28; লোহার মত চৌম্বক-শক্তিসম্পন্ন, সাদা ধাতব পদার্থ। মরিচা ধরে না; এ-জন্যে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় লোহার জিনিসের উপর নিকেলের একটা পাতলা আস্তরণ ধরান হয়। এই প্রক্রিয়াকে নিকেল-প্লেটিং বলে। নিকেল-ষ্টিল, নিক্রোম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন সংকর ধাতু তৈরী করতে দরকার হয়। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিকেল উৎকৃষ্ট ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে। গন্ধক ও আর্সেনিকের ↑ সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় নিকোলাইট প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়।

নিকেল স্টিল — স্টিল (লৌহ ও নিকেলের সংকর ধাতু। এর মধ্যে নিকেলের ভাগ সাধারণতঃ 6% পর্যন্ত থাকে।

নিকেল সিলভার — প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অনুপাতে তামা, দস্তা ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী এক প্রকার সংকর ধাতুর বিশেষ নাম এর মধ্যে সিলভার বা রৌপ্য কিছুমাত্র থাকে না। সাধারণত এতে 60% তামা, 20% নিকেল ও 20% দস্তা (জিঙ্ক ↑) থাকে।

নিকোটিন — জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{14}N_2$; বর্ণহীন, বিষাক্ত

ও তৈলাক্ত বস্তু। সাধারণতঃ তামাকের পাতা থেকে নিষ্কাশিত এক প্রকার অ্যালকালয়েড ↑ পদার্থ; কীটপতঙ্গ-নাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিক্রোম—নিকেল ও ক্রোমিয়ামের ↑ এক রকম সংকর ধাতুর ব্যবহারিক নাম। এর মধ্যে কিছু লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকা ↑ দেওয়া হয়। অত্যধিক উত্তাপেও এর বিশেষ কোনরূপ অবস্থান্তর ঘটে না: এ-জন্যে বৈদ্যুতিক উনানে (হিটার) এর তার ব্যবহৃত হয়।

নিয়ন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Ne, পরমাণবিক ওজন 20·183, পারমাণবিক সংখ্যা 10; বর্ণহীন গন্ধহীন অদৃশ্য গ্যাস, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় (অন্যতম ইনার্ট গ্যাস ↑)। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণে আছে—প্রায় 50,000 ভাগে একভাগ মাত্র। তরলীকৃত বায়ু থেকে ফ্র্যাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করা হয়। ইদানিং যে রঙীন আলোর প্রচলন হয়েছে, যাকে নিয়ন-সাইন বলা হয়, তা এই নিয়ন গ্যাসের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহের ফলেই সম্ভব হয়েছে (নিয়ন ল্যাম্প ↑)।

নিয়ন ল্যাম্প — ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব বা লম্বা টিউব বায়ুশূন্য করে তার মধ্যে সামান্য নিয়ন গ্যাসের ↑ মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থা করে যে আলো তৈরী করা হয়। অল্প চাপের ওই নিয়ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের ফলে উজ্জ্বল গোলাপী লাল আলোক সৃষ্টি হয়। এরূপ নিয়ন-বাতির ফিলামেন্ট ↑ থাকে দুটা পৃথক ধাতব চাকৃতি (বা একটা চাকৃতি ও একটা তারকুণ্ডলী)। তড়িৎ প্রবাহের ফলে নিয়ন গ্যাসের তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো (আয়ন ↑) চাকৃতি দুটার গায়ে পরিবর্তীভাবে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে; এর ফলে এরূপ সুদৃশ্য আলোকের উৎপত্তি ঘটে।

নিয়ন-ল্যাম্প

নেপচুন — সৌর পরিবারের একটি গ্রহ; প্লুটো ও ইউরেনাস ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা নিজস্ব কক্ষ পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে এর প্রায় 164·8 বছর লাগে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 280 কোটি মাইল; আয়তনে পৃথিবীর প্রায় 17 গুণ বড়। পৃথিবীর চাঁদের মত এর একটা মাত্র উপগ্রহ দেখা যায়।

নেপচুনিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক সংখ্যা 93; অন্যতম ট্রান্সইউরেনিক ↑ এলিমেন্ট। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটাও তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

নেস্‌লার সল্যুসন — পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের ↑ জলীয় দ্রব্যের মধ্যে মার্কারি আয়োডাইড ও পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবীভূত করে যে সল্যুসন ↑ তৈরী হয়। রসায়নাগারে অ্যামোনিয়ার অস্তিত্ব পরীক্ষার জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে এর মিলনে বাদামী রং ফুটে ওঠে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার (প্রিসিপিটেট্ ↑) উদ্ভব হয়।

নেবুলা — নভোমণ্ডলের স্থানে স্থানে যে এক রকম মেঘবৎ উজ্জ্বল পদার্থ-কুণ্ডলী দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঘনীভূত গ্যাসীয় পদার্থে এগুলো গঠিত। নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে এ-থেকেই নূতন নূতন তারকারাজি সৃষ্টি হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

নেবুলা

নেবুলাইজার — এক রকম যন্ত্র, যা থেকে কোন তরল পদার্থ মেঘের মত বাষ্পাকারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সুগন্ধি তরল পদার্থ এ দিয়ে অভ্যাগত লোকের গায়ে মাথায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গলক্ষত রোগে ঔষধাদি প্রয়োগের জন্যেও এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
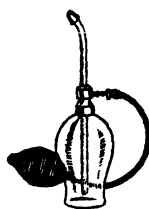
নেবুলাইজার

নোবল মেটাল—সোনা, রূপা ও প্ল্যাটিনাম ধাতু। জলে বাতাসে এ-গুলোয় মরিচা ধরে না, অথবা সাধারণ কোন অ্যাসিডেও দ্রবীভূত হয় না। এজন্যে এগুলোকে সম্ভ্রান্ত ধাতু বা নোব্‌ল মেটাল বলা হয়। অন্যান্য সব ধাতুকে বলে বেজ্‌ মেটাল বা নিকৃষ্ট ধাতু।

নোভা—যে সব নক্ষত্র হঠাৎ তীব্র আলোক ছড়িয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে পরে সহসা আবার নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ওই সব নক্ষত্রের দেহপিণ্ড কোন কারণে সহসা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে; এর ফলে প্রভূত শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সাময়িক এরূপ উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থার পরে নক্ষত্রটাকে আয়তনে ক্ষুদ্রতর ও নিষ্প্রভ দেখা যায়।

প

জিট্রন—ধন-তড়িৎবিশিষ্ট প্রাথমিক কণিকা ; এর ভর ও তড়িৎ-বিভবের বিমাণ ইলেক্ট্রন↑ কণিকার সমান। এই পজিট্রন কণিকা অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় এর স্থিতিকাল লক্ষিত হয়েছে। কস্‌মিক↑ রশ্মির পর্যবেক্ষণের ফলে এর অস্তিত্ব সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। বিভিন্ন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় (রেডিও অ্যাক্টিভ↑) পদার্থ থেকে পজিট্রন কণিকা নির্গত হয়ে থাকে।

টাস — পটাসিয়াম কার্বনেট, K_2CO_3 ; আবার পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডকেও পটাস বলে ; যেমন, কস্টিক পটাস, KOH ; সাধারণভাবে অবশ্য সব পটাসিয়াম সল্টকেই↑ পটাস বলা হয়।

টাসিয়াম—মৌলিক ধাতব পদার্থ। এর ল্যাটিন নাম ক্যালিয়াম থেকে এর সাংকেতিক চিহ্ন K হয়েছে। পারমাণবিক ওজন 39·096, পারমাণবিক সংখ্যা 19 ; সাদা, নরম ও বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন ধাতু ; অনেকাংশে সোডিয়াম ধাতুর অনুরূপ। কার্নেলাইট প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর বিভিন্ন সল্ট জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে, সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জীবজগতের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ—সব রকম জীবের দেহেই অল্পাধিক পটাসিয়াম বর্তমান।

পটাসিয়াম ব্রোমাইড—পটাসিয়াম ও ব্রোমিনের↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে উৎপন্ন সল্ট, KBr ; সাদা ক্ষটিকাকার পদার্থ। একে পটাস ব্রোমাইড-ও বলা হয়। ঔষধ হিসেবে ও ফটোগ্রাফির↑ কাজে পদার্থটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট— পটাসিয়াম ও ক্রোমিক↑ অ্যাসিডের সল্ট, $K_2Cr_2O_7$; একে পটাস বাইক্রোমেট-ও বলা হয়। লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। ক্রোম-আয়রন↑ নামক খনিজ থেকে পটাসিয়ামের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে উৎপন্ন হয়। পদার্থটা বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহ করে (অক্সিডাইজিং এজেন্ট) ; রঞ্জন-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট — সাধারণভাবে বলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$; গাঢ় লাল, স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। এর লাল জলীয় দ্রব রসায়নাগারে অক্সিডাইজিং↑ এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জীবাণুনাশক ও

প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

পলি—বহুসংখ্যক অর্থে কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন—পলিগন, পলিবেসিক ↑, পলিমার ↑ ইত্যাদি।

পলিমারিজেসন — যে প্রক্রিয়ার ফলে কোন পদার্থের একাধিক অণুর রাসায়নিক মিলনের ফলে বৃহত্তর অণুবিশিষ্ট অন্য কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এতে প্রাথমিক পদার্থটার আণবিক ওজন বেড়ে যায়, কিন্তু মূল রাসায়নিক গঠন একই থাকে। অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড (CH_3CHO) পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ার ফলে প্যারাল্ডিহাইডে, (CH_3CHO)$_3$, পরিণত হয়; অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের তিনটা অণু একসঙ্গে মিলে গিয়ে প্যারাল্ডিহাইড অণুর সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পদার্থ অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডকে বলা হয় **মনোমার** এবং প্যারাল্ডিহাইড হোল **পলিমার** পদার্থ। আরও নানা রকমে পলিমারিজেসন হতে পারে। একই হাইড্রোকার্বন ↑ অণু পরস্পর শৃঙ্খলিত হয়েও পলিমার সৃষ্টি হতে পারে; যেমন, ইথিলিন (CH_2. CH_2) পলিমারিজেসনের ফলে স্বাভাবিক রাবারের উপাদান আইসোপ্রিন ↑ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্ল্যাস্টিক জাতীয় পদার্থ, কৃত্রিম সূতা (নাইলন ↑, রেয়ন ↑ প্রভৃতি) বিভিন্ন রকম পলিমার পদার্থে গঠিত, কৃত্রিম উপায়ে তৈরী। আবার অনেক স্বাভাবিক পদার্থেও বিভিন্ন পলিমার আছে। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি পদার্থ নানা রকম জটিল পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ার ফলে গঠিত হয়ে থাকে।

পলিমার— পলিমারিজেসনের ফলে উৎপন্ন পদার্থ (পলিমারিজেসন ↑)

পাউণ্ড—ইংলণ্ডীয় ওজন পরিমাণ 453·592 গ্র্যাম। বায়ুশূন্য স্থানে প্ল্যাটিনামের তৈরী একটি সিলিণ্ডারের ওজনকে এক পাউণ্ড ধরা হয়েছে। এটাকে ইম্পিরিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ড পাউণ্ড বলা হয়, বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। পাউণ্ডে আবার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একক-ও বুঝায়: এক পাউণ্ড ভর-বিশিষ্ট কোন বস্তুকে পৃথিবী যে শক্তিতে (গ্রাভিটেসন ↑) আকর্ষণ করে তাই হোল এক পাউণ্ড ওজন। এভাবে পাউণ্ড এককে বস্তুর ভর (মাস্ ↑) ও ওজন (ওয়েট) উভয়ই প্রকাশ করা হয়।

পাউণ্ড্যাল —ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ডের হিসেবে বল-শক্তির (ফোর্স ↑) একক বিশেষ। যে পরিমাণ শক্তির

প্রভাবে এক পাউণ্ড ভরবিশিষ্ট কোন বস্তুর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট হারে পরিবর্তিত হয়। এক পাউণ্ডাল বল-শক্তি এক পাউণ্ড ↑ (ওজন বা মাধ্যাকর্ষণ) শক্তির প্রায় 32 ভাগের এক ভাগ।

পাই — (1) যে কোন বৃত্তের (সার্কল্ ↑) পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত-বোধক স্থির রাশি। সংক্ষেপে π চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়; $=22/7$ বা 3·14159 ; (2) দেশীয় মুদ্রা বিশেষ, $=1/3$ পয়সা।

পাইরিন — (1) একটা হাইড্রো-কার্বন, $C_{16}H_{10}$; হল্‌দে স্ফটিকাকার পদার্থ। আলকাতরা (কোলটার ↑) থেকে পাওয়া যায়। (2) কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড, CCl_4 ; তরল পদার্থ, অগ্নি নির্বাপনের জন্যে কখন কখন ফায়ার-এক্‌স্টিঙ্গুইসারে ↑ ব্যবহৃত হয়।

পাইরিডিন — কোলটার ↑ থেকে প্রাপ্ত একটা জৈব রাসায়নিক পদার্থ C_5H_5N ; বর্ণহীন দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দুর্গন্ধযুক্ত ও অপেয় করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে পাইরিডিন মিশ্রিত করা হয়।

পাইরাইট্‌স — এক শ্রেণীর ধাতব খনিজ পদার্থের বিশেষ নাম। সাধারণতঃ এ-গুলো বিভিন্ন ধাতুর সালফাইড; যেমন, আয়রন পাইরাইটস, FeS_2 ; কপার পাইরাইটস, $CuFeS_2$ (কপার ও আয়রনের সম্মিলিত সালফাইড) ইত্যাদি।

পাইরো — আগুন বা উত্তাপ অর্থে রাসায়নিক শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন — পাইরোবোরিক অ্যাসিড (বোরিক ↑ অ্যাসিড উত্তপ্ত করে পাওয়া যায়)। উত্তাপের সাহায্যে রাসায়নিক বিয়োজন প্রক্রিয়াকে বলে **পাইরোলিসিস**। পাইরোমিটার ↑, পাইরোফোরিক অ্যালয় ↑ ইত্যাদি।

পাইরোগ্যালল—একে পাইরোগ্যালিক অ্যাসিডও বলে; সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হোল ট্রাই-হাইড্রক্সি-বেঞ্জিন, $C_6H_3(OH)_3$; ফটোগ্রাফির কাজে প্রয়োজন হয়।

পাইরোফোরিক অ্যালয় — যে সব সংকর-ধাতু ঘষলে বা ঠুকলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরোয়। এ-রকম অ্যালয় দিয়েই সিগারেট-লাইটারের ফ্লিন্ট ↑ তৈরী করা হয়। জিনিসটা সিরিয়াম, লোহা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে

এক প্রকার অত্যন্ত কঠিন সংকর ধাতু।

পাইরোলুসাইট—ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর খনিজ পদার্থ; স্বাভাবিক ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, MnO_2; ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার কালো কঠিন পদার্থ। প্রধানতঃ এই খনিজ থেকেই ম্যাঙ্গানিজ ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়।

পাইরোমিটার — অত্যধিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্র বিশেষ। সাধারণ থার্মোমিটারে ↑ উচ্চ তাপমাত্রা মাপা সম্ভব হয় না; কারণ, অধিক তাপে যন্ত্রের কাঁচনল গলে যায়। পাইরোমিটার যন্ত্র উত্তপ্ত পদার্থের মধ্যে দেওয়া হয় না। অত্যুত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত তাপ-রশ্মির প্রভাবে বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের সংযোগস্থলে যে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত হয় (থার্মো-কাপ্‌ল ↑) গ্যালভ্যানোমিটারের ↑ সাহায্যে তা মেপে ওই উৎসের উষ্ণতা নির্ধারণ করা হয়। এজন্যে একে থার্মো-ইলেক্ট্রিক থার্মোমিটারও বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যবস্থায় রেডিয়েসন পাইরো-মিটার, অপ্টিক্যাল পাইরোমিটার প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্র তৈরী হয়েছে।

পামিটিক অ্যাসিড — একটা জৈব অ্যাসিড; চর্বিজাতীয় ফ্যাটি ↑ অ্যাসিড বিশেষ, $C_{15}H_{31}COOH$; মোমের মত নমনীয় কঠিন পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ও চর্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে ট্রাই-পামিটিন নামক যৌগিক পদার্থের আকারে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়।

পার—'অতিরিক্ত' অর্থে রাসায়নিক শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন, পারঅক্সাইড—স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত অক্সিজেন-সম্পন্ন যৌগিক পদার্থ এরূপ পারম্যাঙ্গানেট, পারক্লোরেট ইত্যাদি।

পার্ল — মুক্তা; শুক্তি বা ঝিনুকের দেহ নিঃসৃত রস খোলার মধ্যে জমে কঠিন হয়ে এর সৃষ্টি হয়। সাদা মূল্যবান পদার্থ; কিন্তু রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$, অর্থাৎ এক রকম প্রস্তর মাত্র।

পার্ল অ্যাস —পটাসিয়াম কার্বনেট, K_2CO_3; কাঠের ছাই থেকে এই পটাস সল্টটা পাওয়া যায়।

পার্ল স্পার — একটা খনিজ পদার্থের বিশেষ নাম; ম্যাগ্নেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের স্বভাবজাত যুক্ত কার্বনেট, $MgCO_3 . CaCO_3$; একে আবার ডলোমাইটও ↑ বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ কঠিন প্রস্তর এ দিয়ে গঠিত।

পাওয়ার অ্যালকোহল—অবিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ↑, যা কল-

কারখানার ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাওয়ার, অর্থাৎ শক্তি উৎপাদন করে বলে এই নাম।

পারম্যাঙ্গানেট — পারম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের ($HMnO_4$)* বিভিন্ন সল্ট ↑ ; যেমন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $KMnO_4$, সোডিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, $NaMnO_4$; উৎকৃষ্ট জীবাণুনাশক ও বীজবারক পদার্থ। রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহ করে (অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ↑)। পারম্যাঙ্গানেট বললে সাধারণতঃ পটাস পারম্যাঙ্গানেটই ($KMnO_4$) বুঝায়।

পার্ম অ্যালয় — লোহা ও নিকেল ঘটিত এক শ্রেণীর সংকর ধাতু; এ-গুলো উচ্চ চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশ এ দিয়ে তৈরী হয়। এরূপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পরিবর্তী (অল্টারনেটিং ↑) তড়িৎ-প্রবাহের চুম্বকীয় শক্তির অপচয় কম হয়।

পারফেক্ট গ্যাস —বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন, উষ্ণতা ও চাপের পারস্পরিক সম্বন্ধ কতকগুলো নিয়মে বাঁধা (চার্লস ল, বয়েলস্ ল ↑)। কিন্তু এ সব নিয়ম কোন গ্যাসের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে খাটে না। যে সব গ্যাস এই সকল গ্যাসীয় সূত্র বা নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে বলে মনে করা হয়, তাদের বলা হয় পারফেক্ট বা **আইডিয়াল গ্যাস**। অবশ্য এ হিসেবে সর্বাংশে পারফেক্ট গ্যাস পাওয়া যায় না, কল্পনা করা হয় মাত্র।

পিক্রিক অ্যাসিড—চক্‌চকে হলদে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, $C_6H_2(NO_2)_3OH$; রাসায়নিক গঠনের হিসেবে একে ট্রাইনাইট্রো-ফিনল ↑ বলা যেতে পারে। বিষাক্ত ও বিস্ফোরক পদার্থ। এর জলীয় দ্রব পোড়া-ঘায়ে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জক পদার্থে ও বিস্ফোরক হিসেবে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

পিগ্ আয়রন — অবিশুদ্ধ লোহ ; লোহার বিভিন্ন খনিজ-পদার্থ থেকে ব্ল্যাস্ট ফার্নেস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোহা দিয়েই রেলিং, কড়া প্রভৃতি ঢালাইয়ের কাজ করা হয় ; এজন্যে একে ঢালাই-লোহা বা কাস্ট আয়রনও বলে।

পিগ্‌মেণ্ট — যে সব রঙীন পদার্থ তেল বা কোন আঠালো পদার্থে মিশিয়ে জিনিসের উপরিভাগে আস্তরণের মত রং করা হয়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ (ডাই ↑) ও পিগ্‌মেণ্টের ↑ মধ্যে পার্থক্য এই যে, রঞ্জক পদার্থ সাধারণতঃ জলে দ্রবণীয় ; আর সেই দ্রব

জিনিসের তন্তু বা আঁশের মধ্যে ঢুকে যায়। কিন্তু পিগ্‌মেন্ট জলে দ্রবণীয় নয়, এর সূক্ষ্ম কণিকাগুলো জিনিসের উপরিভাগে লেগে থাকে মাত্র, প্রয়োজন হলে ঘসে উঠিয়ে ফেলা যায়।

পিথাগোরাস থিওরেম—জ্যামিতিক উপপাদ্য বিশেষ; একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান।

পিচব্লেণ্ড — প্রধানতঃ ইউরেনিয়াম ↑ অক্সাইডের (U_3O_8) একটা খনিজ পদার্থ। এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ রেডিয়ামও ↑ থাকে। এই পিচব্লেণ্ড থেকেই মাদাম কুরী রেডিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কার করেন। পূর্ব আফ্রিকা, বোহিমিয়া প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

পিরিয়ডিক টেবল — মৌলিক পদার্থগুলোর পারমাণবিক সংখ্যার হিসেবে তৈরী একটা পর্যায়ক্রমিক তালিকা। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গুণ ও ধর্মের যে পৌনঃপৌনিক পর্যায়-ক্রম লক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ একটা সুসম্বদ্ধ সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন, যা **পিরিয়ডিক ল** নামে পরিচিত। এই সূত্রানুসারে তিনি মৌলিক পদার্থগুলোকে গুণ ও ধর্মের পর্যায়-ক্রমে সাজিয়ে এই পিরিয়ডিক টেবল তৈরী করে গেছেন। একে 'মেণ্ডেলিফস্‌ পিরিয়ডিক টেবল' বলা হয়। এতে সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থগুলো তাদের গুণ ও ধর্মানুসারে এবং পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যবধানে ও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত রয়েছে। এই ছকে কোন মৌলিক পদার্থের স্থান দেখে তার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যাদি প্রায় সুনির্দিষ্টভাবে অনুমান করা যায়। মেণ্ডেলিফ তাঁর এই পিরিয়ডিক টেবলে তৎকালীন অনাবিষ্কৃত পদার্থের শূন্য স্থান থেকে অনেক মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব ও তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর সেই সম্ভাবনা অনুযায়ী পরে অনেক নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে।

পেট্রল — খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ শোধন করে যে হাল্‌কা দাহ্য তৈল পাওয়া যায়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হেক্সেন, হেপ্টেন, অক্টেন ↑ প্রভৃতি নানারকম হাইড্রোকার্বনের জটিল সংমিশ্রণ মাত্র। এ-গুলো ছাড়া আরও অনেক জৈব দাহ্য পদার্থ এর মধ্যে মিশ্রিত থাকে। একে **গ্যাসোলিন**-ও বলা হয়। উৎকৃষ্ট হাল্কা জ্বালানী

তৈল হিসেবে বর্তমান যুগে এর মূল্য সর্বাধিক। মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির ইন্টার্ন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিন ↑ এই পেট্রলে চলে।

পেট্রোলিয়াম — বিভিন্ন স্বাভাবিক হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণ। এর মধ্যে নানারকম জৈব রাসায়নিক পদার্থও থাকে। ভূগর্ভে সঞ্চিত এই অবিশুদ্ধ তরল দাহ্য পদার্থ পাম্প করে তোলা হয়। বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ামের রাসায়নিক গঠন বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে ; আমেরিকার পেট্রোলিয়ামে প্যারাফিনের ↑ ভাগ বেশী, আবার রাশিয়ার পেট্রোলিয়ামে বেঞ্জিন ↑ প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের আধিক্য দেখা যায়। ফ্রাক্‌সন্তাল ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অবিশুদ্ধ খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রল, প্যারাফিন অয়েল ↑, ভেসে-লিন বা **পেট্রোলিয়াম জেলি,** প্যারাফিন ওয়াক্স প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পেট্রোলেটাম — একে পেট্রো-লিয়াম জেলি বা ভেসেলিন-ও বলা হয়। অবিশুদ্ধ খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করবার সময়ে ফ্রাক্‌সন্তাল ডিস্টিলেসন প্রক্রিয়ায় এই নরম পদার্থটা পাওয়া যায়। জিনিসটা বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণে গঠিত ; সাদা বা হলদে বর্ণের নরম (অর্ধ কঠিন) পদার্থ।

পেট্রোলিয়াম ইথার — খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর হাল্কা ও তরল হাইড্রো-কার্বনগুলোর যে সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে পেন্টেন ↑ ও হেক্সেন ↑ নামক দু'রকম হাইড্রোকার্বন।

পেন্সিল লেড — পেন্সিলের সিস্ গ্র্যাফাইটে ↑ তৈরী। যদিও একে লেড পেন্সিল বলে, কিন্তু এতে লেড ↑ বা সীসা কিছুমাত্র থাকে না। গ্র্যাফাইটের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে কাদামাটি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরণের শক্ত বা নরম পেন্সিল তৈরী করা হয়।

পেণ্ডুলাম — দোলক যন্ত্র। কোন ভারী ধাতব খণ্ড সূতা বা তারে ঝুলিয়ে দোলক তৈরী করা হয়। দুলিয়ে দিলে ওই ধাতব খণ্ড এদিক ওদিক দুলতে থাকে। এরূপ দোল খাওয়ার সময়ে সূতা বা তারের স্থির

পেণ্ডুলাম

প্রান্তে যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন হয়, আর ওই সূতা

বা তারের ওজন যদি অতি সামান্ত হয়, তাহলে একটা পূর্ণ দোল খেতে ওই পেণ্ডুলামের যে সময় লাগে তা এই সূত্রানুসারে নির্দিষ্ট হয়: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ এখানে T হোল সময়, l সুতার বা তারের দৈর্ঘ্য, g মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (অ্যাক্সিলারেসন ডিউ টু গ্র্যাভিটি), গাণিতিক সংকেত-চিহ্ন π (পাই ↑) $= 22/7$; পেণ্ডুলামের এই দোলন-কাল এরূপ নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট থাকে বলে ঘড়িতে উহা ব্যবহৃত হয়।

পেনিসিলিন — পেনিসিলিয়াম নোটেটাম্ নামক এক প্রকার ছত্রাক (ফাঙ্গাস ↑) থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-বায়োটিক ↑ ঔষধ; এর প্রয়োগে জীবদেহে বিশিষ্ট কতকগুলো রোগ-জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে রোগ প্রশমিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেক-জাণ্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন।

পেনি ওয়েট — ট্রয় ওজনের ↑ একটা পরিমাণ, = 24 গ্রেণ। এক ট্রয়-আউন্স ওজনের কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

পেণ্টা—পাঁচ সংখ্যক বা পাঁচ গুণ বুঝাতে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যেমন—পেণ্টাগন, পেণ্টেন ↑, পেণ্টঅক্সাইড ইত্যাদি।

পেণ্টেন—প্যারাফিন শ্রেণীর একটা তরল হাইড্রোকার্বন, C_5H_{12}; এর তিন রকম আইসোমার ↑ আছে। খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে পাওয়া যায়।

পেপ্‌সিন — পাকস্থলীর জারক রসে উৎপন্ন এক রকম এন্‌জাইম ↑ পদার্থ। খাদ্যের প্রোটিন ↑ অংশ এর সাহায্যে পেপ্টোন নামক জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই পেপ্টোন দেহের মাংসপেশি গঠন করে। পাকস্থলীর অম্লরসের মাধ্যমে বিশেষ জটিল প্রক্রিয়ায় এই সব রূপান্তরের কাজ চলে।

পেরিস্কোপ — যে যন্ত্রের সাহায্যে সম্মুখস্থ দেয়াল বা অপর কোন বাধার অপর দিকের অদৃশ্য বস্তু যন্ত্র মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। চিত্রে সাধারণ এক রকম পেরিস্কোপ দেখান হয়েছে,—একটা টিনের বা কাঠের চোঙের মধ্যে উপর নীচে দু'খানা আয়না এমনভাবে লাগা হয় যে, উচু করে ধরলে বা ধা
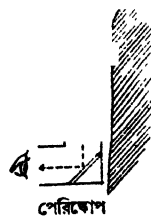
পেরিস্কোপ

অপর দিকের অদৃশ্য বস্তু থেকে আগ আলোকরশ্মি উপরদিকের আয়না

প্রতিফলিত হয়ে চোঙের নীচের দিকে গিয়ে নীচের আয়নায় পুনরায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মি সমকোণে বেরিয়ে এসে নীচের ছিদ্রপথে দর্শকের চোখে পড়ে; এভাবে বস্তুটার প্রতিবিম্ব তার চোখে ফুটে ওঠে। আয়নার বদলে ত্রিকোণ-কাঁচও (প্রিজ্‌ম ↑) বসান যায়। জলের নীচে সাবমেরিন জাহাজ থেকে উপরের দৃশ্যাবলী দেখতে এরূপ পেরিস্কোপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ রকম পেরিস্কোপে আবার দূরবীক্ষণ (টেলিস্কোপ ↑) যন্ত্রও ব্যবহার করা যায়, যাতে জলের উপরের অনেক দূরবর্তী বস্তুও যন্ত্রের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি — বিশেষ অবস্থিতি বা সংস্থানের ফলে পদার্থে যে শক্তি সঞ্জাত হয়। কোন উচ্চ স্থানে সঞ্চিত জল পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি, বা স্থৈতিক শক্তি লাভ করে। ওই জল নীচে প্রবাহিত করলে ওর পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি আবার কাইনেটিক এনার্জি বা গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জলের এরূপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ↑ হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক জেনারেটর ↑ প্রভৃতি চালান হয়। আবার, একটা জড়ানো তারের স্প্রিং-এ ঐরূপ অবস্থিতির ফলে পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি জন্মায়; টেনে সোজা করতে গেলে জোর লাগে—ছেড়ে দিলে সবেগে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অস্বাভাবিক অবস্থা বা সংস্থান থেকে কোন পদার্থকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনলে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, তা থেকে পোটেন্সিয়্যাল এনার্জির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিক স্থানে বা অবস্থায় পদার্থের কোন পোটেন্সিয়্যাল এনার্জি থাকে না।

পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স — তড়িতাবিষ্ট দুই স্থানের মধ্যে তড়িৎ-চাপের (ভোল্টেজ ↑) বৈষম্য। ওই দুই স্থান যদি কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের (কণ্ডাক্টর ↑, যেমন—তামার তার) দ্বারা যুক্ত করা যায়, তাহলে তার মাধ্যমে তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হয়। এই তড়িৎ-স্রোত উচ্চ চাপবিশিষ্ট স্থান থেকে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। তড়িৎ-চাপের এই বৈষম্য (পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স) না থাকলে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটবে না। এই বৈষম্য (P.D.) ভোল্ট ↑ এককে মাপা হয়।

পোল — (1) ম্যাগ্নেটিক পোল বা চৌম্বক প্রান্ত। কোন চুম্বক খণ্ডের দুই প্রান্তীয় অংশে চুম্বকীয় শক্তি

প্রবল থাকে, লোহার টুকরা ওই দুই স্থানে অধিক আকৃষ্ট হয়। এর এক প্রান্তকে বলে নর্থ পোল, বা উত্তর প্রান্ত, অপর প্রান্তকে বলে সাউথ পোল, বা দক্ষিণ প্রান্ত। চৌম্বক শক্তি উত্তর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে রেখার আকারে (ম্যাগ্নেটিক লাইনস্ অব ফোর্স) দক্ষিণ প্রান্তে
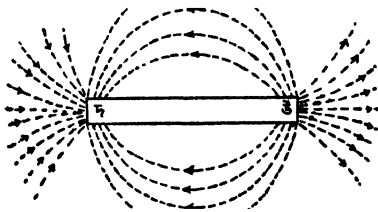
ম্যাগ্নেটিক লাইনস্ অব ফোর্স

পৌঁছায়। চুম্বকখণ্ডটা সুতায় ঝুলিয়ে দিলে, বা সহজে ঘুরতে পারে এমন-ভাবে রাখলে ওর উত্তর প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে ও দক্ষিণ প্রান্ত সর্বদা মোটামুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। চুম্বকের এই ধর্মের উপর ভিত্তি করেই কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তৈরী হয়েছে। কোন চুম্বকের (ম্যাগ্‌নেট ↑) চুম্বকীয় আকর্ষণ-শক্তি **ম্যাগ্নেটিক পোল স্ট্রেংথ** এককে প্রকাশ করা হয়। (2) পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে নর্থ পোল ও সাউথ পোল বলে ; যাকে বলা হয় টেরেস্ট্রিয়্যাল পোল। (3) পোল আবার দৈর্ঘ্যেরও একক ইংলণ্ডীয় মাপ ; =5½ গজ।

পোলারিজেসন— (1) ইলেক্ট্রিক সেলে ↑ ও ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রোডের ↑ গায়ে গ্যাসীয় পদার্থ জমে গিয়ে তড়িৎ-উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে বাধার সৃষ্টি হয় (ডিপোলারাইজার ↑)। (2) তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের আলোকের উদ্ভব হয়। এই আলোক-তরঙ্গ আলোকরশ্মির গতিপথের লম্বভাবে (ট্রান্সভার্স ↑), অর্থাৎ উপর নীচে সঞ্চালিত হয়। সাধারণ আলোকরশ্মি এরূপ তরঙ্গের অসংখ্য বিভিন্নমুখী ধারা-প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষ কৌশলে এ-সব বিভিন্নমুখী তরঙ্গ থেকে একমুখী তরঙ্গ পৃথক করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে বলে পোলারিজেসন অব লাইট। নিকল প্রিজ্‌ম ↑ , পোলারয়েড ↑ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি পরিচালিত করলে একমুখী তরঙ্গবিশিষ্ট আলোক বা পোলারাইজড্ লাইট পাওয়া যায়।

পোলারয়েড — আলোক-র পোলারাইজড্ (পোলারিজেসন করবার জন্যে ব্যবহৃত এক রক পাতলা স্বচ্ছ ফিল্মের ↑ ব্যবহারিক নাম। সেলুলোজ নাইট্রেটে

(নাইট্রোসেলুলোজ ↑) তৈরী এই ফিল্মের উপর কুইনিন ও আয়োডিনের ↑ একটা যৌগিক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম (আলট্রা-মাইক্রোস্কোপিক ↑) চূর্ণ মাখিয়ে পোলারয়েড তৈরী হয়। এতে আলোক-রশ্মি পোলারাইজড হয়, অর্থাৎ বিশেষ একমুখী তরঙ্গগুলোই ওটা ভেদ করে যেতে পারে; অন্যান্য তরঙ্গ আটকে বাদ পড়ে যায়।

পোলারিমিটার—যে যন্ত্রের সাহায্যে পোলারাইজড্ ↑ আলোক-তরঙ্গের স্পন্দনগুলোর গতিপথ পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সাধারণ আলোক-তরঙ্গ গতিপথের লম্বভাবে স্পন্দিত হয়; এই সব তরঙ্গ-স্পন্দন যতটা ঘুরিয়ে বা বেঁকিয়ে পোলারিজেসন ↑ ঘটান হয়, তা এই পোলারিমিটার যন্ত্রে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

পোলারিস্কোপ — যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোকরশ্মির বিভিন্নমুখী তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে বিশেষ একমুখী তরঙ্গ (পোলারাইজড্ লাইট-ওয়েভ) পৃথক করা যায়। নিকল প্রিজম ↑ বা পোলারয়েড ↑ ব্যবহার করে এই যন্ত্র তৈরী হয়ে থাকে। আবার অতি সূক্ষ্ম লম্বা ছিদ্রপথে আলোক-রশ্মি পরিচালিত করে অনুরূপ অপর ছিদ্রপথে বার করেও আলোকতরঙ্গের পোলারিজেসন ঘটান সম্ভব হয়।

প্যাংক্রোমেটিক ফিল্ম — ফটোগ্রাফির সাধারণ ফিল্মে লাল বর্ণ (আলোক-রশ্মি) ধরা পড়ে না, কিন্তু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে প্যাংক্রোমেটিক ফিল্মে লাল বর্ণ সমেত সকল বর্ণের তারতম্যই যথাযথভাবে সাদাকালোতে প্রতিবিম্বিত হয়। এর ফলে অর্থোক্রোমেটিক ↑ ফিল্মের চেয়েও এতে বিভিন্ন বর্ণানুপাতিক ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট স্পষ্টতর আলোকচিত্র পাওয়া যায়।

প্যালাডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Pd. পারমাণবিক ওজন 106·7, পারমাণবিক সংখ্যা 46; রূপোর মত সাদা ধাতু। প্ল্যাটিনামের প্রায় অনুরূপ। খনিজ পদার্থে প্ল্যাটিনামের সঙ্গেই মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে এবং সংকর ধাতু তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়।

প্যারাফিন — মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বুটেন, পেন্টেন প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের সাধারণ নাম। এই শ্রেণীর সব হাইড্রোকার্বনকেই প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন ↑ বলে। এ-গুলো গ্যাসীয়, তরল বা কঠিন সব অবস্থারই আছে; এদের যে-গুলোতে কার্বনের ভাগ কম সে-গুলো গ্যাসীয়, (যেমন মিথেন ↑, ইথেন ↑ প্রভৃতি);

কার্বনের ভাগ বেড়ে হয় তরল প্যারাফিন, (যেমন পেণ্টেন, হেক্সেন প্রভৃতি) ; আবার কার্বনের ভাগ যে-গুলোতে আরও বেশী সে-গুলো কঠিন প্যারাফিন (ওয়াক্স). যা দিয়ে মোমবাতি, বিভিন্ন মলম, পালিশ প্রভৃতি তৈরী হয়।

প্যারাফিন অয়েল—বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ ; খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। সাধারণ জ্বালানি তেল বা কেরোসিন, মোবিল অয়েল, পেট্রল প্রভৃতি হোল বিভিন্ন শ্রেণীর প্যারাফিন অয়েল। এর কোন কোনটা দিয়ে বাতি জ্বালান হয় ; কোনগুলো আবার ইঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্যারাফর্ম—প্যারাফর্ম্যাল্ডিহাইড ; কঠিন পদার্থ, ফর্ম্যাল্ডিহাইডের পলিমার ↑ পদার্থ। জিনিসটা উত্তপ্ত করলে সহজেই ফর্ম্যাল্ডিহাইডে ↑ পরিণত হয়। প্রচুর ধূম-উৎপাদক পদার্থ।

প্যারাল্ডিহাইড — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের পলিম্যারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ, $(CH_3CHO)_3$; অনুভূতিশূন্য ও তন্দ্রাচ্ছন্ন করবার জন্যে এই তরল পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্যারাল্যাক্স — কোন দূরবর্তী বস্তু বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ্য করলে তার অবস্থান তুলনামূলকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় বলে ভ্রম হয়। এভাবে দর্শকের গতি বা স্থান পরিবর্তনের ফলে দৃষ্ট পদার্থেরও অবস্থান বদলে যায় বলে দূর থেকে মনে হয়। এই দৃষ্টি-ভ্রমকেই বলে প্যারাল্যাক্স পৃথিবীর দৈনিক গতি-জনিত প্যারাল্যাক্সের ফলে দূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রের

প্যারাল্যাক্স

দৃষ্ট অবস্থান ও প্রকৃত অবস্থান এক থাকে না---যেখানে দেখছি, সেখানে ওটা প্রকৃতপক্ষে নেই। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলেও আর এক রকম প্যারাল্যাক্স হয়। গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণের গাণিতিক হিসাবে এরূপ প্যারাল্যাক্স-জনিত ভ্রম সংশোধন করে নেওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে (অ্যাবারেসন ↑)।

প্যারিস গ্রিন — রাসায়নিক পদার্থ কপার আর্সেনাইট ও কপার অ্যাসিটেটের মিলিত যৌগিক সংকর $Cu(CH_3COO)_2.\ 3Cu(AsO_2)_2$ একে সুইন্‌ফার্ট গ্রিন-ও বলে কীটপতঙ্গ-নাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্যাস্‌ক্যাল্‌স ল — জলের (বা যে কোন তরল পদার্থের) চাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী প্যাস্‌ক্যালের প্রবর্তিত সূত্র। কোন পাত্রস্থ তরল পদার্থের কোন অংশে চাপ দিলে সেই চাপ সমভাবে সব দিকে পরিবাহিত হয়। এক জায়গায় চাপ দিলে অন্য সব জায়গায় সেই চাপ সমভাবে পৌঁছায় ;
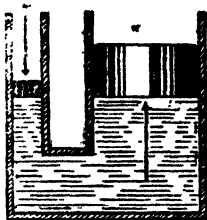
প্যাস্‌ক্যালস ল-এর পরীক্ষা

এর ফলে এক বর্গ ইঞ্চিতে 2 পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করলে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 2 পাউণ্ড হিসেবে 100 বর্গ ইঞ্চিতে মোট 200 পাউণ্ড চাপ পড়বে। এই নিয়মের ব্যবহারিক প্রয়োগে হাইড্রলিক প্রেস ↑ তৈরী হয়েছে।

প্যাস্টুরিজেসন — কোন তরল পদার্থ (বিশেষতঃ দুধ) উপযুক্ত উত্তাপে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তার ভিতরের জীবাণু ধ্বংস করে ফেলার প্রক্রিয়া। দুধ সাধারণতঃ 65° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে 30 মিনিট কাল ফুটালে তা দূষিত জীবাণুমুক্ত, অর্থাৎ প্যাস্টুরাইজড্ হয়ে থাকে।

প্যাসিভ আয়রন — যে লোহার উপরিভাগে আয়রন অক্সাইডের ↑ (মরিচার) একটা পাতলা আবরণ ধরিয়ে তাকে বিভিন্ন অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রভাব থেকে রক্ষা করা হয়। তীব্র নাইট্রিক ↑ অ্যাসিডে অল্পক্ষণ ডুবিয়ে, বা কোন অক্সিডাইজিং ↑ পদার্থের সাহায্যে এরূপ অক্সাইডের আবরণ দিয়ে লোহাকে প্যাসিভ করা যায়। ক্রোমিয়াম, নিকেল, টিন প্রভৃতি ধাতুও এভাবে প্যাসিভ্ করা যেতে পারে। এদের সকলকে বলে প্যাসিভ মেটাল। কোন অ্যাসিডের সঙ্গে সহজে এদের রাসায়নিক সংযোগ হয় না।

প্রিজ্‌ম — ত্রিকোণ কাঁচ-খণ্ড, যার ধারগুলো সমান ত্রিকোণাকৃতি। আবার ছয় কোণ-বিশিষ্ট প্রিজ্‌মও হয়। কাঁচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে তৈরী এরূপ প্রিজ্‌ম আলোক সম্পর্কীয় নানা রকম পরীক্ষায় ও যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। কোয়ার্জের ↑ প্রিজ্‌ম দিয়ে অদৃশ্য অতি-বেগুনী (আলট্রা-ভায়োলেট ↑) রশ্মির পরীক্ষা সম্ভব হয়ে থাকে।
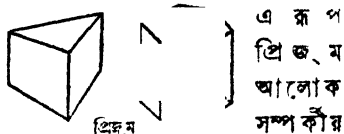
প্রিজ্‌ম

প্রণ্টোসিল — একটা সালফোনেমাইড ↑ জাতীয় ঔষধের ব্যবহারিক নাম। ক্রাইসোডিন নামক একটা

অ্যাজো ↑ রং থেকে উৎপন্ন রাসায়নিক পদার্থ, SO_2NH_2; সাল্‌ফা ড্রাগগুলোর ↑ মধ্যে সর্বপ্রথম এই প্রন্টোসিল ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে। জীবের দেহাভ্যন্তরে এর রোগ-জীবাণু ধ্বংসের শক্তি বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু দেহের বাইরে জীবাণুদের উপর এর কোন শক্তি দেখা যায় না।

প্রাইমারি কয়েল — ইণ্ডাক্সন কয়েল ↑, ট্রান্সফর্মার ↑ প্রভৃতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যে তার-কুণ্ডলীর মধ্যে বাইরে থেকে তড়িৎ-প্রবাহ দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী এই তার-কুণ্ডলীর বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ইণ্ডাক্সনের ↑ ফলে বহিস্থ দ্বিতীয় তার-কুণ্ডলীর (সেকেণ্ডারি কয়েল ↑) মধ্যেও তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হয়।

প্রাইমারি সেল — বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র। সাধারণ ভোল্টেইক সেল; যেমন — ডেনিয়েল সেল, লেক্‌ল্যান্স সেল ↑ প্রভৃতি। বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সেলের মধ্যে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তড়িৎ-পরিবাহী তারের মাধ্যমে এর থেকে তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। স্টোরেজ ব্যাটারি, বা অ্যাকুমুলেরটকে ↑ বলে সেকেণ্ডারি সেল।

প্রাইমারি কালার — প্রাথমিক তিনটি রং—লাল, হল্‌দে ও নীল এই তিনটা রং উপযুক্ত অনুপাতে মিশিয়ে অন্যান্য বিভিন্ন রং তৈরী করা যায়। আবার সিনেমা ফিল্মে ↑ ও ফটোগ্রাফিতে লাল, সবুজ ও নীলাভ-বেগুনী রং তিনটি প্রাথমিক রং হিসেবে কাজ করে। এই তিন বর্ণের আলোক-রশ্মির যথাযথ সংমিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের ছবি ফিল্মে প্রকাশ পায়।

প্রিজ্‌মেটিক কম্পাস — ভূমি জরিপের কাজে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র। গোলাকার যন্ত্রের সঙ্গে এক খানা প্রিজ্‌ম ↑ এমনভাবে সংলগ্ন থাকে, যাতে দূরবর্তী জিনিসের কৌণিক ব্যবধান যন্ত্রের ডিগ্রি-চিহ্নিত গোলাকার স্কেলে (থিয়োডোলাইট ↑) সঙ্গে সঙ্গে লক্ষিত হয়। ওই গোলাকার কম্পাসযন্ত্রে 1° থেকে 360° ডিগ্রি-চিহ্নিত স্কেলের দাগ কাটা থাকে।

প্রোডিউসার গ্যাস — অত্যুত্তপ্ত কয়লার (কোক ↑) মধ্যে বায়ু ও সামান্য জলীয় বাষ্পের প্রবাহ চালালে একটা গ্যাসীয় সংমিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে প্রায় 25% কার্বন মনঅক্সাইড (CO), 5%

কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), 12 হাইড্রোজেন (H) ও প্রায় 58 নাইট্রোজেন (N) থাকে। এই গ্যাসীয় সংমিশ্রণ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় (কোল গ্যাস ↑, ওয়াটার গ্যাস ↑)।

প্রুফ স্পিরিট — ইথাইল অ্যালকোহলের ↑ জলীয় দ্রব, যার মধ্যে মোটামুটি মাত্র 50% অ্যালকোহলের ভাগ থাকে। এই সর্বনিম্ন পরিমাণের অ্যালকোহল দ্রব অগ্নি সংযোগে জ্বলে ওঠে। পূর্বে গানপাউডারে ↑ বিস্ফোরণ ঘটাতে ব্যবহৃত হোত; সামান্য প্রুফ স্পিরিট রেখে জ্বেলে দিলে তার উত্তাপে নিকটস্থ গান পাউডার ↑ জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়।

প্রুসিয়ান ব্লু — গাঢ় নীলবর্ণের একটা রাসায়নিক পদার্থ। এর রাসায়নিক নাম পটাসিয়াম ফেরিক ফেরো-সায়েনাইড, KFe [$Fe(CN)_6$]; পটাসিয়াম ফেরোসায়েনাইডের সঙ্গে কোন ফেরিক ↑ সল্টের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। জিনিসটা রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রোটারগল — রৌপ্য ও প্রোটিন-ঘটিত একটি রাসায়নিক পদার্থের (সিলভার প্রোটিনেট্) ব্যবহারিক নাম। এর মধ্যে সিলভার ও প্রোটিনের অতি সূক্ষ্ম কণিকা থাকে; জলে দিলে একটা কোলয়ড্যাল ↑ সল্যুসন পাওয়া যায়। জীবাণু প্রতিরোধক ঔষধ হিসেবে চোখ ও মূত্র-নালীর ক্ষতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রোটন — মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ধন-তড়িৎবিশিষ্ট কণিকা। এর ভর (মাস ↑) ইলেক্ট্রন কণিকার চেয়ে প্রায় 1840 গুণ অধিক। প্রোটনের তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ ইলেক্ট্রনের ↑ তড়িৎ-শক্তির সমান, কিন্তু বিপরীত-ধর্মী (অ্যাটমিক স্ট্রাক্চার ↑)।

প্রোটিন — জীবের দেহকোষ প্রধানতঃ যে রাসায়নিক পদার্থে গঠিত। জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। প্রোটিন আবার নানা রকম আছে, কিন্তু সব প্রোটিনেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে; এ ছাড়া কখন কখন থাকে সালফার (গন্ধক) ও ফসফরাস ↑ । বিভিন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিডের বহু জটিল প্রক্রিয়ায় জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রোটিনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। দেহের পুষ্টি ও গঠনের জন্যে খাদ্যাদিতে প্রোটিনের ভাগ থাকা দরকার। মাছ, মাংস, ডিম,

মাখন, পনীর প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য প্রোটিন-বহুল।

প্রোটোজোয়া — এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু। জীব-জগতের ক্ষুদ্রতম এক বিশেষ শ্রেণীর জীবাণুর সাধারণ নাম। অ্যামিবা ↑, প্যারামোসিয়াম, ম্যালেরিয়া-প্যারাসাইট্ প্রভৃতি বিভিন্ন জীবাণু এরূপ এককোষী প্রোটোজোয়া শ্রেণীর।

প্রোটোপ্লাজ্ম—জেলির ↑ মত যে পদার্থে জীবকোষ গঠিত। প্রোটিন জাতীয় অতি জটিল গঠনের এক রকম কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থ; জীবন্ত কোষ মাত্রই এ-দিয়ে গঠিত।

প্ল্যাটিনাম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Pt, পারমাণবিক ওজন 195·23, পারমাণবিক সংখ্যা 78; রৌপ্যের মত সাদা কঠিন ধাতব পদার্থ, অত্যন্ত ভারী। কোন অ্যাসিডে গলে না (নোবল মেটাল ↑), অত্যধিক তাপসহ। ধাতব পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান। অস্মিয়াম ↑, ইরিডিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় কোন কোন খনিজ পদার্থে পাওয়া যায়। ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়। মূল্যবান ধাতু হিসেবে অলঙ্কারাদিতেও এর ব্যবহার আছে।

প্লাজ্মা — রক্ত-রস; দেহের রক্তের তরল অংশ। এর মধ্যেই রক্তের শ্বেত-কণিকা ও লোহিত-কণিকাগুলো ভেসে থাকে।

প্ল্যাটিনয়েড্ — তামা, দস্তা, নিকেল ও উল্‌ফ্রাম ↑ ধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত সংকর ধাতু। এতে সাধারণতঃ 60% তামা, 24% দস্তা, 14% নিকেল ও 2% উলফ্রাম ↑ বা টাংস্টেন থাকে। নামে সাদৃশ্য থাকলেও এতে প্ল্যাটিনাম ধাতু কিছু মাত্র থাকে না।

প্লাম্বাগো — গ্র্যাফাইট; কার্বনের একটা স্বাভাবিক অ্যালোট্রোপ ↑; একে আবার ব্ল্যাক-লেডও বলে। লেড বা সীসাকে বলে **প্লাম্বাম**, যা থেকে সীসার সাংকেতিক চিহ্ন Pb হয়েছে; কিন্তু প্লাম্বাগো সীসা নয়।

প্লাস্টার অব প্যারিস—ক্যালসিয়াম সালফেটের ($2CaSO_4.H_2O$) চূর্ণ। এর মধ্যে জল দিলে আঠালো হয়ে ক্রমে শক্ত হয়ে এঁটে যায়। এ-জন্যে হাত পা ভাঙলে এ-দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হয়।

প্ল্যাস্টিক — যে সব পদার্থ উত্তাপে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়। উচ্চ চাপ বা তাপে প্ল্যাস্টিক পদার্থ নরম হয়ে যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় কাঠিণ্য আবার ফিরে আসে। প্ল্যাস্টিক মাত্রই পলিমার ↑ শ্রেণীর পদার্থ; জটিল পলিম্যারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ার ফলে

উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক গঠনের নানারকম প্ল্যাস্টিক পদার্থ তৈরী হয়েছে। সেলুলয়েড ↑ ব্যাকালাইট ↑, নাইলন ↑ প্রভৃতি এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক পদার্থে গঠিত।

প্লুটো—একটি নবাবিষ্কৃত গ্রহ; মাত্র 1930 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপচুন গ্রহেরও দূরবর্তী একটা কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 367 কোটি মাইল। আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আমাদের হিসেবে এর 248·4 বছর লাগে।

প্লুটোনিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Pu, পারমাণবিক সংখ্যা 94; অন্যতম ট্রান্সইউরেনিক ↑ এলিমেণ্ট। প্রাকৃতিক কোন খনিজ পদার্থে অদ্যাপি পাওয়া যায় নি; নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্সনের ↑ ফলে পাওয়া গেছে। ইউরেনিয়াম-238-এর সঙ্গে একটা নিউট্রন ↑ যুক্ত হয়ে ইউরেনিয়াম-239 (আইসোটোপ ↑) সৃষ্টি হয়; আবার একটা ইলেক্ট্রন কমিয়ে দিলে পাওয়া যায় নেপচুনিয়াম ↑। আবার তার থেকে আর একটা ইলেক্ট্রন কমালে সৃষ্টি হয় এই প্লুটোনিয়াম। অ্যাটমিক পাইলে ↑ এর $_{94}Pu^{239}$ আইসোটোপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ধীরগতি নিউট্রন কণিকার আঘাতে এর নিউক্লিয়ার ফিসন ↑ ঘটিয়ে অ্যাটম্ বম্ ↑ তৈরী হয়।

ফ

ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল — আলোক-রশ্মির প্রভাবে তড়িৎ উৎপাদন করবার এক রকম সেল ↑; যার ক্যাথোডের গায়ে সিজিয়াম ↑, ক্যাডমিয়াম ↑ প্রভৃতি আলোক-স্পর্শকাতর পদার্থের সল্ট মাখানো থাকে। আলোক-রশ্মি পড়লে ওই ক্যাথোড থেকে ইলেক্ট্রনের ধারা-প্রবাহ অ্যানোডের ↑ দিকে চলতে থাকে; এর ফলে সেলের মধ্যে
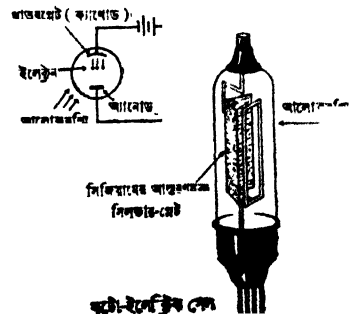
ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল

তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়। আলোক পাতের সঙ্গে সঙ্গে এই তড়িৎ-প্রবাহ সুরু হয়, আর আলোক বন্ধ করলেই তড়িৎ-প্রবাহ

বন্ধ হয়ে যায়। এক রকম বিশেষ ধরণের বায়ুশূন্য কাঁচ-নলের মধ্যে এরূপ সেল তৈরী হয়ে থাকে। সবাক্ আলোকচিত্রে (টকি ফিল্ম) এই ফটো-ইলেক্ট্রিক সেল বিশেষভাবে দরকার হয়। আবার, বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফি ↑, ফায়ার-এলার্ম ↑ প্রভৃতি যন্ত্রে আলোকের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ধারণের জন্যেও এরূপ সেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফটোগ্রাফি—ক্যামেরা যন্ত্রে বিশেষ ধরণের প্লেট বা ফিল্মের ↑ উপর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মির প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলে তার হুবহু ছবি তোলার কৌশল। ক্যামেরার অ্যাপারচারে ↑ সংলগ্ন লেন্সের মধ্য দিয়ে ওই বস্তু থেকে আগত আলোক-রশ্মি যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ প্লেট বা ফিল্মের উপর পড়ে। কাঁচ, সেলুলয়েড ↑, বা অপর কোন স্বচ্ছ পদার্থে এই ফটোগ্রাফিক প্লেট বা ফিল্ম তৈরী; এর উপরে সিলভার-ব্রোমাইড ($AgBr$), বা সিলভার ক্লোরাইডের ($AgCl$) আস্তরণ দেওয়া থাকে। আলোক-রশ্মি এসে এর উপর পড়লে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্লেটের আস্তরণের সিলভার ক্লোরাইড, অথবা ব্রোমাইডের কণিকাগুলো প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে, যে বস্তুর ছবি তোলা হবে তা থেকে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির আলো-ছায়ার তারতম্য অনুসারে প্লেটের উপরে বস্তুটার একটা উলটো প্রতিচ্ছবি (নেগেটিভ ইমেজ ↑) অদৃশ্যভাবে মুদ্রিত হয়ে পড়ে। ডেভেলপিং-এর প্রক্রিয়ায় ওই ছবি পরিস্ফুট করে তোলা হয়। পরে অন্ধকার স্থানে নিয়ে প্লেটটাকে সোডিয়াম হাইপো-সালফেট (সোডিয়াম থায়োসাল্‌ফেট, $Na_2S_2O_3$; সাধারণতঃ যা হাইপো নামে পরিচিত) নামক রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে স্থায়ী করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ফিক্সিং। এর পরে প্লেটটাকে জলে ধুয়ে অতিরিক্ত হাইপো দূর করা হয়। এখন এই পরিষ্কৃত প্লেটটা শুকিয়ে নিয়ে সিলভার সল্ট মাখানো বিশেষ এক রকম কাগজের উপর চেপে আলোতে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে প্লেটের উল্‌টো প্রতিবিম্বটা পুনরায় উল্‌টে গিয়ে কাগজের উপরে বস্তুটার প্রকৃত প্রতিচ্ছবিটা উঠে যায়। মোটামুটি এই হোল সাধারণ ফটোগ্রাফির কৌশল।

ফটো-সিন্থেসিস্ — উদ্ভিদের সবুজ পাতায় ক্লোরোফিল ↑ (পত্র-হরিৎ)

নামক রঙীন এক রকম পদার্থ থাকে। এই ক্লোরোফিল সূর্য-কিরণের সংস্পর্শে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট ↑ সৃষ্টি করে, তাকেই বলে ফটো-সিন্থেসিস। এভাবে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট আত্মসাৎ করেই উদ্ভিদের দেহ পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়। ফটো-সিন্থেসিসের রাসায়নিক প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুসারে ঘটে থাকে : $6\,CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$; এর এই কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা ($C_6H_{12}O_6$), উদ্ভিদ আত্মসাৎ করে, আর অক্সিজেন পুনরায় বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। উদ্ভিদের ক্লোরোফিল (পত্র-হরিৎ) ও সূর্যালোক এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুতঃ ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে মাত্র।

ফটোমিটার — বিভিন্ন আলোক-রশ্মির ঔজ্জ্বল্য তুলনামূলকভাবে স্থির করবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এতে উজ্জ্বল্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না, বিভিন্ন আলোক-উৎসের ঔজ্জ্বল্য ক্যাণ্ডেলা ↑ এককের সাহায্যে তুলনা করা হয় মাত্র।

ফর্ম্যালিন — ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ↑ জলীয় দ্রব : এর মধ্যে সাধারণতঃ 40% ফর্ম্যাল্ডিহাইড থাকে। জীবাণু প্রতিরোধক ও জীবাণুনাশক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফর্ম্যাল্ডিহাইড — গ্যাসীয় পদার্থ, HCHO ; শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধযুক্ত, জলে দ্রবণীয়। মিথাইল অ্যালকোহল ↑ থেকে অক্সিডেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। জীবাণু প্রতিরোধক পদার্থ। প্ল্যাস্টিক-শিল্পে ও রঞ্জক পদার্থ তৈরী করতে এর যথেষ্ট দরকার হয় ; ঔষধ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

ফর্মিক অ্যাসিড — অম্ল গন্ধযুক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ, HCOOH ; এ-থেকে ধূম নির্গত হয়,কোন কিছুতে লাগলে ক্ষয়ে যায়। কোন কোন উদ্ভিদ ও পিঁপড়ের দেহে ফর্মিক অ্যাসিড আছে। সোডিয়াম ফর্মেট ↑ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। চর্ম-শিল্পে (ট্যানিং ↑) ও রঞ্জন-শিল্পে (ডাইং ↑) যথেষ্ট প্রয়োজন হয় ; ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ↑ প্রক্রিয়ায়ও এর ব্যবহার আছে।

ফস্‌ফরাস—মৌলিক পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন P ; পারমাণবিক ওজন 30·98, পারমাণবিক সংখ্যা 15 ; সাধারণতঃ এর দু-রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়,—রেড ফস্‌ফরাস ও হোয়াইট ফস্‌ফরাস। হোয়াইট ফস্‌ফরাস সাদা (ঈষৎ হলদে) কঠিন

পদার্থ, অত্যন্ত বিষাক্ত ও দাহ্য; সাধারণ তাপেই (30° সেন্টিগ্রেড) জ্বলে ওঠে। রেড ফস্‌ফরাস গাঢ় লাল বর্ণের; এটা তেমন বিষাক্ত বা দাহ্য নয়। মৌলিক ফস্‌ফরাস সহজ-দাহ্য বলে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না; বিভিন্ন ফস্‌ফেট, বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট $Ca_3(PO_4)_2$, রূপে পাওয়া যায়। জীবদেহের পক্ষে ফস্‌ফরাস একটা অত্যাবশ্যক উপাদান; দেহের হাড়ের প্রধান উপাদানই হোল ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। ফস্‌ফরাস-ঘটিত পদার্থ, বিভিন্ন ফস্‌ফেট ↑, সুপার-ফস্‌ফেট ↑ প্রভৃতি জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। দেশলাই শিল্পে দাহ্য পদার্থরূপে রেড-ফস্‌ফরাস ব্যবহার করা হয়।

ফস্‌ফর ব্রোঞ্জ — তামা, টিন ও ফস্‌ফরাসের সংকর ধাতু; অত্যন্ত কঠিন, সহজে ক্ষয় হয় না। মোটরের বেয়ারিং ↑, গিয়ার প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরী হয়। সমুদ্রজলের ক্ষয়কারী প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্যে জাহাজের তলদেশ তৈরী করতেও ব্যবহৃত হয়।

ফস্‌জিন — বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাস, $COCl_2$; পদার্থটার অন্য নাম কার্বোনিল-ক্লোরাইড। শ্বাসরোধ-কারী তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। আগেকার দিনে বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে যুদ্ধে ব্যবহৃত হোত। রঞ্জন শিল্পে এর ব্যবহার আছে।

ফস্‌ফাইট — ধাতব পদার্থের সঙ্গে ফস্‌ফরাস-অ্যাসিডের (H_3PO_3) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট। ফস্‌ফরাস অক্সাইড (P_2O_3) ও জলের রাসায়নিক মিলনে ফস্‌ফরাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

ফস্‌ফাইড — ধাতব পদার্থের সঙ্গে ফস্‌ফরাসের সরাসরি মিলনে যে সকল যৌগিক পদার্থ (বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑) উৎপন্ন হয়; যেমন— অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফাইড, AlP, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইড, Ca_3P_2, যা জলের সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে।

ফস্‌ফেট — ফস্‌ফরিক ↑ অ্যাসিডের (H_3PO_4) বিভিন্ন সল্ট। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ফস্‌ফরাস দরকার; এ-জন্যে বিভিন্ন ফস্‌ফেট সল্ট জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। জমিতে ফস্‌ফরাসের অভাব পূরণের জন্যে বিশেষতঃ ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতির ফস্‌ফেট সল্ট দেওয়া হয়।

ফস্‌ফরিক অ্যাসিড — স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, H_3PO_4; জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়। বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে গলে যায়; এ-জন্যে সাধারণতঃ সিরাপের মত ঘন তরল অবস্থায় থাকে। ফস্‌-

ফরিক অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্টকে বলে ফস্‌ফেট।

ফস্‌ফিন—ফস্‌ফিউরেটেড্‌ হাইড্রোজেন, PH_3; বর্ণহীন, বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস; বায়ুর সংস্পর্শে সাধারণ তাপেই জ্বলে ওঠে। এক রকম বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত।

ফস্‌ফোরেসেন্স — আলোক বিকিরণের বিশেষ ধর্ম। কোন কোন পদার্থ কিছুক্ষণ আলোকে থাকার পরে অন্ধকারেও এক রকম দীপ্তি বিকিরণ করে; এদের বলে ফস্‌ফোরেসেণ্ট পদার্থ। কোন কোন খনিজ পদার্থে ও সামুদ্রিক জীবের দেহে এরূপ আলোকচ্ছটা দেখা যায়। জোনাকীর আলোও এক রকম ফস্‌ফোরেসেন্স।

ফাঙ্গাস — ছত্রাক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ; এদের দেহে ক্লোরোফিল ↑ বা পত্র-হরিৎ থাকে না। কাজেই সাধারণ উদ্ভিদের মত পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে এরা ফটোসিন্থেসিস ↑ প্রক্রিয়ায় শর্করা, বা শ্বেতসার তৈরী করতে পারে না। সাধারণতঃ অন্য মৃত উদ্ভিদ, বা জীব-জন্তুর দেহাংশ আশ্রয় করে এরা পুষ্টি লাভ করে ও বেঁচে থাকে।

ফাঙ্গিসাইড — যে সব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন অনিষ্টকর ফাঙ্গাস ↑ ধ্বংস করে। জীবদেহের বিভিন্ন স্থানে নানা রকম অনিষ্টকর সূক্ষ্ম ফাঙ্গাস জন্মে দুরারোগ্য ক্ষত সৃষ্টি করে। ফাঙ্গিসাইড পদার্থ এদের বৃদ্ধি রোধ করে।

ফাউলার সল্যুসন — পটাসিয়াম আর্সেনাইট নামক রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রব; ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফায়ার ড্যাম্প — কয়লার খনিতে যে-সব দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণ বেরিয়ে জ্বলে ওঠে ও বিস্ফোরণ ঘটায়। এর মধ্যে প্রধানতঃ মিথেন (CH_4) ও অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ↑ থাকে। এ-গুলো বেরিয়ে খনিগহ্বরের বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় এবং সামান্য আগুনের সংস্পর্শেই জ্বলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটায়। সহসা সারা খনিতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে (ডেভি-ল্যাম্প ↑)।

ফায়ার এক্‌স্টিঙ্গুইসার — অগ্নি নির্বাপণের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র। বাতাসের অক্সিজেনের সংযোগেই আগুন জ্বলে; এ-জন্যে প্রজ্জলিত পদার্থকে বায়ু-সম্পর্কশূন্য করে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা করা হয়। একটা লম্বা ধাতব পাত্রের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট ↑ (Na_2CO_3) ও সালফিউরিক অ্যাসিড ↑ (H_2SO_4) পৃথক ভাবে রক্ষিত হয়। প্রয়োজনের সময়ে পাত্রটার মুখে চাপ দিলে যান্ত্রিক

ব্যবস্থায় ওই সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে এসে পাত্র মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে মিশে যায়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পাত্রটার মধ্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস জন্মাতে থাকে। ভিতরের অত্যধিক চাপে ওই গ্যাস সবেগে পাত্রের মুখের নল দিয়ে বেরিয়ে প্রজ্বলিত পদার্থের গায়ে লাগে। এভাবে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসে জ্বলন্ত জিনিসটার উপরিভাগ ঢেকে ফেলে; ফলে, বাতাস না পেয়ে আগুন নিবে যায়। আর এক রকম ফায়ার-এক্স্টিঙ্গুইসারে কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) ব্যবহৃত হয়; পদার্থটাকে পাইরিন ↑ ও বলে।

ফার্মাকোলজি—জীবদেহের উপর বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া ও তাদের ভেষজ গুণ সম্পর্কীয় তথ্যাদির বিজ্ঞান।

ফার্টিলাইজার — উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে-সব পদার্থ জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। নাইট্রোজেন ↑, ফসফরাস ↑, পটাসিয়াম ↑ প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান; এজন্যে বিভিন্ন নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম ↑ সল্ট, নাইট্রো-লাইম ↑, বিভিন্ন ফসফেট ↑, সুপার-ফসফেট ↑ এবং নানা রকম খনিজ পটাসিয়াম সল্ট প্রভৃতি জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। আবার বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়ে তৈরী কম্পোস্ট-ও ↑ উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যেও উদ্ভিদের আবশ্যকীয় বিভিন্ন উপাদান থাকে।

ফিলামেণ্ট—সূক্ষ্ম সূত্র। ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প, রেডিও-ভাল্‌ব প্রভৃতির মধ্যে টাংস্টেন ↑ প্রভৃতি উচ্চ তাপসহ ধাতুর তৈরী যে সরু তার থাকে। ওর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে আলোক ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়। পূর্বে কার্বনের ↑ ফিলামেণ্ট-ও ব্যবহৃত হোত, আজকাল সাধারণতঃ তা আর ব্যবহৃত হয় না।

ফিল্‌ট্রেসন — তরলপদার্থে মিশ্রিত সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থাদি পৃথকীকরণের কৌশল; বাংলায় যাকে বলে ছেঁকে ফেলা। ফিল্টার পেপার, বা অন্য কোন সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পদার্থের মধ্য দিয়ে ছেঁকে এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফিল্‌ট্রেসন; পরিস্রুত যে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে বলে ফিল্‌ট্রেট ↑; আর যে জিনিসের মধ্য দিয়ে ছাঁকা হয়, তাকে বলে ফিল্টার।

ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন — বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি

করা হয়। বাতাসের নাইট্রোজেনকে এভাবে ব্যবহারোপযোগী যৌগিকের মধ্যে আবদ্ধ করাকে বলে 'ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন'। জীবজগতের পক্ষে নাইট্রোজেনের একান্ত দরকার, অথচ বায়ুমণ্ডল থেকে কোন জীবই সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না; এজন্যে এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের মিলনে হয় অ্যামোনিয়া, NH_3; বিশেষ ব্যবস্থায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে তৈরী হয় নাইট্রিক অক্সাইড, NO; এ থেকে তৈরী হয় বিভিন্ন নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম সল্ট; যা জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন জীবাণুও আবার বায়ুর নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে জমির মাটিতে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন, যা ব্যয়িত হয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে তা আবার ক্রমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় (নাইট্রোজেন সাইক্ল ↑)।

ফিনল — কার্বলিক অ্যাসিড, C_6H_5OH; বর্ণহীন স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, বিশেষ এক রকম গন্ধযুক্ত। জলে দ্রবণীয়, অত্যন্ত বিষাক্ত, তীব্র অ্যাসিড শক্তি-সম্পন্ন; গায়ে লাগলে তা জ্বলে ক্ষয়ে যায়। এর নিস্তেজ মৃদু দ্রব জীবাণুনাশক ও প্রতিরোধক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; একে কার্বলিক লোশন বলে। রঞ্জক পদার্থ ও প্ল্যাস্টিক তৈরীর কাজে যথেষ্ট দরকার হয়।

ফিনলপ্থেলিন — সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ, $C_{20}H_{14}O_4$; অত্যন্ত হালকা, অ্যালকোহলে ↑ দ্রবণীয়। রঞ্জন শিল্পে দরকার হয়; ঔষধ হিসেবে জোলাপ রূপেও এর ব্যবহার আছে। অ্যালকালির ↑ সংস্পর্শে এর দ্রব লাল হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাসিডের সংস্পর্শে বর্ণহীন থাকে। এ-জন্যে কোন পদার্থ অ্যালকালি, না অ্যাসিড-গুণসম্পন্ন, তা পরীক্ষা করবার জন্যে ইণ্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ফিনাইল— (1) হাইড্রোকার্বন ↑ রেডিক্যাল C_6H_5-এর রাসায়নিক নাম। বেঞ্জিনের ↑ (C_6H_6) একটী হাইড্রোজেন পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটিয়ে এই ফিনাইল রেডিক্যাল পাওয়া যায়। এ থেকেই তৈরী হয় ফিনাইল-অ্যামাইন, $C_6H_5NH_2$, যা অ্যানিলিন ↑ নামে পরিচিত। (2) দুর্গন্ধ-নাশক ও বীজবারক হিসেবে আমরা বাজারের যে ফিনাইল ব্যবহার করি, তা সম্পূর্ণ

আলাদা জিনিস; রজন ও তেল ফুটিয়ে এক রকম তরল সাবান তৈরী করে তার মধ্যে ক্রিয়োজোট ↑ অয়েল মিশিয়ে সাধারণতঃ এই ফিনাইল তৈরী হয়ে থাকে।

ফিউজ (ইলিক্‌ট্রিক্যাল)—কোন তড়িৎ-চক্রের (সার্কিট ↑) মধ্যে নির্দিষ্ট বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ-প্রবাহের গতি রোধ করবার জন্যে ব্যবহৃত যান্ত্রিক কৌশল।
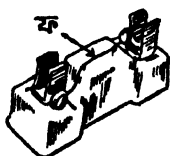
ইলেক্‌ট্রিক ফিউজ এ-জন্যে অল্প তাপসহ টিন, লেড প্রভৃতি ধাতু, বা কোন ফিউজিব্‌ল অ্যালয়ে ↑ নির্মিত তার তড়িৎ-স্রোতের প্রবেশ-পথে সংযুক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট তড়িৎ-বিভব অপেক্ষা উচ্চতর বিভবের তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হলেই উৎপন্ন তাপে ওই ধাতব তার গলে দিয়ে তড়িৎ-চক্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহও বন্ধ হয়। এই কৌশলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রের, বা গৃহের বৈদ্যুতিক তারে আগুণ লেগে যাওয়ার বিপদ নিবারণ করা সম্ভব হয়।

ফিউজিব্‌ল অ্যালয়—যে সব সংকর ধাতু অল্প তাপেই গলে যায়। বিস্‌মাথ, লেড, টিন, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি নিম্ন গলনাংকের ধাতুর বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণে এ-রকম সংকর ধাতু তৈরী হয়ে থাকে। এরূপ একটা সংকর ধাতুর বিশেষ নাম **উড্‌স মেটাল**—50% বিস্‌মাথ, 25% লেড, 12·5% টিন ও 12·5% ক্যাডমিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরী। অগ্নি-নিরোধক যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ফিসন — বিভক্ত হওয়া, বা ভাঙ্গার প্রক্রিয়া। অ্যামিবা ↑ প্রভৃতি কোন কোন জীবাণুর দেহকোষ বিভক্ত হয়ে হয়ে সংখ্যায় বেড়ে যায়; তারকাদি জ্যোতিষ্কের দেহপিণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়—এসব অবস্থাকেই বলে ফিসন। পদার্থের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসনের ↑ সাহায্যে নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে নিউ-ক্লিয়ার ফিসন ↑ ।

ফিক্‌স্‌ড অ্যাল্‌কালি — পূর্বে সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) ও পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) নামক অ্যালকালি ↑ দুটা এই নামে পরিচিত ছিল। অ্যামোনিয়াম কার্বনেট উদ্বায়ী বলে তাকে বলা হয় ভোলাটাইল ↑ অ্যালকালি।

ফিক্‌স্‌ড এয়ার — কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস, CO_2।

ফার্ণ — শৈবাল শ্রেণীর এক জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ। পুষ্পহীন বলে এদের বীজ উৎপত্তি ঘটে না। এরূপ উদ্ভিদের স্বকীয় দেহাভ্যন্তরস্থ পুং-কোষ ও স্ত্রী-কোষের সংযোগে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

ফার্ণ

ফার্মেণ্টেসন—গাঁজন ক্রিয়া; বিভিন্ন জৈব পদার্থে ঈস্ট ↑, ব্যাক্টেরিয়া ↑ প্রভৃতি জীব-ধর্মী এঞ্জাইমের ↑ প্রভাবে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যে সকল এঞ্জাইম পদার্থ এই গাঁজন বা ফার্মেণ্টেসন ক্রিয়া ঘটায় তাদের বলে ফার্মেণ্ট। বিভিন্ন শর্করা জাতীয় পদার্থের জলীয় দ্রবে জাইম্‌স ↑ নামক বিশেষ এক রকম এঞ্জাইমের (ঈষ্ট ↑) প্রভাবে এরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন (ফার্মেণ্টেসন) ঘটে থাকে। ওই এঞ্জাইম এতে ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে। এর ফলে অ্যালকোহল ↑ উৎপন্ন হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরোয়; $C_6H_{12}O_6$ (চিনি) $= 2C_2H_5OH$ (অ্যালকোহল) $+ 2CO_2$ (কার্বন ডাইঅক্সাইড)।

ফেরাস — লৌহ-ঘটিত বিভিন্ন সল্ট, যার মধ্যে লোহার পরমাণু বাই-ভ্যালেণ্ট ↑ রূপে কাজ করে, অর্থাৎ এরূপ সল্টে লোহার প্রত্যেকটি পরমাণুর সঙ্গে দুইটি অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑ মিলিত হয়; যেমন, ফেরাস ক্লোরাইড, $FeCl_2$, ফেরাস সালফেট, $FeSO_4, 7H_2O$ (SO_4 র‍্যাডিক্যাল-টি বাই-ভ্যালেণ্ট), যাকে গ্রীন-ভিট্রিয়ল ↑ (হিরাকস) বলা হয়। ফেরাস সল্টগুলো সাধারণতঃ হাল্কা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে।

ফেরিক — লৌহ-ঘটিত বিভিন্ন সল্ট, যার মধ্যে লোহার পরমাণুগুলো ট্রাই-ভ্যালেণ্ট রূপে কাজ করে, অর্থাৎ লোহার একটা পরমাণু তিনটা অ্যাসিড র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে মিলিত হয়; যেমন—ফেরিক ক্লোরাইড, $FeCl_3, 6H_2O$ (ছয়টি জলীয় অণু নিয়ে এর স্ফটিক গঠিত হয়)। ফেরিক সল্টগুলো সাধারণতঃ হলদে বা পাটকিলে রঙের হয়ে থাকে।

ফেরিক অ্যালাম — ফেরিক পটাসিয়াম সালফেট, $Fe_2(SO_4)_3, K_2SO_4, 24H_2O$; লোহার সাল-ফেট ও পটাসিয়ামের সালফেট সল্ট দুটা মিলিতভাবে 24টি জলের অণু (ওয়াটার অব ক্রস্টালিজেসন ↑) নিয়ে এই স্ফটিক গঠিত হয়। বেগুনী রঙের স্ফটিকাকার পদার্থ। একে আয়রন অ্যালাম-ও বলা হয়।

ফেরোক্রোম—লোহা ও ক্রোমিয়া-

মের সংকর ধাতু; এর মধ্যে 30% থেকে 40% লোহা থাকে। ক্রোমাইট ↑ নামক খনিজ পদার্থ কার্বনের সঙ্গে মিশিয়ে ইলেক্ট্রিক ফার্নেসে উত্তপ্ত করে তৈরী হয়।

ফেরোম্যাগ্নেটিক সাবস্ট্যান্স — নিকেল, কোবল্ট প্রভৃতি যে সব ধাতব পদার্থকে লোহার মত বিশেষভাবে চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন করা যায়। চুম্বকের প্রভাব থেকে সরিয়ে নিলেও এদের মধ্যে চুম্বকীয় শক্তি লোহার মত অনেকাংশে স্থায়ী হয়ে থেকে যায়। এসব ধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থ ইলেক্ট্রন ↑ কণিকাগুলোর গতিবৈষম্যের ফলেই এরূপ চুম্বকীয় শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ফারেন্‌হাইট ডিগ্রি — উষ্ণতা পরিমাপের একক বিশেষ। কোন পদার্থের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে প্রধানতঃ তিন রকম একক ব্যবহৃত হয়—ফারেন-হাইট, রুমার ও সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) জলের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের উষ্ণতার পার্থক্যের 180 ভাগের এক ভাগকে ফারেন্‌হাইট ডিগ্রি ধরা হয়। ফারেন্‌হাইট স্কেলে জলের হিমাঙ্ক (সেন্টিগ্রেড ↑ স্কেলের মত) 0° ডিগ্রি না ধরে, ধরা হয় 32°F; সুতরাং স্ফুটনাঙ্ক হবে 32° + 180° = 212°F. ফারেন্‌হাইট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ↑ ডিগ্রির চেয়ে অনেকটা কম উষ্ণতা নির্দেশ করে; এক ফারেন্-হাইট ডিগ্রি = 5/9 সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি।

ফুকোজ্ পেণ্ডুলাম— প্রকাণ্ড এক রকম দোলক-যন্ত্র; যাতে ভারী একটা ধাতব গোলক খুব লম্বা তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; দুলিয়ে দিলে গোলকটা এদিক ওদিক দুলতে থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে ভূপৃষ্ঠ নিয়ত ঘুরে যাচ্ছে, ফলে এরূপ পেণ্ডুলাম দুলিয়ে দেওয়ার কিছু সময় পরেই দেখা যায়, গোলকটার দোলন-পথ পরি-বর্তিত হচ্ছে। গোলকটার নীচে একটা লম্বা কাঁটা সংলগ্ন করে তলদেশে বালি ছড়িয়ে তার উপরে ওই কাঁটাটা দাগ কাটতে পারে এমনভাবে গোলকটা দুলিয়ে দিলে বালির উপরে অঙ্কিত দাগ দেখে
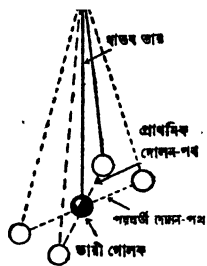
ফুকোজ্ পেণ্ডুলাম্

ওর দোলন-পথের পরিবর্তন স্পষ্ট দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ ক্রমে ঘুরে যাচ্ছে বলে ওই দাগ ক্রমাগত এঁকে বেঁকে যায়, এক থাকে না। সুদীর্ঘ তারে বাঁধা দোলকটার লম্ব মোটামুটি এক থাকে, তলদেশের ভূপৃষ্ঠ ঘুরে যায়; ফলে গোলকটার দোলন-পথ বদলে যায়। এ-থেকে পৃথিবী যে ঘুরছে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এরূপ দোলকের লম্ব-রজ্জু মোটামুটি যে স্থির থাকে, তা কতকটা জাইরোস্কোপের ↑ সঙ্গে তুলনীয়।

ফুট-পাউণ্ড — কর্ম-শক্তির একক বিশেষ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (ফোর্স অব গ্র্যাভিটি ↑) একক এক পাউণ্ড ওজনের কোন বস্তু এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে এরূপ বল-শক্তি (ফোর্স) প্রয়োগের ফলে নিষ্পন্ন কাজের (ওয়ার্ক) পরিমাণকে বলে এক ফুট-পাউণ্ড।

ফুট-পাউণ্ড্যাল — ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ডের মাপে কর্মশক্তির একটা একক। এক পাউণ্ড্যাল ↑ বল-শক্তির (ফোর্স) প্রভাবে কোন বস্তুতে এক ফুট গতি সঞ্চারিত করতে যে পরিমাণ কাজ (ওয়ার্ক) সম্পন্ন হয়। সি. জি. এস. মাপে এরূপ কর্মশক্তির একক হোল আর্গ ↑; এক জুল ↑ $=10^7$ আর্গ।

ফুলমিনেট অব মার্কারি — মারকিউরিক আইসো-সায়ানেট, $Hg(OCN)_2$; পারদ ও হাইড্রো-সায়েনিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন এক রকম সল্ট। বিস্ফোরক পদার্থ; মৃদু আঘাতেই সশব্দে বিস্ফোরিত হয়। এর সাহায্যে গান-পাউডার ↑ প্রভৃতির বিস্ফোরণ ঘটান হয়ে থাকে।

ফুলার্স আর্থ — মৃত্তিকা-সদৃশ এক শ্রেণীর খনিজ পদার্থ, যা তৈল ও চর্বি জাতীয় জিনিস শুষে নেয়। বস্ত্র-শিল্পে, তৈল ও চর্বি শোধনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ম্যাগ্নেসিয়াম ↑, ক্যালসিয়াম ↑, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলি-কেট পদার্থে গঠিত।

ফোকাস — কোন লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত, অথবা দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দূরাগত সমান্তরাল আলোক-রশ্মিসমূহ যে বিন্দুতে এসে

ফোকাস ও ফোক্যাল লেংথ

সংহত হয়, অথবা সংহত হচ্ছে বলে মনে হয়। সূর্য-রশ্মির দিকে লেন্স ধরলে কিছু দূরে একটা তীব্র আলোকবিন্দু সৃষ্টি হয়, এটা হোল

ওই লেন্সের ফোকাস। লেন্স বা দর্পণের কেন্দ্র থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে ফোক্যাল লেংথ। কেবল আলোক-রশ্মি নয়, উপযুক্ত কৌশলে এক্স-রশ্মি, গামা-রশ্মি প্রভৃতি সব রকম রশ্মিরই ফোকাস সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ফোটন—ফটোইলেক্ট্রিক এফেক্ট ↑ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলোককে তরঙ্গ-ধর্মী বলে মনে করা যায় না,—কণিকা-ধর্মী বলে প্রতিভাত হয়। এরূপ অবস্থায় আলোকের ওই কণিকাকে ফোটন নাম দেওয়া হয়েছে। আলোকের এইরূপ প্রত্যেকটি ফোটন কণিকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বর্ত্তমান — একেই বলা হয় আলোকের র‍্যাডিয়েন্ট এনার্জি ↑। বিভিন্ন আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দন-সংখ্যার উপরে এই শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে।

ফোটোস্ফিয়ার — সূর্য-গোলক একটা জলন্ত গ্যাস-পিণ্ড মাত্র। এই গ্যাস-পিণ্ডের বহিস্থ অত্যুজ্জল অংশ, যা আমরা দেখতে পাই, তাকে বলা হয় ফোটোস্ফিয়ার। সৌর দেহের উপরিভাগের বিভিন্ন হাল্কা গ্যাসের জলন্ত আবরণটাই হোল ফোটোস্ফিয়ার; এর উত্তাপ প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

ফার্টিনস্ ব্যারোমিটার— বিশেষ এক রকম বায়ু-চাপমান যন্ত্র (ব্যারোমিটার ↑)। এরূপ ব্যারো-মিটারের স্কেল স্থির থাকে, তল-দেশে সংলগ্ন একটা স্ক্রু ঘুরিয়ে ভিতরের পারা-স্তম্ভ ওই স্কেলের ঠিক গোড়াতে আনা হয়। এর সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয়ের জন্যে এক রকম সংশোধন-তালিকা থাকে। তা থেকে হিসাব করে বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়।

ফ্যাট — জান্তব চর্বি; বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ নানা রকম গ্লিসা-রাইডে ↑ গঠিত নমনীয় কঠিন পদার্থ। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তৈল ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসারাইড হলেও এ-গুলো সাধারণতঃ তরল অবস্থায় থাকে; এদের বলে অয়েল। কিন্তু খনিজ তেলগুলো সব তরল হাইড্রোকার্বন ↑ মাত্র।

ফ্যাটি অ্যাসিড — জৈব অ্যাসিড। এর বিভিন্ন প্রকার গ্লিসারাইড ↑ হলো জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈল। ফ্যাটি অ্যাসিডের সাধারণ ফর্মুলা হোল, R. COOH; এর মধ্যে R হোল হাইড্রোকার্বনের, বা কেবল মাত্র হাইড্রোজেনের বিভিন্ন সংখ্যক অণু, এবং COOH হোল এর অ্যাসিড র‍্যাডিক্যাল ↑। স্টিয়ারিক অ্যাসিড, $CH_3(CH_2)_{16}$

COOH, একটা ফ্যাটি অ্যাসিড। এর তিনটা অণুর সঙ্গে গ্লিসারিনের ↑ মিলনে গঠিত গ্লিসারাইডে গরুর চর্বি উৎপন্ন হয়েছে। বিভিন্ন চর্বি ও তেলের মধ্যে বিভিন্ন গ্লিসারাইডের আকারে সব ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো পাওয়া যায়।

ফ্যাদম — সমুদ্রজলের গভীরতা মাপবার জন্যে ব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের একক ; 6 ফুট = এক ফ্যাদম।

ফ্যাদোমিটার— যে যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। জলের উপরিভাগে সৃষ্ট কোন শব্দ জলরাশি ভেদ করে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে, তা এই যন্ত্রে নির্ণীত হয়। এই সময় থেকে হিসাব করে জলের গভীরতা সহজেই জানা যায়।

ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেসন—বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের নানা রকম তরল পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে ওই সব তরল পদার্থ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় পৃথক করবার কৌশল। বিভিন্ন তরল পদার্থ বিভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয় ; এ-জন্যে কোন মিশ্র তরল পদার্থকে কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় স্থিরভাবে উত্তপ্ত করে ওই উষ্ণতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট তরল পদার্থটাকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। উৎপন্ন বাষ্প ঠাণ্ডা করে তরল পদার্থটা পৃথকভাবে পাওয়া যেতে পারে। এভাবে বিভিন্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত হয়ে সংমিশ্রণ থেকে বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের তরল পদার্থ একে একে পৃথক হয়ে ফ্রাক্‌সনেটিং-কলামের বিভিন্ন পাত্রে জমতে থাকে।

ফ্রুক্টোস্ — পাকা ফলের মিষ্ট রস ও ফুলের মধু থেকে যে শর্করা পাওয়া যায়। একে ফ্রুট সুগার, বা লেভুলোস-ও ↑ বলে। সাধারণ চিনির মত এর রাসায়নিক গঠন, $C_6H_{12}O_6$; স্ফটিকাকার সুমিষ্ট পদার্থ, জলে দ্রবণীয়।

ফ্রিক্‌সন্যাল ইলেক্ট্রিসিটি — ঘর্ষ-তড়িৎ ; বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণে উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি। গালা বা কাঁচের কোন জিনিস সিল্ক বা উল দিয়ে ঘষলে তড়িৎ-শক্তি জন্মায় ; সুতার কাপড় দিয়ে ঘষলেও কিছু কাজ হয়। ছোট ছোট কাগজের টুকরা নিয়ে এভাবে উৎপন্ন তড়িতের অস্তিত্ব পরীক্ষা করা যায়। কিছুক্ষণ ঘষার পরে ওই কাঁচ বা গালার তড়িতাবিষ্ট জিনিসটা কাগজের টুকরাগুলোর কাছে ধরলে টুকরাগুলো আকৃষ্ট হয়ে ওর গায়ে লেগে যায়।

ফ্রিজিং পয়েন্ট — বায়ুমণ্ডলীয়

চাপের স্বাভাবিক (760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) অবস্থায় যে তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে জমতে সুরু করে, অর্থাৎ তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হতে থাকে, তাই হোল ওই তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েণ্ট। জলের ফ্রিজিং পয়েণ্ট 0^0 সেন্টিগ্রেড।

ফ্রিজিং মিকশ্চার — কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ (সল্ট ↑) জলে দ্রবীভূত করলে, বা বিচূর্ণ বরফ মেশালে তার উষ্ণতা অত্যধিক হ্রাস পায়; এত ঠাণ্ডা হয় যে, তার সংস্পর্শে জল জমে যায়। এরূপ মিশ্রণকে বলে ফ্রিজিং মিকশ্চার। দ্রবীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এই সব সল্ট যে পরিমাণ তাপ শুষে নেয় (হিট্ অব সল্যুসন্ ↑) তার উপরই ঠাণ্ডা হওয়ার মাত্রা নির্ভর করে। অল্প জলে এক টুকরা বরফ রেখে তার উপর কিছু সাধারণ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ছড়িয়ে দিলে 'লেটেন্ট হিট্ অব ফিউসন'-এর ↑ প্রভাবে তাপ হ্রাস পেয়ে জল জমে যায়।

ফ্লাওয়ার অব সাল্ফার — বিশুদ্ধ গন্ধকের অতি সূক্ষ্ম হালকা চূর্ণ। অবিশুদ্ধ গন্ধক উত্তপ্ত করে সাব্লিমেসন ↑ প্রক্রিয়ায় যে ধূম উৎপন্ন হয়, তাকে কৌশলে ঘ... করে এরূপ বিশুদ্ধ সালফারের হাল্কা গুঁড়া পাওয়া যায়।

ফ্লাস্ — মল-মূত্রাগারের ন... জলবিধৌত করবার যন্ত্র। শিকল ধরে টানলে লিভারের ↑ অপর প্রান্তে সংলগ্ন নিম্নমুখ পাত্রটা উপরে উঠে যায়; বাইরের পাত্রস্থ জল বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাবে ওই পাত্রের মধ্যে ঢুকে এক... বক্রনলের বাঁকের উপর পর্যন্ত উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওই জল সাইফন প্রণালীতে বক্রনলের ভিতর দিয়ে সবেগে নীচে বেরিয়ে আসে।
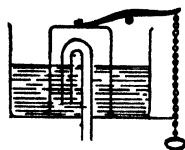
ফ্লাস্

ফ্লিণ্ট — এক রকম অবিশুদ্ধ খনিজ সিলিকা (SiO_2) প্রস্তর। সিগারেট লাইটারের ফ্লিণ্ট, যার ঘর্ষণে আগুন জলে ওঠে, তা এই খনিজ ফ্লিণ্ট পাথর নয়। এ জিনিস লোহা ও সিরিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী একটা সংকর ধাতু (পাইরোফোরিক অ্যালয় ↑)।

ফ্লিণ্ট গ্লাস — বিশেষ এক শ্রেণীর কাঁচ; যা দিয়ে লেন্স ↑, প্রিজম ↑ প্রভৃতি তৈরী হয়। এ-জাতীয় কাঁচের (গ্লাস ↑) একটা বিশেষ উপাদান হোল লেড্-সিলিকেট।

ফ্লোরিন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন F, পারমাণবিক ওজন 1, পারমাণবিক সংখ্যা 9; ক্লোরিনের ↑ অনুরূপ হলদে গ্যাস, কিন্তু এর রাসায়নিক সংযোগশক্তি অধিক। ফ্লোরস্পার ↑ ক্রায়োলাইট ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন ফ্লোরাইড ↑ খনিজ থেকে ফ্লোরিন পাওয়া যায়।

ফ্লোরস্পার — খনিজ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, CaF_2; স্ফটিকাকার বর্ণহীন পদার্থ; অবিশুদ্ধ খনিজ অবস্থায় সাধারণতঃ লাল্চে দেখায়। এ থেকেই বেশীর ভাগ ফ্লোরিন নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

ফ্লোজিস্টন থিওরি — পদার্থের জ্বলন সম্পর্কীয় প্রাচীন মতবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী লাভয়সিয়ে তাঁর এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক পদার্থেই ফ্লোজিস্টন নামক পদার্থ কণিকা বর্তমান; পদার্থটা পোড়ালে এই ফ্লোজিস্টন কণিকা বেরিয়ে যায়, আর ফ্লোজিস্টন-হীন ছাই পড়ে থাকে। বিজ্ঞানী প্রিস্টলি এই মতবাদ ভুল প্রমাণিত করেন। তিনি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করে জ্বলনের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করেন। তিনি দেখালেন, কোন পদার্থ পোড়ালে ফ্লোজিস্টন, বা অন্য কোন কিছু চলে যায় না, বরং অক্সিজেন গ্যাস ওই পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়: প্রকৃতপক্ষে পদার্থটা পরোক্ষভাবে ওজনে বেড়ে যায়।

ফ্লোরেসেন্স — কোন কোন পদার্থের বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বিকিরণ করবার ধর্ম। কুইনিন সালফেটের দ্রব, প্যারাফিন অয়েল ↑ প্রভৃতি কতকগুলো পদার্থ বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিশেষ বিশেষ বর্ণের আলোকরশ্মি (বা তেজ) শোষণ করে, এবং তার পরিবর্তে অপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি বিকিরিত করে। এদের এই ধর্মকে বলে ফ্লোরেসেন্স: আর ওই সব পদার্থকে বলে ফ্লোরেসেন্ট পদার্থ। এসব পদার্থের উপর আলোক-রশ্মি যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণ এই ফ্লোরেসেন্স ধর্ম থাকে। নিয়ন ল্যাম্পে ↑ নিয়ন গ্যাসের এরূপ ফ্লোরেসেন্স ধর্মের জন্যেই বিশেষ বিশেষ বর্ণ-বিশিষ্ট আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। পদার্থের ফস্ফোরেসেন্স ↑ ধর্ম আবার অন্যরূপ; — মূল আলোক সরিয়ে নিলে অন্ধকারেও কোন কোন পদার্থের এক রকম আলোক বা দীপ্তি বিকিরণ করবার ধর্মকে বলে ফস্ফোরেসেন্স।

বক্সাইট — খনিজ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3; এই খনিজ পদার্থ থেকেই অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। কাদা-মাটির মত এই খনিজ পদার্থটা হাইড্রেটেড ↑ (জল সংযুক্ত) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে গঠিত। ভারতের নানাস্থানে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়।

বক্সাইট সিমেণ্ট — বিশেষ এক শ্রেণীর সিমেণ্ট ↑; যার প্রধান উপাদান হোল ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট। ইলেক্ট্রিক ফার্নেসে বক্সাইট ↑ ও লাইম (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑) উওপ্ত করে তৈরী হয়। এ-রকম সিমেণ্ট অতি দ্রুত শক্ত হয়ে পড়ে।

বল-বেয়ারিং — গাড়ীর চাকা বা যন্ত্রাদির কোন ঘূর্ণীয়মান অংশ কেন্দ্র-সংলগ্ন যে দণ্ডের গায়ে আঁটা থাকে, তাকে বলে অ্যা ক্সেল।

বল-বেয়ারিং

এই অ্যাক্সেল দণ্ডটা যাতে সহজে দ্রুতবেগে ঘুরতে পারে সে-জন্যে বল-বেয়ারিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। গোলাকার একটা ধাতব খাঁচের মধ্যে ধাতুনির্মিত কতকগুলো বল পাশাপাশি বসিয়ে বল-বেয়ারিং তৈরী হয়। আক্সেলটার দুই প্রান্ত এরূপ দুটা বল-বেয়ারিং-এর মধ্যে বসানো থাকে।

বয়েন্সি — পদার্থের প্লবতা; নিমজ্জিত বস্তুর উপর তরল, বা গ্যাসীয় পদার্থের ঊর্ধ্ব চাপ। সাধারণতঃ তরল পদার্থের বেলায়ই এই প্লবতা সমধিক লক্ষিত হয়। নিমজ্জিত বস্তু যতটা তরল পদার্থ অপসারিত করে তার ওজনের সমান হয় এই ঊর্ধ্ব চাপ, বা প্লবতার পরিমাণ (আর্কিমিডিস প্রিন্সিপল্ ↑) এজন্যে তরল পদার্থে নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুর ওজন কম মনে হয়: অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান ওজন ওই বস্তুর প্রকৃত ওজন থেকে কমে যায়। বায়ুরও প্লবতা আছে—এজন্যে কোন বস্তুর প্রকৃত ওজন জানতে হলে বায়ুর প্লবতা-জনিত ওজন-হ্রাস সংশোধন করা দরকার। অবশ্য এই পার্থক্য এত সামান্য যে, সাধারণতঃ বস্তুর বায়ু-মধ্যস্থ ওজনকেই তার প্রকৃত ওজন বলে ধরা হয়।

বয়েলিং পয়েণ্ট — স্ফুটনাঙ্ক; যে উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থ ফুটতে থাকে। প্রত্যেক তরল পদার্থ তার একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা, বা তাপ-

মাত্রায় ফোটে; ফোটে, যখন ওই উত্তপ্ত তরল পদার্থে উৎপন্ন সর্বোচ্চ বাষ্পীয় চাপ বহিস্থ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হয়। এই স্ফুটনাঙ্কে তরল পদার্থের বাষ্প উত্থিত হতে থাকে। বহিস্থ বায়বীয় চাপের তারতম্যে স্ফুটনাঙ্কেরও তারতম্য ঘটে; — পর্বতশিখরে বায়ুর চাপ কম বলে জল অপেক্ষাকৃত অল্প তাপেই ফোটে; নিম্নভূমিতে বেশী উত্তাপ দরকার হয়। কোন তরল পদার্থ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার পারার ওজন; — ব্যারোমিটার ↑) যে উষ্ণতায় ফুটতে আরম্ভ করে তাকেই সাধারণভাবে তার স্ফুটনাঙ্ক বলা হয়।

বয়েল্‌স ল — কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণের কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন তার উপরে প্রদত্ত চাপের বিপরীত আনুপাতিক হয়, অর্থাৎ চাপ বাড়লে আয়তন তদনুপাতে কমে, চাপ কমলে আয়তন আবার তদনুপাতে বাড়ে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন গ্যাসের চাপ ও আয়তনের গুণফল সর্বদা সমান হবে। বিজ্ঞানী বয়েলের এই গ্যাসীয় নিয়ম সাধারণতঃ কোন গ্যাসের পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে খাটে না। যদি কোন গ্যাস এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে তবে তাকে পারফেক্ট গ্যাস ↑ বলা হয়।

বাইকার্বনেট—কার্বনিক অ্যাসিডের (H_2CO_3) বিভিন্ন অ্যাসিড সল্ট ↑ ; কার্বনিক অ্যাসিডের (ডাইবেসিক ↑) অর্ধেক হাইড্রোজেন আয়ন ↑ যদি কোন বেস্‌-এর ↑ রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে অপর অর্ধেক হাইড্রোজেন আয়ন নিয়ে তার যে অসম্পূর্ণ সল্ট তৈরী হয়; যেমন — সোডিয়াম বাইকার্বনেট $NaHCO_3$, পটাস বাইকার্বনেট $KHCO_3$. (অ্যাসিড সল্ট ↑)।

বাইক্রোমেট অব পটাস — পটাসিয়াম বাইক্রোমেট (বা ডাই-ক্রোমেট), $K_2Cr_2O_7$; লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থে ও অক্সি-ডাইজিং ↑ এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
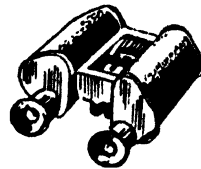
বাইনোকুলার — সাধারণ এক রকম দূরবীন বিশেষ; এর মধ্যে একই রকমের দু-খানা লেন্স দু-দিকে লাগান থাকে। এক সঙ্গে দুই চোখ লাগিয়ে এর সংলগ্ন

বাইনোকুলার

লেন্সের মধ্য দিয়ে দূরের জিনিসের প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ বাইনোকুলার ফিল্ড-গ্লাসের একটা চিত্র দেওয়া হোল।

বাইনারি কম্পাউণ্ড — দ্বি-মৌল যৌগিক ; দুইটা মৌলিক পদার্থের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় ; যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ↑ CaC_2 , হাইড্রোজেন সালফাইড H_2S ইত্যাদি।

বাইনারি অ্যালয় — কেবল মাত্র দুইটি ধাতুর সংযোগে যে সংকর ধাতু সৃষ্টি হয় ; যেমন — পিতল (ব্রাস) হোল একটা বাইনারি অ্যালয় ; কারণ এটা কেবল তামা ও দস্তার মিলনে গঠিত।

বাই-প্রোডাক্ট — কোন রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করবার প্রক্রিয়ায় আনুসঙ্গিক হিসেবে অন্য যে সব পদার্থ পাওয়া যায়। অনেক সময় এই আনুসঙ্গিক পদার্থ উদ্দিষ্ট পদার্থ অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হয়ে থাকে। যেমন—কোল গ্যাস ↑ তৈরীর সময়ে বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া, কোক, কোল-টার ↑ ; এই কোল-টার. বা আলকাতরা থেকে আবার পাওয়া যায় বিভিন্ন অ্যানিলিন ↑ রং. ঔষধ, সুগন্ধ দ্রব্য, স্যাকারিন ↑ প্রভৃতি।

বাটার অব অ্যান্টিমনি — অ্যান্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড, $SbCl_3$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। অ্যান্টিমনি ট্রাইসালফাইড (স্টিব্‌নাইট, Sb_2S_3) ও কন্‌সেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়।

বার্নিং—দহন বা জ্বলন ক্রিয়া ; বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের রাসায়নিক মিলন। বস্তুতঃ কোন পদার্থের বার্নিং বা দহন-ক্রিয়া একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া মাত্র — এর ফলে বিভিন্ন অবস্থায় উত্তাপ, আলোক ও অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বার্ণ্ট অ্যালাম — ফিটকিরি বা অ্যালাম ↑ উত্তপ্ত করলে যে সাদা গুঁড়া পাওয়া যায় ; পদার্থটা হোল পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট $K_2SO_4 . Al_2(SO_4)_3$। উত্তাপের ফলে অ্যালামের ও য়া টা র অব ক্রিস্টালিজেসন ↑ চলে গিয়ে জলশূন্য হয়, স্ফটিকাকৃতি নষ্ট হয়ে যায়।

বায়োকেমিস্ট্রি — বিভিন্ন জৈব পদার্থের রাসায়নিক গঠন, পরিবর্তন ও তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ; এক কথায় জৈব রসায়ন শাস্ত্র।

বায়োলজি — জীববিদ্যা। বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

পর্যালোচিত হয়ে থাকে। বোটানি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), জুওলজি (প্রাণী বিজ্ঞান), ব্যাক্টিরিয়োলজি প্রভৃতি সবই এর অন্তর্গত।

বার্বিচুরেট — বার্বিচুরিক অ্যাসিডের [$CO(NH.CO)_2CH_2$] বিভিন্ন লবণ; এই শ্রেণীর নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে। জীব-দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এদের শক্তিশালী (অনেক সময় মারাত্মক) প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ভেরোন্যাল, লুমিন্যাল প্রভৃতি এ-জাতীয় ঔষধে দেহ অসাড় হয়ে আসে, ঘুম পায়। এগুলোকে সাধারণতঃ নার্কোটিক ড্রাগ↑ বলা হয়। এ-সব ঔষধ ব্যবহারে মানুষ নেশার মত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

বিটা পার্টিকল্ — রেডিও-অ্যাক্টিভ (তেজস্ক্রিয়) পদার্থ থেকে যে সব কণিকা নির্গত হয়, তার মধ্যে অতি দ্রুতগামী ইলেক্ট্রন↑ (β^-) ও পজিট্রন↑ (β^+) কণিকাগুলোকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এই বিটা-কণিকার গতি আলোক-তরঙ্গের গতির প্রায় সমান।

বিটা-রে—রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীন থেকে উদ্গত বিটা-পার্টিকলগুলো↑ ধারার আকারে প্রবাহিত হয়। এই কণিকা-ধারার গতি ও ধর্ম প্রায় আলোক-রশ্মির অনুরূপ। এ-জন্যে একে বলা হয় বিটা-রশ্মি (রেডিও-অ্যাক্টিভিটি↑)।

বিটাট্রন — পদার্থের পরমাণু বিভাজনের (ফিসন↑) সাহায্যে প্রাপ্ত ইলেক্ট্রন কণিকাগুলোকে অত্যধিক দ্রুত গতিসম্পন্ন করবার জন্যে

(চক্রনলের অংশ উন্মুক্তভাবে দেখান হয়েছে)
বিটাট্রন (তথ্যগত নক্সা)
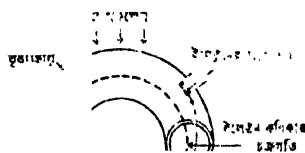
উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একটা তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত বৃত্তাকার বায়ুশূন্য কাঁচনলের ভিতরে বিশেষ ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রন-কণিকাগুলোকে চক্রাকারে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করান হয়। এর ফলে বহিস্থ তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে কণিকাগুলো ক্রমশঃ উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

বিটুমেন — বিভিন্ন ভারী হাইড্রোকার্বনের↑ সংমিশ্রণে গঠিত আলকাতরার মত কালো এক রকম পদার্থ। একে সাধারণ কথায় বলে পিচ্, যা দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়। পেট্রোলিয়াম↑ থেকে হাল্কা হাইড্রোকার্বন সব বার করে নিলে

এই পদার্থ পড়ে থাকে। পদার্থটা আবার কয়লা থেকেও পাওয়া যায়।

বিস্‌মাথ — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Bi; পারমাণবিক ওজন 209, পারমাণবিক সংখ্যা 83; লালচে আভাযুক্ত সাদা স্ফটিকাকার ভঙ্গুর ধাতু। উত্তাপ ও তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা এর অত্যন্ত কম। উত্তাপে গলিয়ে পরে ঠাণ্ডা করলে ধাতুটা জমে আয়তনে কিছু বেড়ে যায়, এজন্যে টাইপ-মেটালে ↑ অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। নিম্ন গলনাঙ্কের বিভিন্ন সংকরধাতু (উড্‌মেটাল ↑) এ দিয়ে তৈরী হয়। এর কোন কোন সল্ট ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেসিমার প্রোসেস্‌ — অবিশুদ্ধ ঢালাই লোহা (কাস্ট আয়রন ↑) থেকে ইস্পাত তৈরী করবার একটা প্রণালী। প্রথমতঃ ব্লাস্ট ফার্নেসে ↑ লোহা গলান হয়; পরে ওই
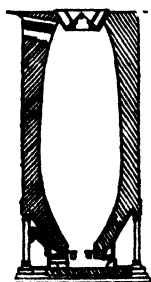
ব্লাস্ট ফার্নেস

গলিত লোহা বেসিমার কনভার্টার নামক একটা পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বেসিমার কনভার্টার হোল একটা ডিম্বাকার প্রকাণ্ড পাত্র, যার তলদেশে ছিদ্রপথ থাকে। এই ছিদ্রপথে তরল লোহার সজোরে বায়ু প্রবেশ করান এর ফলে লোহার ময়লা সব অক্সাইজড্‌ হয়ে পুড়ে যায়; এর পরে ওই বিশুদ্ধ লোহায় স্পিগেল (লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বনের একটা বিশেষ সংকর ধাতু) পরিমাণমত মিশিয়ে প্রয়োজনীয় ইস্পাত তৈরী করা হয়। লোহার সঙ্গে মিশ্রিত কার্বনের পরিমাণের উপরই ইস্পাতের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ নির্ভর করে (স্টিল ↑)।

বুটেন — প্যারাফিন শ্রেণীর একটি হাইড্রোকার্বন, C_4H_{10}; তৈলকূপ থেকে পেট্রোলিয়ামের ↑ সঙ্গে নির্গত হয়। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় এটা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। বিশেষ দাহ্য পদার্থ, মোটর-স্পিরিটের সঙ্গে অনেক সময় মিশ্রিত করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় গ্যাসটা জ্বালিয়ে আলো সৃষ্টি করাও হয়ে থাকে

বুন্‌সেন বার্ণার — এক রকম গ্যাস বার্ণার; দাহ্য গ্যাস জ্বেলে অগ্নিশিখা উৎপাদনের এক রকম যন্ত্র। বিজ্ঞানাগারে এই বার্ণারে কোল-গ্যাস ↑ জেলে দ্রব্যাদি উত্তপ্ত করা হয়। এর ধাতব নলের নিম্নাংশের একটা ছিদ্রপথ বাড়িয়ে

কমিয়ে প্রয়োজনানুরূপ বাতাস প্রবেশ করান হয়। এভাবে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয়ে ওই নলের মুখে বেরোয়। এই বায়ু-মিশ্রিত গ্যাসটা জ্বালালে নলের অগ্রভাগে অগ্নিশিখার সৃষ্টি হয়। বায়ুর পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে অগ্নিশিখার তীব্রতাও কমান বাড়ান সম্ভব হয়।
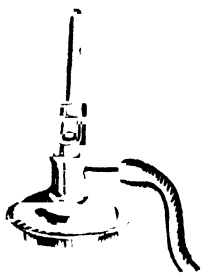
বুন্‌সেন বার্ণার

বেকিং পাউডার — সোডিয়াম বাইকার্বনেটের ($NaHCO_3$) সঙ্গে টার্টারিক অ্যাসিড ↑ বা ক্রিম্ অব টার্টার ↑ মিশিয়ে বেকিং পাউডার তৈরী হয়। জলে দিলে বা উত্তপ্ত করলে এ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস বেরুতে থাকে। পাউরুটি তৈরীর জন্যে ময়দার জল-মিশ্রিত নরম পিণ্ডের মধ্যে এই পাউডার মেশাবার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়; ফলে, গ্যাসের অসংখ্য বুদ্‌বুদ উঠে নরম ময়দার পিণ্ডটা ছিদ্রবহুল হয়ে ফেঁপে ফুলে ওঠে।

বেকিং সোডা —বেকিং পাউডার ↑ তৈরী করবার জন্যে প্রধানতঃ প্রয়োজন হয় বলে সোডিয়াম বাইকার্বনেট সল্টকে ($NaHCO_3$) বেকিং-সোডা বলা হয়। সোডিয়াম কার্বনেট হোল ওয়াসিং সোডা।

বেস্ — যে সব পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সল্ট ও জল উৎপন্ন হয়; যেমন— CuO (কপার অক্সাইড) + H_2SO_4 (সালফিউরিক অ্যাসিড) = $CuSO_4$ (কপার সালফেট, সল্ট) + H_2O (জল)। সাধারণতঃ বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড-গুলোই বেস্ বলে পরিচিত।

বেস্ মেটাল — নিকৃষ্ট ধাতু। লোহা, তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু সাধারণ অ্যাসিডে গলে যায়, মরচে ধরে, কালো হয়ে যায়; এজন্যে এ-গুলোকে নিকৃষ্ট ধাতু, বা বেস্ মেটাল বলে। সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুকে বলে নোবল্ মেটাল ↑ ।

বেক্‌ম্যান থার্মোমিটার — এক প্রকার তাপমান যন্ত্র; যার সাহায্যে উষ্ণতার অতি সামান্য পরিবর্তনও মাপা যায়। এ-রকম থার্মোমিটারে ↑ পারদ-নলের নিম্নস্থ গোলকের পারদ প্রয়োজন মত উপরের দিকে সংলগ্ন আর একটা কাঁচ-গোলকে স্থানান্তরিত

করবার ব্যবস্থা থাকে। এভাবে পারদের পরিমাণ সহজেই কমান বাড়ান চলে। এর ফলে বিভিন্ন উষ্ণতায় তাপের সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধিও মাপবার জন্যে এ-থার্মোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। এর গায়ে মাত্র 6 বা 7 ডিগ্রি পরিমিত স্কেলের দাগ কাটা থাকে — এর প্রত্যেক ডিগ্রিকে এক শত ভাগে ভাগ করা হয়। এ-জন্যে ডিগ্রির শতাংশও এ-দিয়ে মাপা সম্ভব হয়।

বেল (ইলেক্ট্রিক) — বৈদ্যুতিক ঘণ্টা; তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির প্রভাবে ঘণ্টা-ধ্বনি সৃষ্টি করবার এক রকম যন্ত্র বিশেষ। সুইচ টিপলে একটা ছোট ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটের তড়িৎ-চক্র সম্পূর্ণ হয়; সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ওই ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটের তার-বা তার মধ্য-স্থিত লৌহখণ্ড, চৌম্বক শক্তি-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এই চৌম্বকশক্তির আকর্ষণে নিকটস্থ কাঁচা লোহার একটা পাত আকৃষ্ট হোলেই তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে ওই চৌম্বকশক্তিও লোপ পায়। এর ফলে চুম্বকীয় আকর্ষণের অভাবে লোহার পাতখানা যথাস্থানে এসে তড়িৎ-চক্র আবার সম্পূর্ণ হয়। তৎক্ষণাৎ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে আবার চুম্বকীয় শক্তি জন্মায় ও লোহার পাতখানা আকৃষ্ট হয়। এভাবে পাতখানা মুহুর্মুহু এদিক ওদিক নড়তে থাকে। পাতখানার গায়ে সংলগ্ন ছোট একটা হাতুড়ি সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাতব পাত্রের (ঘণ্টার) গায়ে আঘাত করতে থাকে। যতক্ষণ সুইচ টিপে তড়িৎ-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা হয় ততক্ষণ ওই ঘণ্টাধ্বনি চলতে থাকে।
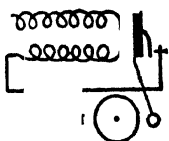
ব্যাটারি

ইলেক্ট্রিক বেল

বেল মেটাল — তামা ও টিনের সংকর ধাতু; এর মধ্যে তামার ভাগ 60% থেকে 85% পর্যন্ত থাকতে পারে। সামান্য আঘাতে অধিক স্পন্দিত হয়ে ভাল শব্দ উৎপাদন করে বলে সাধারণত এ দিয়েই ঘণ্টা তৈরী হয়। বাংলায় এই সংকর ধাতুকে কাঁসা বলে।

বেঞ্জিন — বর্ণহীন তরল হাইড্রো-কার্বন, C_6H_6; কয়লা থেকে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দাহ্য উদ্বায়ী পদার্থ, সহজেই বাষ্পাকারে উবে যায়। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় পদার্থটাকে বেঞ্জলও বলা হয়। তৈল ও চর্বি জাতীয় পদ

বেঞ্জিনে গলে যায়; উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ। মোটর গাড়ীর জ্বালানি তেল হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

বেঞ্জল — অপরিশুদ্ধ বেঞ্জিনের ↑ ব্যবহারিক নাম। মোটর স্পিরিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একে অনেক সময় বেঞ্জোল-ও বলা হয়।

বেঞ্জাইন — প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ সংমিশ্রণ; উদ্বায়ী তরল পদার্থ। খনিজ পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে পাওয়া যায়। তেল ও চর্বি জাতীয় পদার্থ এতে দ্রবীভূত হয়। এ দিয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরিষ্কার (ড্রাই-ওয়াস) করা হয়। দ্রাবক পদার্থ হিসেবেও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেঞ্জোইক অ্যাসিড — একটা তরল ফ্যাটি ↑ অ্যাসিড; রাসায়নিক ফর্মুলা C_6H_5COOH; এই তরল বর্ণহীন পদার্থটা ফল সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঔষধ-রূপেও এর কিছু ব্যবহার আছে।

বেরিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Ba; পারমাণবিক ওজন 137·36, পারমাণবিক সংখ্যা 56; রৌপ্যের মত সাদা নরম ধাতু। বায়ুর সংস্পর্শে অক্সাইড হয়ে এর উপরে একটা আবরণ পড়ে যায়। খনিজ বেরিয়াম সালফেট (ব্যারাইটিস্ ↑), $BaSO_4$ ও কার্বনেট, $BaCO_3$, থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়। এর সল্টগুলো দেখতে ক্যালসিয়াম সল্টের অনুরূপ, কিন্তু বিষাক্ত। বিভিন্ন বেরিয়াম সল্ট ভার্নিস ↑ রং তৈরী, কাঁচ শিল্প ও আতসবাজী তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেরিলিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Be; পারমাণবিক ওজন 9·013, পারমাণবিক সংখ্যা 4; সাদা শক্ত ধাতব পদার্থ। পদার্থটা **গ্লুসিনিয়াম** নামেও পরিচিত। বেরাইল ↑ নামক খনিজ পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হালকা ও শক্ত ধাতু। তামা, লোহা প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন সংকর ধাতু তৈরী হয়। ইস্পাত ও বেরিলিয়ামের সংকর ধাতু দিয়ে ঘড়ির হেয়ার-স্প্রিং তৈরী করা হয়। অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসন ↑ মন্দীভূত করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বেরাইল — বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, $3BeO.Al_2O_3.6SiO_2$; খনিজ পদার্থ। এই খনিজ থেকেই সাধারণতঃ বেরিলিয়াম ↑ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

বেসিক ডাই — যে সব জৈব

রাসায়নিক সল্টের জলীয় দ্রবে ডুবিয়ে বস্ত্রাদি (কোন মরড্যান্ট ↑ ব্যতি- রেকেই) সরাসরি রঞ্জিত করা যায়। মৃদু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে এ-সব অ্যালকালি-ধর্মী ↑ রঞ্জকদ্রব্য দিয়ে সুতা, উল প্রভৃতিতে পাকা রং করা যেতে পারে। এ দিয়ে কাপড় ছাপাও হয়।

বেসিক সল্ট — যে সব সল্টের মধ্যে বেসিক র্যাডিক্যাল ↑ আংশিকভাবে মিশ্রিত অবস্থায় থেকে যায়। অ্যাসিড সল্টের ↑ মত অসম্পূর্ণ সল্টের পর্যায়ভুক্ত। বেসিক (বেস্) পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়- নিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়ে নিয়মিত সল্টের সঙ্গে (অক্সাইড বা হাইড্র- ক্সাইড ↑) বেসের কতকাংশ যদি মিশ্রিত থেকে যায়, তাহলে এরূপ সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে ; যেমন — বেসিক লেড কার্বনেট, $2\,PbCO_3.Pb(OH)_2$; যাকে সাধারণতঃ বলে হোয়াইট লেড ↑ ।

বেসিক স্ল্যাগ — খনিজ লৌহ থেকে ইস্পাত তৈরীর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত তরল লোহার উপরে নানা রকম লৌহেতর পদার্থের যে গাদ সৃষ্টি হয়। পদার্থটা মোটামুটি লাইম ↑, ফসফরাস, সিলিকা ↑ প্রভৃতির বিভিন্ন অবিশুদ্ধ সল্টের সংমিশ্রণ। সাধারণতঃ এর মধ্যে টেট্রা- ক্যালসিয়াম ফসফেট ($Ca_4P_2O_9$), ক্যালসিয়াম সিলিকেট ($CaSiO_3$), লাইম (CaO), ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3), বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত থাকে। ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম থাকার জন্যে এরূপ বেসিক স্ল্যাগ উৎকৃষ্ট সার হিসেবে জমিতে দেওয়া হয়।

বোন্ ব্ল্যাক — জীব-জন্তুর হাড় ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে যে বিশেষ কয়লা (কার্বন) পাওয়া যায়। একে অ্যানিম্যাল চারকোল ↑, আবার অনেক সময় বোন্-চার-ও বলা হয়।

বোন্ অয়েল — জীব-জন্তুর হাড় থেকে ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় যে তৈলাক্ত পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। অত্যন্ত কালো তরল পদার্থ, বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত। এ থেকেই পাইরিডিন ↑ পাওয়া যায়। এই বোন অয়েলকে আবার **ডিপেল্স অয়েল**ও বলে।

বোরন — মৌলিক ধাতব পদার্থ সাংকেতিক চিহ্ন B ; পারমাণবিক ওজন 10·82, পারমাণবিক সংখ্যা 5 ; ধাতুটা পাংশুটে রংয়ের চূর্ণ বা হল্‌দে স্ফটিকাকার পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। বোর্যাক্স ↑ ও বোরিক অ্যাসিড ↑ বোরনের যৌগিক পদার্থ

কাঠিন্য বৃদ্ধির জন্যে ইস্পাতে র সঙ্গে কখন কখন কিছু বোর মিশ্রিত করা হ

বোরিক অ্যাসিড — সাদা ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ, H_3BO_3; জলে দ্রবণীয়। একে **বোর‍্যাসিক অ্যাসিড**ও বলে। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বোরাক্স থেকেই প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয় মৃদু অ্যান্টিসেপ্টিক ↑ হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

বোর‍্যাসিক অ্যাসিড — বোরিক অ্যাসিড ↑।

বোর‍্যাক্স — সোডিয়াম পাইরো বোরেট, $Na_2B_4O_7 . 10H_2O$ সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। পৃথিবীর নানা স্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়। বাংলায় একে বলে সোহাগা। উত্তাপে এর জলীয় অংশ চলে গিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। কাঁচ শিল্পে, অগ্নি-নিরোধক পদার্থ তৈরী করতে ও সোল্ডারিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়। মৃদু অ্যান্টিসেপ্টিক পদার্থ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

ব্যাকেলাইট — বিশেষ এক শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑ পদার্থের ব্যবহারিক নাম। এর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী বেকল্যাণ্ডের নামানুসারে পদার্থ এই নাম দেওয়া হয়েছে। ফিনল ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের মিলনে উৎপ এক রকম রাসায়নিক পদার্থে একটা পলিমার ↑। এটা এক রক থার্মোসেটিং ↑ প্ল্যাস্টিক।

ব্যাক্টেরিয়া — বিশেষ এক শ্রেণী আণুবীক্ষণিক জীবাণু; এককো প্রোটোপ্লাজম্ ↑ বিশেষ। মা ক্রোব ↑, জার্ম, ব্যাসিলি ↑ প্রভৃ সবই ব্যাক্টেরিয়া জাতীয়। আপ দেহ ভেঙে ভেঙে (ফিসন ↑) এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে; একটা ব্যাক্টেরিয়া থেকে 24 ঘণ্টায় এভাবে দেড় কোটি পর্যন্ত ব্যাক্টেরিয়া সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন আকারের ব্যাক্টেরিয়া বিভিন্ন নামে পরিচিত: গোলাকার চ্যাপ্টাগুলো **কক্কাই**, কাঠির মত লম্বাগুলো **ব্যাসিলি**, ইত্যাদি। বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সব জীবাণুই রোগ সৃষ্টি করে না; অনেক উপকারী ব্যাক্টেরিয়াও আছে। মাটির মধ্যে নানা রকম ব্যাক্টেরিয়া থাকে, যার প্রভাবে উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন নাইট্রেট ↑ সল্ট সৃষ্টি হয় (নাই-ট্রোজেন সাইক্ল ↑)। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন রকম ব্যাক্টেরিয়া রয়েছে।

ব্যাক্টেরিসাইড—যে সব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন রোগ-জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া ↑) ধ্বংস করে। জীবাণু-ঘটিত রোগে জীবাণুদের ধ্বংস, বা তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করবার জন্যে যে সব ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ব্যাসিলাস্ — কাঠির মত লম্বা আকৃতি-বিশিষ্ট ব্যাক্টেরিয়ার ↑ বিশেষ নাম। এদের অতি সূক্ষ্ম লম্বা দেহ বক্রও হতে পারে; পেছনে থাকে চুলের মত লেজ। কলেরার ব্যাসিলাস কমার মত বক্র। শব্দটার বহুবচনে হয় ব্যাসিলি।

টাইফয়েড ব্যাসিলাস্

ব্যালান্স — পরিমাপক যন্ত্র। অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্রকে বলে কেমিক্যাল ব্যালান্স। এক গ্র্যামের ↑ দশ হাজার ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত এতে মা পা চলে; কোন কোন ব্যালান্সে আরও সূক্ষ্ম মাপ সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এরূপ ব্যালান্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যন্ত্রটা একটা কাঁচের বাক্সের মধ্যে রক্ষিত হয়, যাতে বাইরের বায়ুপ্রবাহে ওজনের কো ব্যাঘাত না ঘটে। অতি সূক্ষ্ম নিখুঁত ওজনের জন্যে এতে না রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি থাকে এর লিভার ↑ দণ্ডটার ঠিক মধ্যস্থ সংলগ্ন থাকে একটা অ্যাগেট ত্রিকোণ; সেটা আবার অ্যাগেট নির্মিত একটা স্থির সমতলের উপ বসান থাকে। সাধারণ কেমিক্যা ব্যালান্সের একটা মোটামুটি চি দেওয়া হোল।
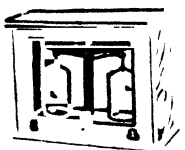
কেমিক্যাল ব্যালান্স

ব্যাটারি — বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের উপযোগীভাবে পাওয় জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম যন্ত্র একাধিক প্রাইমারি, বা সেকেণ্ডা সেল ↑ শ্রেণীবদ্ধভাবে বা সমান্তর করে সাজিয়ে ব্যাটারি তৈরী হ সেলগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে (অ পর পর সিরিজে সংলগ্ন) রা ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑ বে যায়; সমান্তরালভাবে (অ প্যারালাল কানেক্সনে) সাজ সেলের ব্যাটারি থেকে বেশী স জন্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া য সাধারণতঃ ড্রাই-ব্যাটারিগুলো লেক্ল্যান্স ↑ সেলে তৈরী থাকে।

ব্যারাইটা — খনিজ বেরি অক্সাইড, BaO; সাদা আকারে পাওয়া যায়।

ব্যারাইটিস্ — খনিজ বেরিয়াম সালফেট, $BaSO_4$; ভারী সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। সীসার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। জলে দ্রবণীয় নয়। তেলে মিশিয়ে এর চূর্ণ দিয়ে সাদা পেইণ্ট তৈরী হয়। সাধারণতঃ এই খনিজ থেকেই বেরিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। জিনিসটা **হেভি-স্পার** নামেও পরিচিত।

ব্যারোগ্রাফ — আবহাওয়া-সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদিতে ব্যবহৃত এক রকম বিশেষ চাপমান যন্ত্র। এর সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কাগজের উপরে রেখাপাতের সাহায্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রধানতঃ একটা অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার ↑ দিয়েই যন্ত্রটা গঠিত; চাপের তারতম্যানুযায়ী এর গাত্র-সংলগ্ন একটা কাঁটা উঁচু-নীচু হয়ে কাগজের উপর ওইরূপ রেখাপাত করে।

ব্যারোমিটার — বায়ু চাপমান যন্ত্র। সাধারণ চাপমান যন্ত্রে থাকে একমুখ বন্ধ একটা কাঁচনল, মোটামুটি 36″ লম্বা; পারা (মার্কারি ↑) ভর্তি করে এর খোলা মুখটা অন্য একটা পারা-ভর্তি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে খাড়াভাবে রাখা হয়। এ রকম ব্যারোমিটারকে বলে মার্কারি ব্যারোমিটার। কাঁচনলের মধ্যে পারা-স্তম্ভ কিছু নেমে গিয়ে এক

ব্যারোমিটার

স্থানে স্থির হয়ে যায়। উপরে যে বায়ুশূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়, তাকে **টরিসেলিয়ান ভ্যাকুয়াম** ↑ বলে। কাঁচনলের মধ্যস্থিত পারা-স্তম্ভের উচ্চতা মেপে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ নির্ধারিত হয়। এর কারণ, এই পারা-স্তম্ভের ওজনের সমান হবে বায়ুমণ্ডলের চাপ; যেহেতু নীচের খোলা পাত্রস্থ পারার উপরে বায়ুর যে চাপ পড়ে নলের পারা স্তম্ভের ওজন তার সমান হতে বাধ্য। পারা-ভর্তি লম্বা নল অন্য পাত্রের পারার মধ্যে উল্‌টে না ধরে একটা বাঁকান নলে পারা নিলেও একই কাজ হয়। সাধারণ আবহাওয়ায় বায়ুর চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 30″ বা 75 সেন্টিমিটার পারা-স্তম্ভের ওজনের সমান হয়ে থাকে। এক বর্গ ইঞ্চি স্থানের উপর বায়ুর চাপ সাধারণতঃ 15 পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় 7½ সের। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উচ্চতায়

বায়ুমণ্ডলের এই চাপের তারতম্য ঘটে (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। এ ছাড়া বায়ুর চাপ নির্ধারণের জন্যে অ্যানিরয়েড ↑ ব্যারোমিটারও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্রাস — পিতল; প্রধানতঃ তামা ও দস্তার সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতু। অনুপাত ও উপাদানের তারতম্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাস তৈরী হয়ে থাকে।

ব্রুয়িং — বিশেষ ধরণের পচন ক্রিয়া, বা গেঁজে যাওয়া। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিয়ার (মদ্য) প্রস্তুত হয়। বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ (মল্ট ↑) জলমিশ্রিত করে রাখলে গেঁজে গিয়ে ওই শ্বেতসার মল্টোসে ↑ রূপান্তরিত হয়। মিষ্ট স্বাদযুক্ত ওই তরল পদার্থ ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছেঁকে নিলে যে পরিস্রুত তরল পদার্থ পাওয়া যায়, তাতে ঈষ্ট ↑ দিয়ে গাঁজিয়ে নিলে বিয়ার তৈরী হয়। এই প্রক্রিয়াকে ব্রুয়িং বলে।

ব্রোমিন — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Br; পারমাণবিক ওজন 79·916, পারমাণবিক সংখ্যা 35; গাঢ় লাল উদ্বায়ী তরল পদার্থ, শ্বাসরোধকারী তীব্র গন্ধ-বিশিষ্ট। ক্লোরিন ↑ শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোব্রোমিক ↑ অ্যাসিড তৈরী হয়। এর বিভিন্ন সল্টকে বলে ব্রোমাইড ↑। ঔষধ হিসেবে ও ফটোগ্রাফির ↑ কাজে যথেষ্ট দরকার হয়। ম্যাগ্নেসিয়াম ব্রোমাইড ও বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবদেহ থেকে বিভিন্ন উপায়ে ব্রোমিন পাওয়া যায়।

ব্রোমাইড — হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড (HBr) একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড; হাইড্রোজেন ও ব্রোমিনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত। এই হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট হোল ব্রোমাইড; যেমন—পটাসিয়াম ব্রোমাইড, KBr, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়; সিলভার ব্রোমাইড, $AgBr$, ফটোগ্রাফির কাজে একটি অত্যাবশ্যক রাসায়নিক পদার্থ।

ব্রোমাইড পেপার — সিলভার ব্রোমাইড, $AgBr$, মাখানো এক রকম কাগজ; যার উপরে ফটোগ্রাফির ↑ ছবি তোলা হয়।

ব্রোঞ্জ — টিন ও তামার সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতু। অবশ্য, টিন না থাকলেও কোন কোন সংকর ধাতুকে ব্রোঞ্জ বলা হয়; যেমন, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের সংকর ধাতুকে বলে অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ।

বৃটিশ থার্ম্যাল ইউনিট — তাপের একক বিশেষ; যে পরিমাণ তাপশক্তির (হিট ↑) প্রয়োগে এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট ↑ বৃদ্ধি পায়। ক্যালোরি ↑ হিসেবে এর পরিমাণ হোল 252 ক্যালোরি থার্ম ↑)।

বৃটেনিয়া মেটাল — বিভিন্ন গঠনের বিশেষ এক শ্রেণীর সংকর ধাতু। এর মধ্যে প্রধানতঃ থাকে 80% থেকে 90% টিন, কিছু অ্যান্টিমনি ও কপার তামা), কখন কখন সামান্য দস্তা এবং সীসাও মেশান হয়। রূপোর মত সাদা এই শ্রেণীর সংকর ধাতু দিয়ে চামচ, চায়ের পাত্রাদি তৈরী করা হয়।

ব্ল্যাক অ্যাশ — লেব্লাঙ্ক প্রণালীতে যে অবিশুদ্ধ ও অপরিষ্কৃত সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট ↑) Na_2CO_3, পাওয়া যায়।

ব্ল্যাক লেড — গ্র্যাফাইট ↑ ; একে প্লাম্বাগো-ও ↑ বলে। খনিজ স্ফটিকাকার পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে কার্বনের একটা অ্যালোট্রোপ ↑ ; নরম ও কালো কঠিন পদার্থ। পেন্সিলের শিস্ এ দিয়ে তৈরী হয় (পেন্সিল লেড ↑)। যন্ত্রাদিতে ব্যবহারের জন্যে এক রকম পিচ্ছিল পদার্থ (লুব্রিক্যান্ট ↑) তৈরী করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়।

ব্লিচিং পাউডার — ক্লোরাইড অব লাইম; এক রকম সাদা চূর্ণ পদার্থ প্রধানতঃ এর মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড, $CaOCl_2$; বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্লেক্‌ড লাইম ↑ বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [$Ca(OH)_2$] মধ্যে ক্লোরিন ↑ গ্যাস অন্তঃপ্রবিষ্ট করে পদার্থটা তৈরী করা হয়। দুর্গন্ধ ও জীবাণু নাশ করবার জন্যে ডিসিন্‌ফ্যাক্ট্যান্ট ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদি বর্ণহীন সাদা ধব্‌ধবে করবার জন্যেও এর বিশেষ ব্যবহার আছে। রঙীন জিনিসের রঞ্জক পদার্থ এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বর্ণহীন হয়ে যায়। মূলতঃ এটা অক্সিডাইজিং এজেন্টের ↑ কাজ করে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলে ব্লিচিং বা বর্ণহীন করা।

ব্লু-ভিট্রিয়ল — কপার সালফেট, $CuSO_4.5H_2O$; স্ফটিকাকার নীল বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ। একে ব্লু-স্টোনও বলা হয়; বাংলায় বলে তুঁতে। পোকা-মাকড়ের উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে এর জলীয় দ্রব গাছপালায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্লু-প্রিন্ট — নীলবর্ণের এক রকম কাগজের উপরে সাদা রেখায় অঙ্কিত নক্সাদি। এক রকম

আলোক-সুগ্রাহী কাগজের উপর ফটোগ্রাফির ↑ প্রক্রিয়ায় এ রকম নক্সা ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধারণ কাগজের উপরে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইড, $K_3Fe(CN)_6$, ও কোন জৈব ফেরিক সল্ট মাখিয়ে কাগজটাকে এরূপ আলোক-সুগ্রাহী করা হয়। যার নক্সা তুলতে হবে তার সাধারণ কাগজটা ওই রকম কাগজের উপর চেপে কিছু সময় রোদে রাখা হয়। সূর্যালোকের প্রভাবে ফেরিক সল্ট ↑ ফেরাস সল্টে রূপান্তরিত হয়ে পটাসিয়াম ফেরিসায়েনাইডের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে প্রুসিয়ান-ব্লু ↑ উৎপন্ন হয়; যা ওই কাগজে এঁটে লেগে যায়। পরে ওই কাগজ জলে ধুয়ে নিলে পরিষ্কার ব্লু-প্রিণ্ট পাওয়া যায়। নক্সার দাগগুলো ফটোগ্রাফির মত ওই নীল রঙের উপর সাদা রেখায় ফুটে ওঠে। ব্লু-প্রিণ্টের জন্যে ব্যবহৃত ওইরূপ আলোক-সুগ্রাহী বা সুবেদী কাগজকে **ফেরো-প্রুসিয়েট পেপার** বলে।

ব্ল্যাস্ট ফার্নেস — অবিশুদ্ধ খনিজ লৌহ থেকে মোটামুটি বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম চুল্লী বিশেষ। ফায়ার-ব্রিক ও ইস্পাতের চাদর দিয়ে এরূপ চুল্লী তৈরী হয়। লাইম-ষ্টোন ($CaCO_3$) ও কয়লার সঙ্গে খনিজ লৌহ মিশিয়ে এই চুল্লীতে প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত করা হয়। নীচের ছিদ্রপথে ওর মধ্যে পাম্প করে বায়ু-প্রবাহ প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে কয়লা আংশিক-ভাবে পুড়ে কার্বন মনোক্সাইড, CO, গ্যাস উৎপন্ন হয়।
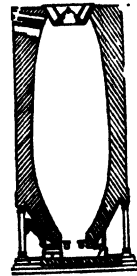
ব্লাষ্ট ফার্নেস

ওই কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস খনিজের আয়রন অক্সাইডকে রিডিউস ↑ করে বিশুদ্ধ লোহায় রূপান্তরিত করে। উত্তাপের ফলে আবার লাইম-ষ্টোন বিশ্লিষ্ট হয়ে লাইম (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস জন্মায়। এই লাইম ↑ লৌহ-খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত বালি ও বিভিন্ন ময়লা নিয়ে তরল লৌহ থেকে গাদের (বেসিক স্ল্যাগ ↑) আকারে পৃথক হয়ে পড়ে। ফার্নেসের তলদেশের ছিদ্রপথে তরল লোহা বার করে নেওয়া হয়। এই লোহাকেই পিগ্ আয়রন কাস্ট আয়রন ↑ বলে। এর মধ্যে

লোহার সঙ্গে প্রায় 4·5% কার্বন থেকে যায়, এজন্যে এরূপ লোহা হয় ভঙ্গুর।

ব্ল্যাস্টিং জিলেটিন — নাইট্রো-গ্লিসারিন ↑ ও গান কটনের ↑ সংমিশ্রণে উৎপন্ন জেলির মত পদার্থ। একটা অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক। এর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে সুরঙ্গ পথ তৈরী করা হয় (ডিনামাইট ↑)।

ভ

ভলিউম — আয়তন, বা ঘন পরিমাণ। কোন পদার্থ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ নিয়ে যতটা স্থান অধিকার করে থাকে তাকেই পদার্থটার ভলিউম বা আয়তন বলে।

ভলিউম মেজার — আয়তন বা ঘন পরিমাণের ইংলণ্ডীয় একক; যাকে বলে কিউবিক মেজার;

কঠিন পদার্থ:

1728 ঘন ইঞ্চি = 1 ঘন ফুট

27 ঘন ফুট = 1 ঘন ইয়ার্ড

(এক ঘন ইঞ্চি = 16·387 ঘন সেন্টিমিটার ↑)

তরল পদার্থ:

4 জিল = 1 পাঁইট, বা ·5682 লিটার ↑

2 পাঁইট = 1 কোয়ার্ট

4 কোয়ার্ট = 1 গ্যালন ↑ = 4·546 লিটার

(মেট্রিক এককে)

1000 ঘন মিলিমিটার = 1 ঘন সেন্টিমিটার (সি সি)

1000 ঘন সেন্টিমিটার = 1 লিটার (প্রায়)

ভাইরাস — সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগজীবাণু, বা রোগসৃষ্টিকারী জীবকণা। এ-গুলো ক্ষুদ্রতম ব্যাক্টেরিয়া ↑ থেকেও ক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণেও সাধারণতঃ দেখা যায় না। ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপে ↑ আজকাল কোন কোন ভাইরাস বহু গুণ বর্ধিতাকারে দেখা সম্ভব হয়েছে। নানা জাতীয় ভাইরাস আছে, বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণে জলাতঙ্ক, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ জন্মায়। ব্যাক্টেরিয়া শ্রেণীর জীবাণুরা উপযুক্ত খাদ্যবস্তুর মধ্যে বেঁচে থাকে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ভাইরাসগুলো জীবন্ত পদার্থ আশ্রয় না করে বাঁচে না। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে মনে হয়, এ-গুলো অতি জটিল গঠনের রাসায়নিক পদার্থ, — এক রকম প্রোটিন ↑ কণিকা। এরা আবার অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, কাজেই বুঝা যায় জীব-ধর্মী।

ভার্চুয়াল ইমেজ সাধারণ

দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে কোন বস্তুর যেরূপ প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি হয়। এ-রকম প্রতিফলনে বস্তু থেকে আগত আলোক-রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের চোখে পড়ে; কিন্তু যেখানে প্রতিচ্ছায়া
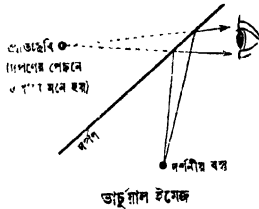
ভার্চুয়াল ইমেজ

দেখা যায়, বস্তুটা থেকে কোন আলোক-রশ্মি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে যায় না, বা সেখান থেকে কোন আলোক-রশ্মি আসেও না। এ-রকম ইমেজ ↑ বা প্রতিচ্ছায়ার কোন প্রতিফলিত রশ্মি নেই; কাজেই তা পর্দায় ফেলাও সম্ভব হয় না। এরূপ অপ্রকৃত বা অবাস্তব প্রতিচ্ছায়াকে ভার্চুয়াল ইমেজ বলা হয়।

ভার্টিব্রেট্ — মেরুদণ্ডী প্রাণী; মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। এদের **ভার্টিব্রেটা**-ও বলে। পোকা, মাকড়, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির মেরুদণ্ড নেই বলে এরূপ জীবকে বলে ইন্‌ভার্টিব্রেট।

ভার্ডিগ্রিস — অব্যবহারে তামার জিনিসের উপরে সবুজ বর্ণের যে পদার্থ সৃষ্টি হয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হোল কপার কার্বনেট, বা বেসিক কপার অ্যাসিটেট ↑: বায়ুর সংস্পর্শে তামার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এরূপ যৌগিকের সৃষ্টি হয়। বিষাক্ত পদার্থ।

ভার্ণাল ইকুইনক্স — বসন্ত কালের যে দিনে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়; দ্বিপ্রহরে সূর্য ঠিক মাথার উপরে নিরক্ষ-রেখার বরাবর থাকে। 21শে মার্চ তারিখ হোল ভার্ণাল ইকুইনক্স। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে এই দিনে সূর্য ও পৃথিবীর ওইরূপ অবস্থান ঘটে (ইকুইনক্স ↑)।

ভার্নিয়ার — দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত পরিমাপের এক রকম যন্ত্র। সাধারণ স্কেলে সচরাচর ইঞ্চির দশমাংশের দাগ কাটা থাকে; এই ভার্নিয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ওই দশমাংশ ইঞ্চির সূক্ষ্মতর মাপ পাওয়া সম্ভব হয়। ভার্নিয়ারও এক রকম স্কেলের মত সাধারণ স্কেলের গায়ে লাগিয়ে সরিয়ে সরিয়ে হিসাব করে কৌশলে ইঞ্চির শতাংশও এর সাহায্যে সহজে নির্ণীত হতে পারে

সাধারণতঃ ভার্নিয়ার স্কেলে 9/10 ইঞ্চিকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে; কাজেই এর প্রত্যেক ভাগ
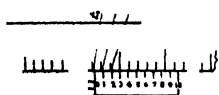
ভার্নিয়ার স্কেল

হবে ·09 ইঞ্চি। প্রকৃত স্কেলের দশমাংশ অপেক্ষা ভার্নিয়ার স্কেলের দশমাংশ কাজেই ·01 ইঞ্চি কম; এই ·01 হোল **ভার্নিয়ার কনষ্ট্যাণ্ট**। এখন, ক থেকে খ বিন্দুর দূরত্ব মাপতে হবে। প্রকৃত স্কেলের 0 বিন্দু ক'এর উপরে রাখা হোল; দেখা গেল, খ বিন্দু 2·2 ইঞ্চির সামান্য দূরে রয়েছে। এখন ভার্নিয়ার স্কেলের 0 বিন্দু সরিয়ে সরিয়ে খ' বিন্দুর বরাবর রাখলে ওর পরবর্তী কোন্ দাগ প্রকৃত স্কেলের কোন্ দাগের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়, তা লক্ষ্য করতে হবে। এখানে দেখা গেল, 3 দাগে এরূপ হয়। সুতরাং প্রকৃত স্কেলের মাপ 2·2-এর সঙ্গে ·01 × 3 যোগ দিয়ে কখ-এর সঠিক দৈর্ঘ্য হবে 2·2 + ·03 অর্থাৎ 2·23 ইঞ্চি।

ভার্মিলিয়ন — সিন্দুর; রাসায়নিক হিসেবে মারকিউরিক সালফাইড, HgS; পারা ও গন্ধকের রাসায়নিক মিলনে গঠিত লাল চূর্ণ পদার্থ। মহিলারা সীমন্তে পরেন; লাল রং (পেইন্ট) হিসেবেও এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

ভার্মিসাইড — পোকা-মাকড় বিনষ্ট-কারী বিষাক্ত পদার্থ। যে সব রাসায়নিক পদার্থে বিভিন্ন পোকা ও কীট-পতঙ্গ ধ্বংস হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গকে বলে ভার্মি, বা ভার্মিন।

ভার্মিফিউজ — যে সব ভেষজ পদার্থ অন্ত্রে উৎপন্ন ক্রিমি-কীটাদি বিনষ্ট করে। স্যাণ্টোনিন↑ একটা উৎকৃষ্ট ভার্মিফিউজ।

ভাল্‌ক্যানাইজড্ রাবার — রাবারের সঙ্গে গন্ধক বা গন্ধক-ঘটিত যৌগিক পদার্থ উত্তাপে দ্রবীভূত করলে যে পদার্থ সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন পদার্থ রাবারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম স্থিতিস্থাপক ও শক্ত হয়ে থাকে। একে ছাঁচে ঢেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়। মোটর গাড়ীর টায়ার প্রভৃতি এরূপ ভাল-ক্যানাইজড্ রাবারে তৈরী হয়।

ভাল্‌ক্যানাইট — শক্ত এক রকম ভাল্‌ক্যানাইজড্ রাবার↑ বিশেষ। রাবারের সঙ্গে গন্ধকের বিশেষ এক রকম রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জিনিসটা তৈরী হয়। এর তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা একেবারে

থাকে না বলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে নন্‌কণ্ডাক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ভাল্‌ব — (1) কোন ছিদ্র বা নল-পথে যে ঢাকনা এমনভাবে বসানো থাকে যাতে তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ কেবল এক দিকে যেতে পারে, কিন্তু বিপরীত দিকে বেরুতে পারে না। (2) বেতার যন্ত্রাদিতে ইলেক্ট্রিক বাল্‌বের মত যে কাঁচের টিউব থাকে, তাকেও সাধারণতঃ ভাল্‌ব বলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর নাম থার্মোআয়োনিক ↑ ভাল্‌ব। এর সাহায্যে উচ্চ কম্পনের তড়িত্তরঙ্গকে পরিশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়ে থাকে।

ভিটামিন — খাদ্য-প্রাণ; বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে কার্বন-ঘটিত যে সব জৈব রাসায়নিক পদার্থ জীব মাত্রেরই পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন খাদ্যে এরূপ বিভিন্ন পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে থাকে; কিন্তু যার অভাবে নানা রকম রোগ দেখা দেয়, জীবদেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। খাদ্যের প্রাণ-স্বরূপ এই অত্যাবশ্যক পদার্থ-গুলোকে বলে ভিটামিন; বাংলায় বলে খাদ্য-প্রাণ। পূর্বে এদের বিভিন্ন গুণাগুণ মাত্র বিচার করে

ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, সি, ডি প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়েছিল। ইদানিং বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক স্বরূপ ও গঠনও অনেক ক্ষেত্রে জানা গেছে:

ভিটামিন-এ — রাসায়নিক হিসেবে হোল $C_{20}H_{29}OH$; দুধ, মাখন, তাজা শাকসব্জি, মাছের তেল প্রভৃতিতে আছে। খাদ্যে এর অভাব ঘটলে রাত-কানা রোগ হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, গাত্রচর্ম তৈল-হীন খস্‌খসে হয়।

ভিটামিন বি —সমপর্যায়ের অনেক-গুলো পদার্থ বুঝায়; একসঙ্গে বলা হয় ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্স। ভিটামিন-বি$_1$ (অ্যানিউরিন বা থায়া-মিন) গম, চাউল প্রভৃতি খাদ্য-শস্যের বহিরাবরণে থাকে; অভাবে শক্তিহীনতা, অগ্নিমান্দ্য ও বেরি-বেরি রোগ জন্মায়। ভিটামিন-বি$_2$ (ল্যাক্টোফ্লেবিন বা রিবোফ্লেবিন) দুধ, ডিম প্রভৃতিতে থাকে; অভাবে চর্মরোগ হয়, শিশুরা উপযুক্তরূপে বাড়ে না। ভিটামিন-বি$_{12}$ (ফোলিক অ্যাসিড) লালচে স্ফটিকাকার পদার্থ। কোন কোন তাজা শাক সব্জিতে, জীবজন্তুর লিভারে ও ঈষ্টে ↑ পাওয়া যায়; অভাবে দেহে রক্তাল্পতা ঘটে।

ভিটামিন-সি (অ্যাস্করবিক অ্যাসিড্) টাট্‌কা শাকসব্জি ও ফলের রসে থাকে। অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

ভিটামিন-ডি (ক্যাল্‌সিফেরল) বিভিন্ন মাছের যকৃতের তেলে থাকে। সূর্য-কিরণের প্রভাবে মানুষের দেহে স্বভাবতঃই জন্মায়; ফলে খাদ্যের ক্যালসিয়াম দেহে গৃহীত হয়। এর অভাবে হাড় শক্ত হয় না; বিশেষতঃ শিশুরা রিকেট রোগে ভোগে।

ভিটামিন-ই বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল ও শাকসব্জিতে থাকে; অভাবে স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যা হয়, প্রজনন-শক্তি লোপ পায়।

ভিটামিন-এইচ (বায়োটিন) জীবজন্তুর লিভারে ও ঈষ্টে ↑ থাকে। কাঁচা ডিমের শ্বেত অংশ খেলে (টক্স্যামিন ↑) নষ্ট হয়ে যায়। অভাবে বিভিন্ন চর্মরোগ জন্মায়।

ভিটামিন-কে স্বভাবতঃই মানুষের দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়। টাট্‌কা মাখনে ও উদ্ভিদের সবুজ পাতায় থাকে। অভাবে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা লোপ পায়,—কেটেকুটে গেলে অজস্র রক্তপাত হতে থাকে।

এগুলো ছাড়া বিভিন্ন খাদ্যে আরও নানা রকম ভিটামিন আছে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ বিচার ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে নানা রকম নতুন নতুন ভিটামিন ক্রমে আবিষ্কৃত হচ্ছে।

ভিট্রিয়ল — কন্সেন্ট্রেটেড্ সালফিউরিক অ্যাসিডকে (H_2SO_4) অয়েল অব ভিট্রিয়ল ↑ বলে। আবার বিভিন্ন সালফেট সল্ট ↑ বর্ণানুসারে বিভিন্ন ভিট্রিয়ল নামে পরিচিত; যেমন— ব্লু-ভিট্রিয়ল হোল কপার সালফেট, $CuSO_4.5H_2O$; গ্রিন-ভিট্রিয়ল হোল ফেরাস সালফেট $FeSO_4.7H_2O$; হোয়াইট ভিট্রিয়ল জিঙ্ক সালফেট, $ZnSO_4.7H_2O$; এরূপ ভিট্রিয়ল সল্টগুলো সবই স্ফটিকাকার — প্রত্যেকটারই ওয়াটার অব ক্রিস্টালিজেসন ↑ আছে।

ভিব্রিও — বক্রাকার রোগ-জীবাণু; এদের দেহ কাঠির মত লম্বা, কাজেই এ-রকম ব্যাক্টেরিয়াকে সাধারণভাবে বলে ব্যাসিলাস ↑। বিভিন্ন ব্যাসিলাসের মধ্যে আবার বক্র আকারেরগুলোর বিশেষ নাম ভিব্রিও। সাঁতার কাটার সুবিধার জন্যে এদের দেহের পশ্চাতে সূক্ষ্ম একটা লেজের মত থাকে।

ভিব্রিয়ো
1000 গুণ বর্ধিত

কলেরার কমা-ব্যাসিলাসও বিশেষ এক রকম ভিব্রিও।

ভিনিগার — বিশেষ এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে বিয়ার, ওয়াইন প্রভৃতির ইথাইল অ্যালকোহল ↑ অক্সি-ডাইজ্‌ড হয়ে গেঁজে গিয়ে যে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে 3% থেকে 6% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ↑ থাকে। পাশ্চাত্য দেশে খাদ্যদ্রব্যে মেশান হয়।

ভিস্কোসিটি — ঘন তরল পদার্থের আঠালো ভাব; যে ধর্মের জন্মে তরল পদার্থের বিভিন্ন স্তর পরস্পরের সঙ্গে এঁটে থাকতে চায়, সহজে প্রবাহিত হয় না। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই এরূপ পদার্থে প্রবহনের গতি মন্দীভূত হয়ে পড়ে। গাঢ় তেল, জিলেটিন ↑, গঁদের আঠা প্রভৃতির এই ভিস্কোসিটি ধর্ম বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়; এ-রকম পদার্থকে বলে **ভিস্কাস** পদার্থ। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের ভিস্কোসিটি, অর্থাৎ আঠালো ভাব তুলনা মূলকভাবে মাপা যায়, তাকে **ভিস্কোমিটার** বলে।

ভেনম্‌ — জান্তব বিষ; বিষধর সাপের বিষ-দাঁত থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত লালা। বোল্‌তা, ভীমরুল, বিছা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের হুলের বিষকেও ভেনম্‌ বলা হয়।

ভেনাক্যাভা — হৃৎপিণ্ডের ডান-দিকে যে দুটি শিরার পথে দেহের রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌছায়। এদের মধ্যে উপর দিকের শিরাটাকে বলে সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা ও নীচেরটাকে বলে ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা।

ভেনাস — শুক্র গ্রহ। গ্রহটা পৃথিবী ও বুধগ্রহের কক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী নিজস্ব একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় 6 কোটি 70 লক্ষ মাইল। পৃথিবীর হিসেবে 225 দিনে শুক্রগ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 225 দিন। পৃথিবীর চেয়ে এর উপরিভাগের উত্তাপ সম্ভবতঃ বেশী। এর চারদিকে কোন বায়ুমণ্ডল আছে বলে মনে হয় না; সম্ভবতঃ মেঘের মত কোনরূপ বাষ্পীয় আবরণে পরিবেষ্টিত রয়েছে।

ভ্যানিসিয়ান হোয়াইট — সম-পরিমাণ হোয়াইট লেড ↑, [$2PbCO_3 . Pb(OH)_2$], ও বেরিয়াম সালফেটের ($BaSO_4$) সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রিত পদার্থ তেলে মিশিয়ে উৎকৃষ্ট সাদা রং (পেইন্ট) তৈরী হয়ে থাকে।

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ — এক প্রকার প্রাণীভুক্‌ উদ্ভিদ। এর সাদা ফুল ফোটে, পাতাগুলো আঠালো

পাতার উপর কীট পতঙ্গ পড়লে ফাঁদের মত আবদ্ধ হয়ে মারা যায়; উদ্ভিদটা ধীরে ধীরে সেটাকে জীর্ণ করে আত্মসাৎ করে ফেলে।

ভেক্টর — যে রাশি রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। রাশির পরিমাণ রেখার দৈর্ঘ্যে, ও স্বরূপ বা দিক রেখাটার কৌণিক অবস্থান দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। কোন লোক ঘণ্টায় 5 মাইল বেগে ছুটছে; এখানে '5 মাইল' এই রাশিটাকে ভেক্টর রাশি বলা হবে; যেহেতু 5 ইঞ্চি একটা রেখা টেনে (এক ইঞ্চি= এক মাইল ধরে) এর পরিমাণ প্রকাশ করা যায়; আবার ওই অঙ্কিত সরল রেখার দিক, বা অবস্থান দেখে লোকটির গতিপথ, বা দিক নির্দিষ্ট হতে পারে। এভাবে দুটি ভেক্টর রাশি যদি কোন ত্রিভুজের সন্নিহিত দুটি বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হয়, তবে ওদের সমষ্টিগত ভেক্টর রাশি প্রকাশিত হবে ওই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দ্বারা।

ভেক্টর — রোগ-জীবাণুর বাহক। মশা, মাছি, ইঁদুর প্রভৃতিকে ভেক্টর বলা হয়; কারণ, এরা রোগীর দেহ থেকে রোগ-জীবাণু বহন করে নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত করে।

ভেপার — পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থা; যে অবস্থায় তাপ অক্ষুণ্ণ রেখে কেবলমাত্র তার চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থটাকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ, গ্যাসীয় বা বায়বীয় অবস্থায় পদার্থের তাপ তার নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের ↑ কম হলে তাকে বলে ভেপার; কারণ, তখন কেবল মাত্র চাপ বৃদ্ধি করেই পদার্থটাকে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করা চলে; যেমন—পেট্রলের বাষ্প, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

ভেপার প্রেসার — উপযুক্ত উত্তাপে সব তরল পদার্থই বাষ্পীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। পদার্থের এই বাষ্পীয় অবস্থায় তার অণুগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি হ্রাস পায়। আবদ্ধ পাত্রে এই বাষ্প ক্রমাগত জমলে পাত্রের গায়ে চাপ দিতে থাকে; এই বাষ্পীয় চাপ ক্রমে শেষে চরমে পৌছায়। এই সর্বোচ্চ চাপ নির্ভর করে পদার্থের গঠন ও তাপমাত্রার উপর। পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ ওই বাষ্পে সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড ↑) হয়ে ওঠে, এর পরে আর অধিক বাষ্প পাত্রের অভ্যন্তরে জমতে পারে না; অতিরিক্ত বাষ্প তরল

হয়ে যায়। এই অবস্থায় তার ওই সর্বোচ্চ চাপকে বলে সম্পৃক্ত বাষ্পীয় চাপ, বা স্যাচুরেটেড ভেপার প্রেসার।

ভেলোসিটি — গতিবেগ, বা গতির হার; গতিশীল কোন বস্তু কোন একক সময়ে একই দিকে যতটা পথ অতিক্রম করে। একটা ট্রেন ঘণ্টায় 30 মাইল বেগে ছুটছে; এখানে 'ঘণ্টায় 30 মাইল' এই হোল ট্রেন-টার ভেলোসিটি, বা গতিবেগ।

ভেলোসিটি (রিলেটিভ) — তুলনামূলক, বা আপেক্ষিক গতিবেগ; কোন বস্তুর গতিবেগ অপর কোন বস্তুর গতি বা স্থিতির তুলনায় যেরূপ অনুমিত হয়। মনে করা যাক্, 'ক' ও 'খ' দুটা ট্রেন পাশাপাশি একই দিকে ছুটছে — 'ক' ঘণ্টায় 20 মাইল ও 'খ' ঘণ্টায় 15 মাইল ভেলোসিটি নিয়ে চলছে। ক'এর গতি খ'এর তুলনায় ('খ' থেকে) মনে হবে যেন ঘণ্টায় 5 মাইল; এই হোল ক'এর রিলেটিভ ভেলোসিটি। দুটা বস্তুর গতিবেগ যদি কোন ত্রিভুজের দুটা সন্নিহিত বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হয় (ভেক্টর রাশি ↑), তবে বস্তু দুটার রিলেটিভ ভেলোসিটি ওই ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দ্বারা প্রকাশিত হবে।

ভেসেলিন — পেট্রোলিয়াম জেলি, বা পেট্রোলেটাম ↑।

ভ্যাক্‌সিন — বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণ রোধ করবার জন্যে সেই রোগাক্রান্ত জীবের দেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিস্তেজীকৃত যে জীবাণু-রস নিয়ে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করান হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে ভ্যাকসিনেসন বা টিকা দেওয়া। গো-বসন্তের ওইরূপ জীবাণু-রস নিয়ে বসন্তের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থাই সর্বপ্রথম হয়েছিল; তাই ভ্যাকসিন কথাটার উদ্ভব হয়েছে। ডাঃ জেনার এরূপ বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন; পরে বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর টিকা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রবর্তন করেছেন। পূর্বে কেবল জীবিত রোগ-জীবাণু নিয়ে টিকা দেওয়া হোত। আজকাল দেখা গেছে, মৃত বা নিস্তেজ জীবাণু ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

ভোল্ট — বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের একক বিশেষ। তড়িৎ-পরিবাহী তারের দুই প্রান্ত, অথবা যে কোন দুই স্থানের মধ্যে তড়িৎ-বিভবের পার্থক্য এক ভোল্ট হবে, যদি ওদের মধ্যে এক কুলম্ব ↑ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে এক

জুল↑ শক্তি বা এনার্জি প্রকাশ পায়। সাধারণ ষ্টোরেজ ব্যাটারির↑ ভোল্টেজ প্রায় 2 ভোল্ট, সাধারণ টর্চ লাইটের সেলের↑ প্রায় 1¼ ভোল্ট হয়ে থাকে। কলকাতা শহরে বাড়ী বাড়ী যে তড়িৎ সরবরাহ হয় তা 220 ভোল্টের। এই তড়িৎ-চাপ বা ভোল্টেজ দ্বারা ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স↑ এবং পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স↑ (P.D.) উভয়েই পরিমিত হয়ে থাকে।

ভোল্টমিটার — বৈদ্যুতিক চাপ পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে তড়িতাবিষ্ট দুই স্থান, বা বস্তুর মধ্যে তড়িৎ-বিভবের বৈষম্য, অর্থাৎ পোটেন্সিয়্যাল ডিফারেন্স↑ মাপা হয়। ইটালীয় বিজ্ঞানী ভোল্টা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। মোটামুটি এটা অ্যামমিটার↑ যন্ত্রের অনুরূপ, কেবল এর মধ্যে উচ্চ তড়িৎ-প্রতিবন্ধক (রেজিষ্টেন্স) সন্নিবিষ্ট হয় এবং স্কেলে ভোল্ট↑ এককের দাগ কাটা থাকে।

ভোল্টামিটার — কোন প্রবাহ-পথে তড়িৎ-শক্তির পরিমাণ স্থির করবার এক রকম যন্ত্র। মূলতঃ যন্ত্রটা হোল একটা ইলেক্ট্রোলিটিক সেল↑ মাত্র। এর কপার, বা সিলভার সল্টের দ্রবের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ইলেক্ট্রোলিসিস↑ প্রক্রিয়ায় ওই সল্টের ধাতব আয়ন↑ বিমুক্ত হয়ে যায়। ওই বিমুক্ত ধাতু-কণিকাগুলো গিয়ে ক্যাথোডের↑ গায়ে সঞ্চিত হতে থাকে। ক্যাথোডের ওজন বৃদ্ধি থেকে বিমুক্ত ধাতুর পরিমাণ সহজেই স্থির করা যায়। এ থেকে তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি বা পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ভোলেটাইল — উদ্বায়ী; বায়ুমণ্ডলের সাধারণ তাপ ও চাপেই যে সব কঠিন বা তরল পদার্থ দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়। উদ্বায়ী পদার্থের ভেপার প্রেসার↑ স্বভাবতঃই হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে বেশী; কাজেই এরূপ বাষ্পীভবন সম্ভব হয়ে থাকে। পেট্রল↑, অ্যালকোহল↑, কর্পূর প্রভৃতি এরূপ ভোলেটাইল পদার্থ; কিন্তু সাধারণ তেল, জল, পারদ প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় তেমন বাষ্পীভূত হয় না; কাজেই এ-গুলো ভোলেটাইল নয়।

ভ্যাকুয়াম — শূন্য স্থান; যে স্থানে বায়ু, গ্যাস, বা অপর কোন পদার্থের কোন অণু-পরমাণু কিছুমাত্র নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য এরূপ শূন্যস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এজন্যে মোটামুটি সম্ভাব্যরূপে বায়ু বা গ্যাস শূন্য স্থানকেই সাধারণতঃ

ভ্যাকুয়াম বলা হয়। বায়ু-নিষ্কাশক পাম্পের সাহায্যে আবদ্ধ স্থান থেকে বায়ু বা গ্যাস নিষ্কাশিত করে এরূপ ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্যে গ্যাসীয় চাপ অতি সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। রেডিও ভালব ↑, ক্যাথোড-রে টিউব ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্র এরূপ ভ্যাকুয়াম করে নেওয়া হয়।

ভ্যাট্-ডাই — যে সব রঞ্জক পদার্থে বস্ত্রাদি রঙীন করবার জন্যে কোন মরড্যাণ্টের ↑ প্রয়োজন হয় না। রং ধরাবার জন্যে সাধারণতঃ বস্ত্রাদি আগে কোন রাসায়নিক দ্রবে (মরড্যাণ্ট ↑) ভিজিয়ে নিতে হয়; কিন্তু ভ্যাট্-ডাই জাতীয় রঞ্জক পদার্থে সেরূপ করা দরকার হয় না। নীল প্রভৃতি বিভিন্ন কৃত্রিম রং এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ। যে পাত্রে বস্ত্রাদি ডুবান হয় তাকে বলে ভ্যাট।

ভ্যানাডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; পারমাণবিক ওজন 50·95, পারমাণবিক সংখ্যা 23; অত্যন্ত কঠিন সাদা ধাতু। কোন কোন দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) তৈরী করবার প্রক্রিয়ায় এর অক্সাইড ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে কখন কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ এক শ্রেণীর ইস্পাত তৈরী করতেও সামান্য ভ্যানাডিয়াম ধাতু মিশ্রিত করা হয়।

ভ্যালেন্সি — বিভিন্ন পরমাণুর পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা। কোন মৌলিক পদার্থের একটা পরমাণু অপর কোন মৌলিক পদার্থের যতগুলো পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, ও যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেই সংখ্যাটি হোল ওই পদার্থ বিশেষের ভ্যালেন্সি। হাইড্রোজেন মনোভ্যালাণ্ট ↑ : এজন্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মৌলিকের এই ভ্যালেন্সি সংখ্যা নির্ণীত হয়ে থাকে। কোন মৌলিকের একটি পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, বা যে-কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্যুত করে তার স্থান অধিকার করতে পারে, সেই সংখ্যাকে বলে ওই মৌলিক পদার্থের ভ্যালেন্সি। এভাবে যে মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে, তাকে বলে **মনোভ্যাল্যাণ্ট এলিমেণ্ট**; দুইটির সঙ্গে যুক্ত হলে বলা

হয় **ডাইভ্যাল্যান্ট** ; এরূপ ট্রাই-ভ্যাল্যান্ট, টেট্রাভ্যাল্যান্ট ইত্যাদি। একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটা ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl, সৃষ্টি হয়, —কাজেই ক্লোরিন মনোভ্যাল্যান্ট। একটা অক্সিজেন পরমাণু দুটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে মিলে হয় জল, H_2O ; কাজেই অক্সিজেন ডাইভ্যাল্যান্ট। এভাবে অ্যামোনিয়া ↑, NH_3, থেকে বুঝা যায়, নাইট্রোজেন ট্রাইভ্যাল্যান্ট ; মিথেন গ্যাস, CH_4, থেকে—কার্বন টেট্রাভ্যাল্যান্ট, ইত্যাদি।

আবার, সব মৌলিক পদার্থই যে হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হবে, এমন কোন কথা নেই। সে ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভ্যালেন্সি সংখ্যা নির্ণীত হয়। ক্লোরিন মনোভ্যাল্যান্ট ; একটা সোডিয়াম পরমাণুর সঙ্গে মিলে হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl (লবণ) ; সুতরাং সোডিয়াম ধাতুও মনোভ্যাল্যান্ট। প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি নির্দিষ্ট ; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মৌলিকের দু-রকম ভ্যালেন্সিও হতে পারে ; যেমন—আয়রন (লোহা) ফেরাস ↑ সল্টে ($FeCl_2$) হয় ডাইভ্যাল্যান্ট ; এবং ফেরিক ↑ সল্টে ($FeCl_3$) হয় ট্রাইভ্যাল্যান্ট।

মৌলিক পদার্থের পরমাণুর এই সংযোগ-ক্ষমতা, বা ভ্যালেন্সিকে হাতের মত কল্পনা করা হয়, যেন পরমাণুগুলো হাতে হাতে মিলিয়ে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। যে পরমাণুর যত ভ্যালেন্সি তার যেন ততটা হাত, একেই সাধু ভাষায় বলে ভ্যালেন্সি-বণ্ড।

ম

মন্‌অ্যাড্‌ — যে মৌলিক পদার্থের ভ্যালেন্সি ↑ এক। মনোভ্যাল্যান্ট ↑, বা ইউনিভ্যাল্যান্ট এলিমেন্ট ↑।

মনোকটিলিডন — এক-বীজপত্রী উদ্ভিদ। ধান, গম প্রভৃতি শস্যের একটি মাত্র বীজপত্র থাকে, অর্থাৎ শস্য-বীজটা ভাঙতে গেলে তেঁতুল-বীজের (ডাইকটিলিডন) মত দু-ভাগ হয়ে যায় না। কাজেই এদের বলে মনোকটিলিডন।

মনোক্রোমেটিক লাইট — এক বর্ণের আলোক ; যে আলোকরশ্মি একই স্পন্দন ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ প্রবাহের (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑ ওয়েভ) ফলে উদ্ভূত হয়। সূর্যালোক, প্রদীপের শিখা প্রভৃতির সাদা আলোক মনোক্রোমেটিক নয় ; কারণ, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-

স্পন্দনের সংমিশ্রিত প্রবাহের ফলে এরূপ সাদা আলোর সৃষ্টি হয়। এজন্যে প্রিজ্‌মের ↑ মধ্য দিয়ে সাদা আলোক-রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালীর (স্পেক্‌ট্রাম ↑) সপ্ত-বর্ণ দেখা যায়। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি এক-বর্ণী আলোকরশ্মি মনোক্রোমেটিক।

মনোটাইপ — এক রকম মুদ্রণ যন্ত্র; যাতে ছাপার অক্ষরগুলোর আলাদা আলাদা টাইপ বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত হয়ে লাইনে সাজিয়ে ছাপা হয়। শব্দের অক্ষরগুলো প্রথমে কাগজের লম্বা ফালির মধ্যে যান্ত্রিক কৌশলে কাটা হয়। ওই কাগজ যন্ত্রের মধ্যে দিলে কাটা অক্ষরগুলোর টাইপ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে। সেগুলো পরে লাইনে সাজিয়ে ছাপার কাজ হয়।

মণ্ড্‌ গ্যাস — প্রায় 650° সেন্টি-গ্রেডে উত্তপ্ত কয়লার উপর বায়ু ও জলীয় বাষ্পের প্রবাহ চালিয়ে যে দাহ্য গ্যাসীয় সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত থাকে। একে কখন কখন ওয়াটার গ্যাস ↑ বলা হয়।

মনোভ্যালান্ট — এক ভ্যালেন্সি-বিশিষ্ট পদার্থ। যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভ্যালেন্সি ↑ এক, একে ইউনিভ্যালান্ট এলিমেন্ট. বা মন্‌অ্যাড্‌ও ↑ বলে।

মনোমার — যে সব রাসায়নিক পদার্থ তাদের প্রাথমিক অণুর অবিমিশ্র একক সমবায়ে গঠিত। মনোমার রাসায়নিক পদার্থের একাধিক অণু পরস্পর সংবদ্ধ হয়েই পলিমার ↑ পদার্থের মিশ্র-অণুর সৃষ্টি হয়; যেমন—অ্যাসি-ট্যাল্ডিহাইড, CH_3CHO, একটি মনোমার পদার্থ; কিন্তু প্যারাল্ডি-হাইডের, $(CH_3CHO)_3$, একটি অণু মনোমার অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের তিনটা অণু সংবদ্ধ হয়ে গঠিত হয়; কাজেই এটাকে বলা হয় পলিমার (পলিম্যারিজেসন ↑) সাধারণ রাসায়নিক যৌগিক মাত্রই মনোমার।

মর্টার — (1) রসায়নাগারে বিভিন্ন পদার্থ চূর্ণ করবার জন্যে কঠিন পাথরের তৈরী যে পাত্র ব্যবহৃত হয়। ওর পেষন দণ্ডটাকে বলে পেসল। বাংলায় সাধারণতঃ একে বলে খল। (2) বাড়ী তৈরী

মর্টার ও পেসল

করতে চূণ, **সিমেন্ট** ↑ ও বালির যে জলীয় সংমিশ্রণ দিয়ে ইট গাঁথা হয়। ওই সব উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মর্টার তৈরী হয়ে থাকে।

মর্ফিন — একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑ বা উপক্ষার, $C_{17}H_{19}O_3N$; উদ্ভিজ্জ পদার্থ, আফিম থেকে পাওয়া যায়। সাদা, কঠিন ও বিষাক্ত পদার্থ; কিন্তু উপযুক্ত মাত্রায় যন্ত্রণা উপশমের জন্যে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেবনে (বা ইন্‌জেকসনে) গভীর নিদ্রা ও অচৈতন্য ভাব দেখা দেয়। কিছু দিন ব্যবহারে নেশার মত মারাত্মক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

মর্ফিয়া — মর্ফিন ↑।

মরড্যাণ্ট — বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে যে-সব পদার্থের দ্রবে সেগুলো আগে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। রঞ্জক পদার্থটা অ্যাসিড-ধর্মী হলে মরড্যাণ্টটা হয় সাধারণতঃ বেসিক ↑ (ধাতব হাইড্রক্সাইড) পদার্থ। আবার রঞ্জক পদার্থ বেসিক-ভাবাপন্ন হলে মরড্যাণ্টটা অ্যাসিড জাতীয় হয়ে থাকে। বস্ত্রাদি মরড্যাণ্টের দ্রবে ভিজালে ওর সূক্ষ্ম কণিকাগুলো বস্ত্রের তন্তুর মধ্যে ঢুকে যায়, যার সঙ্গে রঞ্জক পদার্থের রাসায়নিক মিলনের ফলে অদ্রাব্য রঙীন পদার্থ সৃষ্টি হয়। ওই অদ্রাব্য বর্ণকণিকাগুলো বস্ত্রে এঁটে গিয়ে রং পাকা হয়ে থাকে।

মর্ফোলজি — জীব জগতের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন ও আকৃতিগত ক্রমবিকাশ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। কোন জীবের পরিণত অবয়ব ধারণ করবার প্রক্রিয়াকে বলে মর্ফোসিস।

মল্ট — বার্লি, চাউল, গম প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের চূর্ণ জলে ভিজিয়ে রাখলে এক রকম এন্‌জাইমের ↑ প্রভাবে তা গেঁজে যায়; এ কে উ ত্ত প্ত ক রে শুকিয়ে নিলে মল্ট তৈরী হয় (ক্রুয়িং ↑)।

মল্টেস্‌ — ঈস্ট ↑ ও বিভিন্ন জীবাণু থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ, বা বিশেষ এক রকম এন্‌জাইম ↑। এর প্রভাবে মল্টের জলীয় মিশ্রণের মধ্যস্থ মল্টোজ ↑, বা মল্ট-সুগার নামক শর্করা হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মল্টোজ — এক রকম শর্করা, যাকে মল্ট-সুগারও বলা হয়। রাসায়নিক হিসেবে $C_{12}H_{22}O_{11}$; কঠিন স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। সাধারণ ইক্ষু চিনি অপেক্ষা এর মিষ্টত্ব কিছু কম। ডায়েস্টেস ↑ নামক এন্‌জাইমের

রাসায়নিক ক্রিয়ায় মণ্টের ↑ শ্বেতসার এরূপ মণ্টোজে পরিণত হয়।

মলিকিউল — অণু; পদার্থের বিভিন্ন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ (ভ্যালেন্সি ↑) হয়ে অণুর সৃষ্টি হয়। মৌলিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম (সাধারণ হিসেবে) অংশকে বলে পরমাণু, বা অ্যাটম; বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত অণু, বা মলিকিউল হোল যোগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। অবশ্য মৌলিক পদার্থেরও অণু থাকে। যেমন— H_2, হাইড্রোজেনের একটা অণু, যা দুটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে গঠিত হয় যৌগিক পদার্থের অণু; যেমন— H_2O, জলের একটা অণু।

মলিকিউলার ওয়েট — আণবিক ওজন; কোন পদার্থের অণুর সংগঠক পরমাণুগুলোর ওজনের (অ্যাটমিক ওয়েট ↑) সমষ্টি। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন 16 ধরে নিয়ে কোন মৌলিক পদার্থের একটি অণুর ওজন আনুপাতিক হিসেবে যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মাইকা — অভ্র, আঁভ; কাচের মত স্বচ্ছ এক রকম কঠিন খনিজ পদার্থ। জিনিসটার গঠন এরূপ যে স্তরে স্তরে খুলে ফেলা যায়। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তড়িৎ-রোধক পদার্থ (ইন্সুলেটর ↑) হিসেবে অভ্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাইক্রন — এক মিটারের ↑ দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

মাইক্রো — অতি ক্ষুদ্র; বিভিন্ন শব্দের পূর্বে কথাটা ব্যবহার করে ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করা হয়; যেমন— মাইক্রোস্কোপ ↑, মাইক্রোমিটার ↑ ইত্যাদি। **মাইক্রোফ্যারাড** বলতে এক ফ্যারাড ↑ তড়িতের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বুঝায়।

মাইক্রোফোন — যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দতরঙ্গ বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করা হয়। টেলিফোন ↑ রেডিও ↑ প্রভৃতির প্রেরক-যন্ত্রে এর সাহায্যে উৎপন্ন তড়িৎ-স্পন্দন ধাতব তারের মাধ্যমে, বা বেতার-তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে পৌছায়। ওই তড়িৎ-স্পন্দনকে পুনরায় শব্দ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করে কথাবার্তা শ্রুতিগোচর হয়। সাধারণ মাইক্রোফোনে আলগাভাবে কার্বনের গুঁড়া-ভর্তি একটা পাত্রের মুখে একটা ডায়াফ্রাম ↑ সংলগ্ন থাকে। শব্দ-তরঙ্গের প্রভাবে ওই ডায়াফ্রামটা আন্দোলিত হলে কার্বনের গুঁড়া-গুলোও তদনুযায়ী কম্পিত হতে থাকে। এই কম্পনের তারতম্যের ফলে ওই কার্বন-গুঁড়ার মাধ্যমে

প্রবাহিত তড়িৎ-স্রোতের পথে প্রতিবন্ধকতার তারতম্য ঘটে। এই তারতম্য অনুযায়ী প্রেরক-যন্ত্রের বৈদ্যুতিক প্রভাবে গ্রাহক-যন্ত্রের ডায়াফ্রামটা কম্পিত হতে থাকে; ফলে, প্রেরক-যন্ত্রের শব্দতরঙ্গের অনুরূপ শব্দতরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রেও সৃষ্টি হয়। অবশ্য আরও নানারকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন গঠনের মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাইক্রোমিটার — এক রকম যন্ত্র; যার সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য, বা সূক্ষ্মতম কোণের পরিমাণও এতে মাইক্রোস্কোপের ↑ সাহায্যে নির্ণীত হয়ে থাকে। সাধারণ **মাইক্রোমিটার গেজ** হোল এক রকম যন্ত্র, যা দিয়ে সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্যের মাপ সঠিকভাবে করা যায়। এর বাঁকানো অংশের এক প্রান্ত যে দণ্ডের সঙ্গে স্ক্রু-র প্যাঁচে সংবদ্ধ থাকে, তার গায়ে ওই স্ক্রু-র প্যাচের হিসেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে। স্ক্রু ঘুরিয়ে এ-দিয়ে দৈর্ঘ্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পর্যন্ত মাপা সম্ভব হয়।

মাইক্রোমিটার গেজ.

মাইক্রোস্কোপিক সল্ট — সোডিয়াম অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট, $NaNH_4 \cdot HPO_4 \cdot 4H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। উত্তাপে বোর‍্যাক্সের ↑ মত এরও স্বচ্ছ দানা তৈরী হয়।

মাইক্রোস্কোপ — অণুবীক্ষণ যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র পদার্থও বর্ধিতাকারে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস-ও এক রকম সাধারণ মাইক্রোস্কোপ পর্যায়ভুক্ত; কারণ, এর উত্তল (কন্‌ভেক্স) লেন্সের ↑ মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র পদার্থ বর্ধিতাকারে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র হোল কম্পাউণ্ড মাইক্রোস্কোপ; যার মধ্যে আইপিস ↑ ও অব্জেক্টিভ ↑ নামে সাধারণতঃ দুখানা উত্তল লেন্স সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্রষ্টব্য পদার্থ থেকে আলোকরশ্মি অব্জেক্টিভ লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে তার একটা উল্টা প্রতিচ্ছায়া বর্ধিতাকারে যন্ত্রের অভ্যন্তরে ফেলে। (অবশ্য অতি সূক্ষ্ম কোন পাত্‌লা জিনিস দেখতে হলে তার ভিতর দিয়ে সোজাসুজি আলোকরশ্মি ফেলতে হয়।) আইপিস্ লেন্সের ফোক্যাল লেংথের ↑ মধ্যে পড়লে ওই প্রতিচ্ছায়া উল্‌টা অবস্থায়ই আইপিসের ভিতর দিয়ে আরও বর্ধিতাকারে দর্শকের দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। অবশ্য লেন্সের

আরও নানা রকম বিধিব্যবস্থা সহ জটিল গঠনের বিভিন্ন শ্রেণীর মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র আছে।

মাইল্ড স্টিল — অপেক্ষাকৃত নরম ইস্পাত। এর মধ্যে কাঁচা লোহার সঙ্গে কার্বন ও বিভিন্ন ধাতব উপাদান (স্টিল ↑) অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত হয়। গৃহাদির কাঠামো তৈরী করবার কাজে মাইল্ড স্টিল ব্যবহৃত হয়। এ-দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র বা যন্ত্রাদি তৈরী করলে সহজেই ক্ষয়ে যায়; এ-সব কাজে হার্ড স্টিল দরকার।

মাইয়োপিয়া — চোখের স্বল্প দূরত্বের দৃষ্টি-দোষ (সর্ট সাইট ↑)। চক্ষু-গোলকের এই ত্রুটির ফলে নিকটের জিনিস দেখা যায়, কিন্তু কিছু দূরবর্তী পদার্থ পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না। অবতল (কন্‌কেভ) লেন্সের ↑ চশমা ব্যবহারে চোখের এই দোষ সংশোধিত হয়।

মাইয়োসিন — দেহের পেশী-তন্তুর প্রোটিন ↑ জাতীয় প্রধান উপাদান। পদার্থটা জলে দ্রবণীয় নয়, কিন্তু অ্যালকালি ↑ পদার্থের দ্রবে গলে গিয়ে পেশীর মধ্যে এক রকম জেলির ↑ মত জিনিসের সৃষ্টি করে। এর জন্যেই দেহের মাংস-পেশীগুলো সহজেই সংকুচিত প্রসারিত হতে পারে।

মাইসিটিন — বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর দেহ নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ; যার প্রভাবে বিশেষ বিশেষ রোগ-জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ-রকম পদার্থকে **মাইসিন**ও বলে। টাইফয়েড, টাইফাস প্রভৃতি রোগের ঔষধ ক্লোরোমাইসিটিন; যক্ষ্মা, ডিপ্‌থিরিয়া প্রভৃতির ঔষধ স্ট্রেপ্টো-মাইসিন; বিভিন্ন ভাইরাস ↑ ঘটিত রোগে অরিয়োমাইসিন। এগুলো সবই ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত অনুরূপ পর্যায়ের জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

মার্কারি—বুধ গ্রহ; সৌর পরিবারের গ্রহগুলোর মধ্যে এই গ্রহটা সূর্যের নিকটতম কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে মাত্র 3 কোটি 60 লক্ষ মাইল; আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ঊনত্রিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সম্ভবতঃ এর উপরিভাগ প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং এর কোন বায়ুমণ্ডল নেই। পৃথিবীর 88 দিনে বুধ গ্রহের বছর হয়, অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর লাগে আমাদের 88 দিন।

মার্কারি — পারা, পারদ। মৌলিক তরল ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Hg, পারমাণবিক গুরুত্ব

200·61 ; পারমাণবিক সংখ্যা 80 ; রৌপ্যের মত সাদা ভারী পদার্থ। স্বাভাবিক তাপ ও চাপে পারদই একমাত্র তরল ধাতু। সিনাবার ↑ নামক খনিজ মার্কারি-সালফাইড, HgS, আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করে তার মধ্যে বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে বিশুদ্ধ পারদ নিষ্কাশিত করা হয়। থার্মোমিটার ↑ ব্যারোমিটার ↑ ম্যানোমিটার ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন সংকর ধাতু (অ্যামাল্‌গাম ↑) বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন হয়। পারদের যৌগিক পদার্থগুলো সাধারণতঃ বিষাক্ত, কিন্তু ক্যালোমেল, (মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড, Hg_2Cl_2,) প্রভৃতি কতকগুলো আবার ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কারি কম্পাউণ্ড — পারদের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। যৌগিক পদার্থে মার্কারি মনোভ্যালান্ট ↑ ও বাইভ্যালান্ট ↑ দু'রকমেই মিলিত হতে পারে। মনোভ্যালান্ট মার্কারি সল্টকে **মার্কিউরিয়াস** এবং বাইভ্যালান্ট মার্কারি সল্টকে **মার্কিউরিক** সল্ট বলে ; যেমন — মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড, Hg_2Cl_2, (সাধারণতঃ যাকে বলে ক্যালোমেল) বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আবার মার্কিউরিক ক্লোরাইড, $HgCl_2$, (সাধারণতঃ যা করোসিভ সাব্লিমেট নামে পরিচিত) কীটপতঙ্গ নাশক বিষাক্ত পদার্থ। ভার্মিলিয়ন ↑ বা সিন্দুর হোল মার্কিউরিক সালফাইড, HgS ; আয়ুর্বেদীয় বিশিষ্ট ঔষধ মকরধ্বজ বা স্বর্ণ-সিন্দুর গন্ধক ও পারার রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন এক প্রকার সালফাইড সল্ট ; এর মধ্যে সোনা থাকে না, সোনা মাত্র ক্যাটালিস্ট ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মার্কারি ভেপার ল্যাম্প — পারদ-বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে নীলাভ তীব্র আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এজন্যে ইলেক্ট্রিক বাল্ব বা টিউবের মধ্যে পারদের বাষ্প ভর্তি করে এক রকম ল্যাম্প তৈরী হয়ে থাকে। এর আলোকে প্রচুর অতি-বেগুনী (আলট্রা-ভায়োলেট ↑) রশ্মির উদ্ভব হয়। এজন্যে কৃত্রিম সূর্য-রশ্মির চিকিৎসায় এইরূপ আলোক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্গেরিন — উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজাত তৈল ও চর্বির সংমিশ্রণে তৈরী মাখন-সদৃশ এক রকম খাদ্য বস্তু। এর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে দুধ মেশান হয় ; জীবাণুর প্রভাবে

ওই দুধ বিকৃত হয়ে মাখমের মত গন্ধ বোরায়। এর পরে ওর মধ্যে বিভিন্ন ভিটামিন ↑ ও উপযুক্ত রং মিশিয়ে ব্যবহারোপযোগী মার্গেরিন তৈরী হয়ে থাকে।

মারস — মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী ও বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা কক্ষপথে গ্রহটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য থেকে এর দূরত্ব গড়ে প্রায় 14 কোটি 15 লক্ষ মাইল। আয়তনে পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীর চাঁদের মত দুটা উপগ্রহ মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে। এর বছর আমাদের 687 দিনে হয়; অর্থাৎ পৃথিবীর 687 দিনে মঙ্গল গ্রহ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর উপরিভাগ অত্যন্ত ঠাণ্ডা, প্রায় শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে। মঙ্গল গ্রহের এক রকম বায়ুমণ্ডল আছে বলে মনে হয়; কিন্তু কোন জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মার্স গ্যাস — মিথেন গ্যাস, CH_4; একে ফায়ার ড্যাম্পও ↑ বলে। এটা প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর প্রথম হাইড্রোকার্বন ↑; বর্ণহীন গন্ধহীন অদৃশ্য দাহ্য গ্যাস। বায়ুর সংমিশ্রণে এতে অগ্নি-সংযোগ ঘটলেই সহসা জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ বিভিন্ন জৈব পদার্থাদি পচে এই গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে; জলাভূমি, বিশেষতঃ কয়লার খনিতে মার্স গ্যাস উদ্ভূত হয়।

মাস্ — পদার্থের ভর; বা নেট বস্তু-পরিমাণ। কোন বস্তুর উপর শক্তি প্রয়োগ করলে তার এই ভরের অনুপাতে বস্তুটার গতি-বেগের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। আবার কোন বস্তুর ওজন তার ভরের আনুপাতিক হয়ে থাকে। এজন্য কোন বস্তুর ভর সাধারণতঃ তার ওজনের সাহায্যে নির্ণীত হয়; যেমন —এক পাউণ্ড ↑ মাস্ বললে বুঝতে হবে বস্তুটার ওজন এক পাউণ্ড।

মাস্ স্পেক্ট্রোগ্রাফ — এক রকম যন্ত্র; যার সাহায্যে বিভিন্ন ভরের ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন ↑ কণিকাগুলো ভরের ক্রমানুসারে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম ↑ ধাতু 234, 235 এবং 238 ভর-বিশিষ্ট বিভিন্ন পরমাণুর সমবায়ে গঠিত; মাস্ স্পেক্ট্রোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে এদের পৃথক করা যায়। কোন পদার্থের পারমাণবিক ওজন, বা বিভিন্ন আইসোটোপের ↑ সঠিক ভর এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে। এর এই প্রক্রিয়াটাকে বলে পজিটিভ-রে অ্যানালিসিস।

মাস্ স্পেক্ট্রাম — মাস্ স্পেক্ট্রোগ্রাফ ↑ যন্ত্রের সাহায্যে ধন-

তড়িতান্বিত আয়ন কণিকার ধারা সম্পাতে এক রকম বর্ণালী (স্পেক্ট্রাম্ ↑) সৃষ্টি করা যায়; এই বিশেষ বর্ণালীকে বলে মাস্-স্পেক্ট্রাম। এর মূল তথ্য প্রদত্ত চিত্র থেকে মোটামুটি বুঝা যাবে। পদার্থের তড়িতাবিষ্ট আয়ন কণিকার
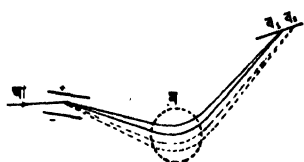
মাস্ স্পেক্ট্রাম

ধারা 'আ'-চিহ্নিত বৈদ্যুতিক প্লেট দুইটার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে নিম্ন দিকে কিছু বেঁকে যায়; এই ধারাপথের লম্বভাবে 'ম'-চিহ্নিত চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করলে ওই ধারা ঊর্ধ্বমুখে বেঁকে গিয়ে পর্দায় $ব_1ব_2$ বর্ণালীর সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন ভরের কণিকাগুলো ফটোগ্রাফিক প্লেট বা পর্দায় বিভিন্ন দূরত্বে ছায়াপাত করে থাকে। মাস্ স্পেক্ট্রামের এই বর্ণালী রেখার সংস্থান দেখে বিভিন্ন ভরের কণিকার অস্তিত্ব পৃথকভাবে নিরূপণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিচিত্র কৌশলে বহু দূরবর্তী জ্যোতিষ্কগুলোর উপাদান সমূহের স্বরূপ পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে।

মার্কেসাইট — আয়রন ডাইসালফাইড (আয়রন পাইরাইট্‌স ↑) নামক সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। এর টুকরা চকচকে সাদা পাথরের মত সস্তা অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়।

মিটার — (1) পরিমাপক যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন কিছুর পরিমাণ স্থির করা হয়; যেমন — থার্মোমিটার ↑, ভোল্টমিটার ↑ ব্যারোমিটার ↑ প্রভৃতি। (2) মেট্রিক সিস্টেমে দৈর্ঘ্যের একটা একক; =প্রায় 39·37 ইঞ্চি।

মিটিয়র — উল্কা; মহাশূন্য থেকে যে সব পদার্থ-পিণ্ড মাঝে মাঝে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। একে মিটিওরাইট-ও বলে। দুরন্ত বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করবার সময়ে এই পিণ্ডগুলো বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলতে থাকে। লোকে সাধারণতঃ একে বলে উল্কাপাত। অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলো বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কখন কখন বা পৃথিবীতে এসে পড়ে। এর মধ্যে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, বিশেষতঃ লৌহই বেশীর ভাগ থাকে।

মিটিয়রোলজি — আবহাওয়া বিজ্ঞান; বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন — বায়ুর চাপ, তাপ, আর্দ্রতা, গতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধীয়

বিজ্ঞান। এসব তথ্যাদি থেকে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির পূর্বাভাস পাওয়া যেতে পারে।

মিডিয়ান — কোন ত্রিভুজের যে কোন বাহুর মধ্যবিন্দু থেকে বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা। কাজেই প্রত্যেক ত্রিভুজের তিনটি মিডিয়ান থাকে। এই তিনটি মিডিয়ান যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলে ত্রিভুজের **সেণ্ট্রয়েড।**

মিডিয়াম — মাধ্যম; যে পদার্থের ভিতরে অন্য কোন পদার্থ স্থিত বা পরিচালিত হয়; যেমন—পেইন্ট তৈরী করতে রং-টা তিসির তেলে গুলে নেওয়া হয়; এখানে ওই তেল হোল রং-এর মিডিয়াম। শব্দ-তরঙ্গ বায়ুর সাহায্যে পরিচালিত হয়ে থাকে; কাজেই বাতাস শব্দ-তরঙ্গের মিডিয়াম।

মিথেন — মার্স গ্যাস ↑, CH_4; ফায়ার ড্যাম্প ↑।

মিথিলিন — হাইড্রোকার্বন, (CH_2) র‍্যাডিক্যাল। ইথিলিন ↑, C_2H_4, প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনের মত মিথিলিনের পৃথক অস্তিত্ব নেই। অন্য পদার্থের সঙ্গে এটা মিলিত হয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিকের সৃষ্টি করে থাকে; যেমন, CH_2Cl_2 মিথিলিন ক্লোরাইড। কাজেই এটা মিথিলিন, বা মিথাইল গ্রুপ নামে পরিচিত একটা জৈব র‍্যাডিক্যাল মাত্র।

মিথাইল অ্যালকোহল — পদার্থটা সাধারণতঃ উড্ স্পিরিট ↑, CH_3OH, নামে পরিচিত ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় কাঠ চোলাই করে যে বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থ পাওয়া যায়। একে কখন কখন উড্-ন্যাপথাও ↑ বলা হয়। দ্রাবক পদার্থ হিসেবে ও মেথিলেটেড স্পিরিট ↑ তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শিল্প কাজেও এর নানা রকম ব্যবহার আছে।

মিথাইল কার্বিনল — ইথাইল অ্যালকোহল ↑।

মিথিলিন ব্লু — গাঢ় নীল বর্ণের এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, $C_{66}H_{18}N_3SCl$; জলে দ্রবণীয় রঞ্জক পদার্থ হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ঔষধে ও জীববিদ্যার পরীক্ষা-দিতেও এর ব্যবহার আছে।

মেথিলেটেড স্পিরিট — ইথাইল অ্যালকোহলের ↑ সঙ্গে সাধারণতঃ 5% মিথাইল অ্যালকোহল (উড্-স্পিরিট ↑) মিশিয়ে যে তরল জ্বালানি পদার্থ তৈরী হয়। স্পিরিট ল্যাম্প,

স্টোভ প্রভৃতিতে জ্বালান হয়। দ্রাবক পদার্থ হিসেবে নানা রকম রং, ভার্নিস ↑ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইথাইল অ্যালকোহলকে অপেয় ও বিষাক্ত করবার জন্যেই এর মধ্যে মিথাইল অ্যালকোহল মেশান হয়। কখন কখন মেথিলেটেড স্পিরিটে পাইরিডিন ↑, পেট্রোলিয়াম ↑ প্রভৃতিও সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়ে থাকে।

মউর‍্যাটিক অ্যাসিড — হাইড্রোক্লোরিক ↑ অ্যাসিড, HCl, পূর্বে এই নামে পরিচিত ছিল।

মিউটেশন — আকস্মিক কোন কারণে জীবের সন্তানসন্ততিতে পিতামাতার গুণাবলী থেকে অন্যরূপ নূতন গুণাবলীর বিকাশ। সন্তানে অর্জিত এইরূপ নূতন গুণ, ধর্ম ও স্বভাব পরবর্তী বংশাবলীতে সঞ্চারিত হতে পারে। এক্স-রশ্মির ↑ প্রভাবে কখন কখন এরূপ ঘটে থাকে; কস্‌মিক ↑ রশ্মির জন্যেও এরূপ হওয়া সম্ভব। [সাদা ফুলের গাছে কখন কখন দু-একটা এমন বীজ জন্মে যার গাছে লাল ফুল ফোটে। এই লাল ফুলের গাছে যদি বংশ পরম্পরায় লাল ফুলই ফোটে তবে তাকে **মিউট্যাণ্ট** বলা হয়।]

মিলি — হাজার ভাগের এক ভাগ। এক সহস্রাংশ প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়; যেমন—মিলিগ্রাম, এক গ্র্যামের 1/1000 ভাগ, প্রায় ·0154 গ্রেণ। এইরূপ মিলিমিটার, মিলিলিটার ↑ ইত্যাদি।

মিলি-অ্যাম্‌মিটার — অতি সূক্ষ্ম মাপের অ্যাম্‌মিটার ↑ যন্ত্র; যাতে মিলি-অ্যাম্পিয়ার ↑, অর্থাৎ এক অ্যাম্পিয়ারের হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত তড়িৎ-প্রবাহ মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

মিলিবার — বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিমাপের একক বিশেষ; আবহাওয়া বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 60° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 45° অক্ষাংশের (ল্যাটিটিউড ↑) বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে এক বার বলা হয়; এই চাপ ব্যারোমিটারে ↑ প্রায় 75 সেন্টিমিটার পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান। মিলি-বার হোল এই চাপের হাজার ভাগের এক ভাগ।

মিল্কিওয়ে — গ্যালাক্সি ↑; বাংলায় বলে ছায়াপথ। মহাশূন্যে অনেকটা স্থান জুড়ে যে সাদা আলোকপুঞ্জ দেখা যায়। পরস্পর নিকটবর্তী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র ও গ্যাসীয় পিণ্ডের সমবায়ে এই ছায়াপথ গঠিত। বহু দূরবর্তী বলে ওই ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না, আলোকপুঞ্জ মাত্র দেখা যায়।

মিনারেল — খনিজ পদার্থ; সাধারণতঃ যে সব অজৈব বা ধাতব পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ভূগর্ভে পাওয়া যায়; যেমন—লোহা, দস্তা তামা প্রভৃতি। কয়লা একটা জৈব খনিজ পদার্থ। খনিজ তৈলগুলো প্রধানতঃ জৈব হাইড্রোকার্বন↑। এ-গুলোও অবশ্য খনিজ পর্যায়ভুক্ত; তবে এদের সাধারণতঃ বলা হয় মিনারেল অয়েল, বা প্যারাফিন↑ অয়েল।

মিনারেলোজি — বিভিন্ন খনিজ পদার্থের গঠন, উপাদান, পরিশোধন, বিশ্লেষণ প্রভৃতির বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

মিনিয়াম — রেড লেড↑।

মিরিয়াপড — কেন্নো, বিছা প্রভৃতি যে সব প্রাণীর অসংখ্য পা আছে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওই সব পায়ের সাহায্যে যারা বুকে হেঁটে চলে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের কোন কোন গুলোকে আবার পায়ের সংখ্যানুযায়ী মিলিপেড্ (সহস্র-পদী), সেন্টিপেড্ (শতপদী) প্রভৃতিও বলা হয়।

মিরিয়াপড

মিরেজ্ — মরীচিকা; মরুভূমিতে উত্তপ্ত ও হাল্কা বায়ুর বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছায়া নিকটবর্তী বলে ভ্রম হয়। এ রকম ছায়া উল্টা হয়ে পড়ে; যেন বৃক্ষাদি আকাশ থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। এভাবে দূরবর্তী তরঙ্গায়িত বালুকারাশির এরূপ ছায়া নিকটেই জলাশয়ের মত পরিদৃষ্ট হয়ে মরুভূমিতে পথিকদের বিভ্রান্ত করে।

মেগা — দশ লক্ষ গুণ বুঝাতে কথাটা ব্যবহৃত হয়; যেমন, **মেগা-সাইকল** মানে অল্টার্নেটিং কারেন্টের↑ দশ লক্ষ বার বিবর্তন (পজিটিভ থেকে নেগেটিভ ও নেগেটিভ থেকে পজিটিভ)। সাধারণভাবে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা বৃহদায়তন বুঝাতেও কথাটা ব্যবহৃত হয়; যেমন — **মেগাকোলন** বললে অন্ত্রের কোলন↑ নামক অংশের অত্যধিক বৃদ্ধি বুঝায়।

মেগোম — দশ লক্ষ ওম্↑।

মেটাল — ধাতব পদার্থ। সোনা রূপা, লোহা প্রভৃতি যে সব মৌলিক পদার্থের বিশেষ এক প্রকার ধাতব ঔজ্জ্বল্য আছে, পিটিয়ে পুড়িয়ে যাকে সূক্ষ্ম তার ও পাতে পরিণত করা যায়, এবং সাধারণতঃ যার উত্তাপ ও তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা থাকে। ধাতব পদার্থ মাত্রই অক্সিজেনের

সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে অক্সাইড সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ সকল ধাতুই মোটামুটি ইলেক্ট্রোপজিটিভ ↑ ধর্মবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

মেটালয়েড — যে সব মৌলিক পদার্থের গুণ ও ধর্ম অনেকাংশে ধাতব পদার্থের মত। কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় এদের ধাতুর ন্যায় মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতব পদার্থের সকল গুণ ও ধর্ম এদের থাকে না। আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি ↑ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থকে বলে মেটালয়েড।

মেটাবলিজ্ম — জীবের দেহাভ্যন্তরে যে সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ভুক্ত পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে নূতন নূতন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে, এবং তার ফলে জীব দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়। এইরূপ বিভিন্ন মেটাবলিক প্রক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরে যে সব পদার্থের সৃষ্টি হয় তাদের বলে **মেটাবোলাইট**।

মেটাল্ডিহাইড — অ্যাসিট্যাল্ডিহাইডের ↑ (CH_3CHO) পলিম্যারিজেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কঠিন যৌগিক পদার্থ। জিনিসটা সাদা বিষাক্ত ও দাহ্য; মেটা-ফুয়েল নামে বাজারে বিক্রয় হয়। জ্বালানি হিসেবে ও কীট-পতঙ্গ নাশক পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়।

মেটামেরিজম্—রাসায়নিক হিসেবে সমগোত্রীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের এক প্রকার আইসোমেরিজম ↑। এই প্রক্রিয়ায় গঠিত যৌগিকগুলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমান সংখ্যক নির্দিষ্ট পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন হয়. কিন্তু পরমাণুগুলোর বিভিন্নরূপ সংযোজনের ফলে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি ঘটে; যেমন—ডাই-ইথাইল ইথার, $C_2H_5O.C_2H_5$, এবং প্রোপাইল ইথার $CH_3O.C_3H_7$ পরস্পর **মেটামেরিক** পদার্থ: কারণ, এই সমগোত্রীয় পদার্থ দুটার মধ্যে সমান সংখ্যক কার্বন. হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু রয়েছে, কিন্তু তাদের পরস্পর সংযোজনের বিভিন্নতার জন্যে পদার্থ দুটার গুণ ও ধর্মের পার্থক্য ঘটেছে। সমগোত্রীয় পদার্থ না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে এরূপ ঘটলে পদার্থগুলোকে **আইসোমেরিক**, বা আইসোমার ↑ বলা হয়।

মেডুলা — জীবদেহের কোন অংশ বিশেষের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ; যেমন, হাড়ের মধ্যে থাকে মজ্জা, কোন কোন উদ্ভিদের শাখা ও কাণ্ডের অভ্যন্তরে থাকে এক রকম নরম শাঁস। এ-গুলোকে বলে মেডুলা।

মেডুলা অব্লঙ্গেটা — মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগের (সেরিবেলাম ↑) অংশ বিশেষের নাম। মস্তিষ্কের এই অংশ শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চলাচল ও দেহের আরও অনেক প্রয়োজনীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে। চিত্রে তীর চিহ্নিত অংশ।

মেডুলা অব্লঙ্গেটা

মেন্থল — জৈব রাসায়নিক পদার্থ, $C_{10}H_{20}O$; সাদা, স্ফটিকাকার, তীব্র ঝাঁজ ও গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ। একে সাধারণতঃ পিপারমেন্ট বলে। ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মেণ্ডেলিফ টেবল — বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ মৌলিক পদার্থগুলোর যে পর্যায়ক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন (পিরিয়ডিক ল ↑)।

মেল্টিং পয়েণ্ট — গলনাঙ্ক; যত ডিগ্রি উষ্ণতায় কোন কঠিন পদার্থ তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক বিভিন্ন, এবং তা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভর করে (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑)। এজন্যে কোন পদার্থের গলনাঙ্ক বললে সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপে (760 মিলিমিটার) পদার্থটা ওই উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়, বুঝতে হবে; যেমন, সালফার বা গন্ধকের গলনাঙ্ক 112·8° সেন্টিগ্রেড; অর্থাৎ গন্ধক সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 112·8° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়।

মেরিডিয়ান — (1) দ্রাঘিমা বৃত্ত; ভৌগোলিক হিসেবের জন্যে যে সব বৃত্তরেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়েছে। এ-গুলোকে লাইন্স অব লঙ্গিটিউড ↑ বা টেরেস্ট্রিয়াল মেরিডিয়ান বলে। (2) জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যাদি নির্ধারণের জন্যে যে সব মহাবৃত্ত রেখা সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ারের ↑ জেনিথ ↑ ও নাদির ↑ বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়ে গগন-মণ্ডল বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে। এদের বলে সেলেস্টিয়াল মেরিডিয়ান।

মেসন — কস্মিক রশ্মিতে ↑ প্রাপ্ত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কণিকা। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে এর অস্তিত্ব ও গুণাগুণ নিরূপিত হয়েছে। এর ভর ইলেক্ট্রন ↑ ও প্রোটন ↑ কণিকার ভরের মাঝামাঝি। মেসন কণিকা ধন-তড়িৎবিশিষ্ট ও ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট দু'রকমেরই আছে; এমন কি, সম্ভবতঃ তড়িৎবিহীন মেসন কণিকাও কস্মিক রশ্মিতে বিদ্যমান। এর তড়িৎ শক্তির

পরিমাণ ইলেক্ট্রন কণিকার সমান। কস্‌মিক বা মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে এই মেসন কণিকা মহাশূন্য থেকে অহঃরহ ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হয়ে থাকে।

মোটর নার্ভ — দেহের যে স্নায়ুমণ্ডলী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কর্মশক্তি জোগায়। আমরা কাজকর্ম করি, হাটি চলি এই মোটর নার্ভের কার্যকারিতার ফলে। সেন্সরী নার্ভ নামে দেহে আর এক রকম স্নায়ুমণ্ডলী আছে, যা ব্যথা বেদনা প্রভৃতির অনুভূতি জাগায়।

মোজেইক — (1) সিমেন্টের মধ্যে রঙীন প্রস্তরাদি বসিয়ে যে নক্সা তৈরী করা হয়। সুদৃশ্য করবার জন্যে ঘরের মেজেতে এ ভাবে মোজেইক করা হয়ে থাকে। (2)

মোজেইক

জীবাণুর প্রভাবে অনেক সময়ে উদ্ভিদের পাতায় স্থানে স্থানে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে অনেকটা মোজেইক চিত্রের মত দেখায়। উদ্ভিদের এই রোগকে **মোজেইক ডিজিজ** বলে। (3) টিন, পারা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও গন্ধকের এক রকম সংমিশ্রণ করে যে রঙীন পদার্থ পাওয়া যায়। জিনিসটা দেখতে অনেকটা স্বর্ণরেণুর মত; একে বলে **মোজেইক গোল্ড**।

মোমেন্ট (অব ফোর্স) — শক্তি প্রয়োগে কোন বস্তু ঘোরালে ওই বস্তুর যে চক্রাকার গতিশীলতা জন্মায় তার পরিমাণকে বলে ওই শক্তির (ফোর্সের) মোমেন্ট। এভাবে ঘূর্ণনের স্থির বিন্দু (শক্তি-কেন্দ্র) থেকে গতিপথের উপর অঙ্কিত লম্ব রেখার দৈর্ঘ্যকে প্রযুক্ত শক্তির পরিমাণ দিয়ে গুণ করে মোমেন্টের পরিমাণ স্থির করা হয়। সুতা বেঁধে 'খ' বস্তুকে 'ক' বিন্দু থেকে ঘোরালে প্রযুক্ত শক্তি যদি 'প' (পাউণ্ড) হয়, তবে ওই ফোর্সের মোমেন্ট হবে প × কখ। যন্ত্রাদির বেয়ারিং, দরজা জানালার কব্জা প্রভৃতিতে যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, তার মোমেন্ট এভাবে স্থির করা হয়ে থাকে।

মোমেন্টাম — কোন গতিশীল বস্তুর ভর (মাস ↑) ও গতিবেগের (ভেলোসিটি ↑) গুণফল। যদি 150 গ্র্যাম ↑ ওজনের একটা বল প্রতি সেকেণ্ডে 100 সেণ্টিমিটার গতিতে ছোটে, তাহলে বলটার মোমেন্টাম হবে 150 × 100

=15,000 সেণ্টিমিটার-গ্র্যাম-সেকেণ্ড একক। সাধারণভাবে, বস্তুর ভর m ও গতিবেগ v হলে তার মোমেণ্টাম, M = mv

মোনাজাইট — এক রকম খনিজ পদার্থ; যার মধ্যে সিরিয়াম↑, থোরিয়াম↑ ও বিভিন্ন রেয়ার-আর্থ↑ ধাতু মিশ্রিত থাকে। এর মধ্যে সামান্য হিলিয়াম↑ গ্যাসও সংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে মোনাজাইট পাওয়া যায়।

মোল — গ্র্যাম এককে কোন পদার্থের আণবিক ওজন। কোন পদার্থের একটি অণুর সংগঠক পরমাণুগুলোর ওজনের সমষ্টি গ্র্যামে↑ প্রকাশ করলে তাকেই বলে পদার্থটার মোল, বা **গ্র্যাম মলিকিউল**↑। এক লিটার↑ জলে এক মোল পদার্থ দ্রবীভূত করলে সেই দ্রবকে বলে **মোলার সলু্যসন**।

ম্যাক্রো — বৃহৎ অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হয়: যেমন — মাথা অস্বাভাবিক বড় হোলে বলা হয় ম্যাক্রোসেফ্যালিক। পলিমার↑ পদার্থের সম্মিলিত বৃহদাকার অণুকে বলে ম্যাক্রো-মলিকিউল। ক্ষুদ্রার্থ-বোধক **মাইক্রো**↑ শব্দের বিপরীত অর্থবোধক।

ম্যাক্রোস্কোপিক — অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতই খালি চোখে যে সব পদার্থ দেখা যায়। **মাইক্রোস্কোপিক** (অণু-বীক্ষণিক) শব্দের বিপরীত অর্থ-বোধক।

ম্যাগ্‌মা — পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন গলিত পদার্থাদি; যা থেকে গ্র্যানাইট↑ প্রভৃতি প্রস্তর সৃষ্টি হয়েছে।

ম্যাগ্নেলিয়াম — অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের সংকর ধাতু; অত্যন্ত হাল্‌কা ও শক্ত। অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও সহজে এ-দিয়ে বিভিন্ন আকারের জিনিস তৈরী করা যায়। কখন কখন এর মধ্যে কিছু তামাও মেশান হয়ে থাকে। বিমান-পোতের খোল সাধারণতঃ এই সংকর ধাতু দিয়েই তৈরী হয়।

ম্যাগ্নেসিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন Mg; পারমাণবিক ওজন 24·32, পারমাণবিক সংখ্যা 12; বিশেষ হাল্‌কা ও রূপোর মত সাদা ধাতু। বায়ুর সংস্পর্শে এর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়,—ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইডের আবরণ পড়ে। জ্বালালে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে, ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড, MgO, জন্মায়। এই আলোর সাহায্যে রাত্রিকালে ফটোগ্রাফির↑ কাজ হয়। ম্যাগ্নে-

সাইট, $MgCO_3$, ডোলোমাইট $MgCO_3 . CaCO_3$, কার্ণালাইট $KCl . MgCl_2 . 6H_2O$, প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ থেকে নিষ্কাশিত হয়। ম্যাগ্নেলিয়াম ↑ প্রভৃতি হাল্‌কা সংকর ধাতু, আগুণে-বোমা প্রভৃতি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ঔষধরূপেও (ম্যাগ্-সাল্‌ফ ↑) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্নেসিয়াম সাল্‌ফেট — ম্যাগ্-সালফ, $MgSO_4$; বিরেচক পদার্থ, ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা ইপ্‌সম্ সল্ট ↑ নামেও পরিচিত।

ম্যাগ্নেসিয়া — ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড MgO; ঔষধরূপে যে 'ম্যাগ্নেসিয়া-অ্যাল্‌বা' ব্যবহৃত হয়, তা হোল বেসিক ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট; যাকে সংক্ষেপে বলে ম্যাগ্-কার্ব। আর ম্যাগ্নেসিয়াম বাইকার্বনেটের দ্রবকে বলে ফ্লুইড ম্যাগ্নেসিয়া।

ম্যাগ্নেসাইট — খনিজ অবিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট, $MgCO_3$; এ থেকে ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম কার্বনেট, বা **ম্যাগ-কার্ব**, অত্যন্ত হালকা সাদা চূর্ণ পদার্থ; যা টুথ-পাউডার ও ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ম্যাগ্‌নেট — চুম্বক, যা সাধারণ লোহাকে আকর্ষণ করে। বিভিন্ন কৌশলে আয়রন (লোহা), নিকেল, কোবল্ট, প্রভৃতি ফেরোম্যাগ্নেটিক ↑ পদার্থে এরূপ চৌম্বক ধর্ম সৃষ্টি করা যায়। স্থায়ী চুম্বকের চারদিকে চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। চুম্বক দণ্ডের দুই প্রান্ত দেশে (ম্যাগ্নেটিক পোল ↑) চৌম্বক শক্তি
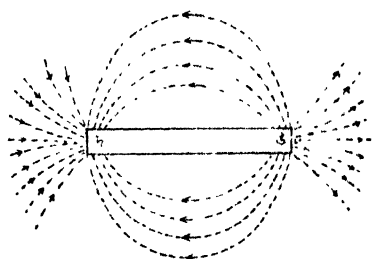
ম্যাগ্নেটিক লাইনস্ অব ফোর্স

প্রবল থাকে। একটা চুম্বকদণ্ড সুতায় ঝুলিয়ে দিলে ওর এক প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর মোটামুটি উত্তর দিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। এজন্যে এই দুই প্রান্তকে যথাক্রমে ম্যাগ্নেটের নর্থ পোল ও সাউথ পোল বলে।

ম্যাগ্নেটিজ্‌ম (টেরেস্ট্রিয়াল) — ভূ-গোলকের এক রকম চৌম্বক শক্তি লক্ষিত হয়; পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে প্রায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত যেন একটা বিরাট চুম্বক রয়েছে, এবং তারই প্রভাবে যেন

ভূ-পৃষ্ঠে একটা শক্তিশালী ম্যাগ্নেটিক ফিল্ড সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর এই স্বাভাবিক চৌম্বক শক্তিকে বলে টেরেস্ট্রিয়াল (পার্থিব) ম্যাগ্নেটিজম্। একটা চুম্বক দণ্ড সূতায় ঝুলিয়ে দিলে ওর দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর বরাবর উত্তর ও দক্ষিণে মুখ করে থাকে। চুম্বকের এই ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগেই কম্পাস (দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র) তৈরী হয়েছে।

ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ চৌম্বক প্রান্তের সমদূরবর্তী কাল্পনিক বৃত্তরেখাকে ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর (চুম্বকীয় নিরক্ষরেখা) বলে। এই বৃত্ত রেখায় অবস্থিত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ম্যাগ্নেটিক ডিপ↑ থাকে না। পৃথিবীর ম্যাগ্নেটিক ইকোয়েটর ও ভৌগোলিক ইকোয়েটর↑ এক না হলেও প্রায় কাছাকছি।

ম্যাগ্নেটিক ডিপ্ — পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্র ও ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান। ম্যাগ্নেটিক মেরিডিয়ানে↑ ভূ-পৃষ্ঠের লম্বক্ষেত্রে ঘুরতে পারে এমনভাবে রক্ষিত একটা চুম্বক শলাকা ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল ক্ষেত্রের সঙ্গে যে কোণ সৃষ্টি করে তার ডিগ্রি পরিমাণকে বলে **ডিপ্ অ্যাঙ্গেল**, বা ম্যাগ্নেটিক ডিপ্। ডিপ্ সার্কেল নামক যন্ত্রের

ম্যাগ্নেটিক ডিপ্ সার্কেল
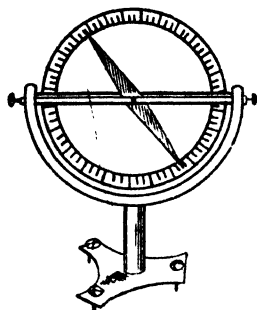
সাহায্যে ম্যাগ্নেটিক ডিপ অ্যাঙ্গেল সহজেই মাপা যায়।

ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেসন — পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরিডিয়ান↑ ও চুম্বকীয় মেরিডিয়ানের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধান; অর্থাৎ পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরু ও চুম্বকীয় উত্তর মেরুর মধ্যবর্তী কোণ। কম্পাস ব
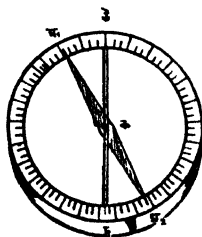
ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেসন

দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের চুম্বক শলাকার অবস্থান দেখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানের এই ডেক্লিনেসন নিরূপণ করা হয়। এরূপ কোণকে **ম্যাগ্নেটিক ভিভিয়েসন**ও বলা হয়।

ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম — চুম্বক ঝটিকা ; ভিন্ন নৈসর্গিক কারণে পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রে অনেক সময়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে, যার ফলে কম্পাস যন্ত্রের চৌম্বক শলাকা আকস্মিক-ভাবে দিক্ পরিবর্তন করে। একেই বলে ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম। সৌর-কলঙ্কের আধিক্য ও অরোরা বরিয়েলিস ↑ প্রভৃতির প্রভাবে এরূপ হতে দেখা যায়।

ম্যাগ্নেটো — তড়িৎ উৎপাদক এক রকম ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় চৌম্বক শক্তির প্রভাবে এর অভ্যন্তরস্থ তার-কুণ্ডলীতে তড়িৎ শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই তড়িৎ-প্রবাহের পথে সন্নিকটবর্তী দুই প্রান্তের সামান্য ব্যবধানের (স্পার্ক গ্যাপের) মধ্যে তড়িৎ-স্ফুরণ ঘটে। ইন্টারন্যাল কম্বাস্‌সন ইঞ্জিনে ↑ পেট্রলের বাষ্প এইরূপ স্পার্ক বা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শেই জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনেই এরূপ ম্যাগ্নেটো ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগ্নেটোমিটার — এক রকম যন্ত্র, যার সাহায্যে বিভিন্ন চুম্বকের চৌম্বকশক্তির পরিমাণ, বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের চৌম্বক শক্তির তীব্রতা পরিমিত হয়ে থাকে। সাধারণ ম্যাগ্নেটোমিটারে প্রধানতঃ একটা ক্ষুদ্র চুম্বক-দণ্ড ও একটা লম্বা ধাতব শলাকা পরস্পরের লম্বভাবে কেন্দ্র হলে সংবদ্ধ থাকে। শলাকাটা একটা গোলাকার স্কেলের উপর আবর্তিত হয়ে ওর সঙ্গে সংবদ্ধ চুম্বক দণ্ডটার আবর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। বাইরের কোন চৌম্বক শক্তির প্রভাবে যন্ত্রের ওই চুম্বক দণ্ডটার যেরূপ আবর্তন ও অবস্থান লক্ষিত হয়, তা থেকে ওই চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ সহজেই স্থির করা যেতে পারে। এরূপ যন্ত্রকে বলে **ডিফ্লেক্সন** ম্যাগ্নেটোমিটার ; আবার আর এক রকমের **ভাইব্রেসন** ম্যাগ্নেটো-মিটারও আছে।

ম্যাগ্নেটাইট — চৌম্বক শক্তি বিশিষ্ট এক প্রকার খনিজ লৌহ ; অত্যন্ত কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। লোহার একটা স্বভাবজাত অক্সাইডে, Fe_3O_4, খনিজটা গঠিত।

ম্যাগ্নেলিয়া মেটাল — লোহা, টিন, অ্যান্টিমনি ও লেড (সীসা) ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটা সংকর ধাতু। এদিয়ে সাধারণতঃ যন্ত্রাদির বেয়ারিং তৈরী হয়। এর মধ্যে সীসার ভাগই থাকে বেশী।

ম্যালাকাইট — উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের খনিজ প্রস্তর বিশেষ ; রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা বেসিক কপার

কার্বনেট, $CuCO_3 . Cu(OH)_2$; এ থেকেই সাধারণতঃ তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। রঙীন পাথর হিসেবে সস্তা অলঙ্কারাদিতেও এর ব্যবহার আছে।

ম্যালিক অ্যাসিড — এক প্রকার জৈব অ্যাসিড; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে এটা হোল হাইড্রক্সি-সাক্‌সিনিক অ্যাসিড, COOH. CH_2. CH(OH). COOH; কাঁচা আপেল ও অন্যান্য ফল থেকে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়।

ম্যাক্সিমাম্ মিনিমাম থার্মো-মিটার — থার্মোমিটার (ম্যাক্সিমাম মিনিমাম) ↑ ।

ম্যানোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে গ্যাসীয় পদার্থের চাপ নির্ধারণ করা হয়। আবদ্ধ স্থানে স্বল্প-পরিমাণ গ্যাসের অবস্থিতি-জনিত নিম্ন চাপ মাপবার জন্যেই
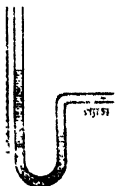
ম্যানোমিটার

সাধারণতঃ এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উচ্চ চাপ পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রকে বলে **প্রেসার গেজ**। চিত্র থেকে ম্যানোমিটারের মোটামুটি গঠন জানা যাবে।

ম্যাঙ্গানিজ — মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাংকেতিক চিহ্ন Mn; পারমাণবিক ওজন 54·93; পারমাণবিক সংখ্যা 25; লালচে সাদা কঠিন ধাতু, কিন্তু ভঙ্গুর পাইরোলুসাইট ↑ নামক খনিজ (ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড MnO_2) থেকে নিষ্কাশিত হয়। বিভিন্ন সংকর ধাতু, বিশেষতঃ ইস্পাত তৈরী করতে এর যথেষ্ট দরকার হয়। প্রায় 13% ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত ইস্পাত (ম্যাঙ্গানিজ স্টিল ↑) অত্যন্ত কঠিন হয়, এবং তা সহজে ক্ষয় হয় না। কপার, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে ম্যাঙ্গানিজ ব্রোঞ্জ ↑ নামক সংকর ধাতু তৈরী হয়ে থাকে।

ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড — ভারী কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ পদার্থ, MnO_2; একে ম্যাঙ্গানিজ পারঅক্সাইডও বলা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সি-ডাইজিং এজেন্ট ও ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঁচ-শিল্পে, লেক্‌ল্যান্স সেল প্রভৃতিতে এর প্রচুর ব্যবহার আছে।

ম্যাঙ্গানেট — ম্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের (H_2MnO_4) সল্ট ↑; যেমন, সোডিয়াম ম্যাঙ্গানেট, Na_2MnO_4, সবুজ বর্ণের রাসায়নিক পদার্থ, জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার পার-

্যাঙ্গানিক অ্যাসিডের ($HMnO_4$) ল্টকে বলে **পারম্যাঙ্গানেট**; যেমন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ↑, $KMnO_4$, গাঢ় লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়; জীবাণু-াশক ও প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

্যাঙ্গানিজ স্টিল — বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন স্টিল ↑; এই স্টিলে লোহার সঙ্গে অনধিক 13% ম্যাঙ্গানিজ মেশান হয়ে থাকে।

্যাঙ্গানিন — ম্যাঙ্গানিজ সংযুক্ত এক প্রকার সংকর ধাতু। এতে সাধারণতঃ থাকে 83% তামা, 13% ম্যাঙ্গানিজ, 4% নিকেল। এর তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা উত্তাপে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না; এজন্যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির বিশেষ বিশেষ রোধ-কুণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়।

র

রক ক্রিষ্টাল — স্ফটিকাকার বিশুদ্ধ সিলিকা ↑, বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড, SiO_2; স্বভাবজাত স্ফটিকাকার বালুকা বিশেষ।

রকেট — রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যা দুরন্ত বেগে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়; হাউই জাতীয় জিনিস। বিভিন্ন গঠন ও আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর রকেট আছে। অস্ত্র হিসেবে গত মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। **ভি-2 রকেট** হোল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটা লম্বা খোল; খোলটার পৃথক পৃথক আধারে তরল অক্সিজেন ↑ অ্যালকোহল ↑ ও অন্যান্য হাল্কা জ্বালানি পদার্থ পূর্ণ থাকে। অভ্যন্তরস্থ ওই সব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত ধূম ও গ্যাস রকেটের পশ্চাদ্ভাগ থেকে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়; আর এই প্রচণ্ড পশ্চাৎ-চাপের ফলে রকেটটা সম্মুখ-গতি লাভ করে ও সবেগে উপরে উঠে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। রকেট প্রায় 70 মাইল উপরে উঠে মোটামুটি 200 মাইল দূরে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হতে পারে। রকেটের গতি অনেকটা জেট ↑ প্রোপেলারের অনুরূপ; কিন্তু জেটের আভ্যন্তরীন রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যে বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে; রকেটের সেরূপ দরকার হয় না। রকেটের যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে তা বায়ুশূণ্য ঊর্দ্ধাকাশেও উঠতে পারে; কিন্তু জেট প্লেন বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

রমন এফেক্ট — কোন মনো-

ক্রোমেটিক ↑ (একবর্ণী) আলোক-রশ্মি কোন স্বচ্ছ পদার্থের (তরল বা গ্যাসীয়) মাধ্যমে পরিচালিত করলে ওই আলোক-রশ্মির কতকাংশ লম্ব-দিকে বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালী (স্পেক্ট্রাম ↑) পরীক্ষা করলে মূল আলোকরশ্মির বর্ণরেখার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কয়েকটা বর্ণ-রেখা দেখা যায়। এই রেখাগুলোকে বলে **রমন-লাইন্‌স**। মাধ্যমের তরল বা গ্যাসীয় অণুগুলোর গায়ে প্রতিহত হয়ে ওই আলোক-তরঙ্গ পাশের দিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং এর ফলেই ওই নূতন রেখাগুলোর উদ্ভব ঘটে। একবর্ণী আলোকের এই ধর্মকে বলে রমন-এফেক্ট। এই তথ্য আবিষ্কার করে ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন 1930 খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের আণবিক কম্পন-শক্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

রম্বাস্ — যে জ্যামিতিক সামন্তরিক চতুর্ভুজের বাহুগুলো সব পরস্পর সমান, কিন্তু কোন কোণই সমকোণ নয় ; অর্থাৎ বিষমকোণী সমবাহু সামন্তরিক চতুর্ভুজ। এরূপ চতুর্ভুজের বাহুগুলোও অসমান হলে তাকে বলে **রম্বয়েড**, বিষম সামন্তরিক।

রনট্‌গেন রে — এক্স-রে। বাংলায় বলে রঞ্জেন রশ্মি। আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী রনট্‌গেনের নামানুসারে।

রাবার — এক রকম স্থিতিস্থাপক (ইল্যাস্টিক) কঠিন পদার্থ। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের সাদা রস (ল্যাটেক্স ↑) ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক হিসেবে কাঁচা রাবার হোল হাইড্রোকার্বনের ↑ এক রকম পলিমার ↑ পদার্থ ; যাকে **পলিআইসোপ্রিন** বলা হয়। কাঁচা রাবারের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর রাবার তৈরী হয়ে থাকে। গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করে (ভাল্‌ক্যানাইজ্‌ড রাবার ↑) ছাঁচে ঢেলে রাবারের বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়।

রাস্ট — মরিচা ; লোহার এক রকম জলযুক্ত অক্সাইড, $Fe_2O_3 . H_2O$; বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে লোহার যে অক্সাইড, বা মরিচা সৃষ্টি হয়।

রিঅ্যাক্‌সন (কেমিক্যাল) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ; নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক সংযোগে যে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় ; যেমন — এক ভাগ অক্সিজেন ↑ ও দুই ভাগ হাই

হাইড্রোজেনের ↑ কেমিক্যাল রিঅ্যাক্শনের (রাসায়নিক প্রক্রিয়ার) ফলে যৌগিক পদার্থ, জল (H_2O), উৎপন্ন হয়।

রিকেট — দেহের হাড় নরম ও অপুষ্ট থাকার রোগ বিশেষ। খাদ্যে ভিটামিন-ডি উপযুক্ত পরিমাণে না পেলে শিশুদেরই সাধারণতঃ এ রোগ হয়ে থাকে, দেহের হাড় বেঁকে যায়। দুধ, মাখন, মাছের তেল প্রভৃতিতে ভিটামিন-ডি ↑ থাকে। আবার সূর্য কিরণের প্রভাবেও দেহে আপনা থেকে এই ভিটামিন ↑ জন্মায়। ভিটামিন-ডি ব্যতিরেকে দেহযন্ত্র খাদ্যের ক্যালসিয়াম ↑ উপাদান আত্মসাৎ করতে পারে না; ফলে হাড় নরম ও অপুষ্ট থেকে যায়।

রিকেট্সিয়া — বিশেষ এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু; আকারে এগুলো ব্যাক্টেরিয়ার ↑ চেয়ে ছোট, কিন্তু ভাইরাসের ↑ চেয়ে বড়। এর আক্রমণে টাইফাস প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

রিডাক্সন — কোন রাসায়নিক পদার্থ থেকে সাধারণতঃ অক্সিজেন দূরীকরণ, বা তাতে হাইড্রোজেন সংযুক্তকরণের প্রক্রিয়া; যেমন—টিন-অক্সাইডের সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে ধাতব টিন পাওয়া যায়; এখানে কার্বন টিন-অক্সাইডকে রিডিউস করে, এবং নিজে অক্সিডাইজ্ড হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয়। এভাবে দেখা যায়, রিডাক্সনের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিডেসন প্রক্রিয়াও ঘটে থাকে। বস্তুতঃ রিডাক্সন প্রক্রিয়া অক্সিডেসন প্রক্রিয়ার বিপরীত। আবার, যৌগিক পদার্থের সংগঠক ধাতুর ভ্যালেন্সি ↑ কমিয়েও রিডাক্সন ঘটান যায়, যেমন — ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) রিডিউস্ড হয়ে ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) উৎপন্ন হয়।

রিডিউসিং এজেন্ট — যে পদার্থ অপর কোন পদার্থের রিডাক্সন ↑ ঘটায় তাকে বলে রিডিউসিং এজেন্ট; যেমন — হাইড্রোজেনের মধ্যে কপার অক্সাইড, CuO, উত্তপ্ত করলে রিডাক্সনের ফলে ধাতব কপার (তামা) পাওয়া যায়। এখানে হাইড্রোজেন হোল কপার অক্সাইডের রিডিউসিং এজেন্ট।

রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল — দুই সমকোণের (180°) চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু চারি সমকোণের (360°) চেয়ে ক্ষুদ্রতর জ্যামিতিক কোণ। বাংলায় বলে প্রবৃদ্ধ কোণ।

রিফ্লেক্সন (অব লাইট) — আলোকরশ্মির প্রতিফলন; কোন কোন জিনিসের উপরিভাগে

আলোকরশ্মি পড়লে ওই রশ্মি ভিন্ন পথে ফিরে আসে, অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়; একেই বলে আলোকের নিয়মিত প্রতিফলন, বা রিফ্লেক্‌সন। প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির গতিপথের এরূপ পরিবর্তন নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ঘটে থাকে। প্রতিফলক তলের যে বিন্দুতে আলোক-রশ্মি আপতিত হয়, সেই বিন্দু থেকে ওই তলের উপর অঙ্কিত লম্ব-রেখাকে **নর্ম্যাল** বলে। আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি ওই নর্ম্যালের সঙ্গে একই সমতলে উভয় দিকে সমান কোণ উৎপন্ন করে; অর্থাৎ আলোক-রশ্মি যতটা বেঁকে প্রতিফলক তলের উপর পড়ে, ততটা বেঁকেই আবার প্রতিফলিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, আলোকরশ্মির আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের সমান হয়। আপতিত রশ্মি ও নর্ম্যালের মধ্যস্থ কোণকে বলে **অ্যাঙ্গেল অব ইন্সিডেন্স** (আপতন কোণ) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ও নর্ম্যালের মধ্যস্থ কোণকে বলে **অ্যাঙ্গেল অব রিফ্লেক্‌সন** (প্রতিফলন কোণ)।

রিফ্লেক্‌সন

রিফ্লেক্স ক্যামেরা — বিশেষ এক রকম ফটোগ্রাফিক ↑ যন্ত্র. ক্যামেরা ↑। এরূপ ক্যামেরায় ছবি উঠবে যন্ত্রচালক তা পূর্বে যন্ত্রের মধ্যে দেখে নিতে পারে। এর অ্যাপারচারে সংলগ্ন লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি এসে যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ একখানা দর্পণে প্রতিফলিত হয়। উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে আগত রশ্মি এভাবে প্রতিফলিত হয়ে একখানা কাঁচের ... বস্তুটার প্রতিচ্ছায়া ফেলে। যন্ত্রচালক বস্তুটার ওই প্রতিচ্ছায়া পূর্বাহ্নে যন্ত্রমধ্যে দেখে নিয়ে উপযুক্ত সময়ে দর্পণখানা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপরে তুলে দিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আলোকরশ্মি সোজা গিয়ে ফিল্ম বা ... গ্রাফিক প্লেটের উপর পড়ে ছবি উঠে যায়।

রিফ্র্যাকসন (অব লাইট) আলোকরশ্মির প্রতিসরণ; এক মাধ্যম থেকে আলোকরশ্মি অপর কোন মাধ্যমের ভিতর পরিচালিত হলে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। একে বলে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ, বা রিফ্রাক্‌সন; যেমন—বায়ু থেকে কোন আলোকরশ্মি জলের মধ্যে (বা জল থেকে বাইরের বায়ুতে) প্রবেশ করলে ওই রশ্মির গতিপ

বেঁকে যায়। বিভিন্ন মাধ্যমের সাধারণ তলের যে বিন্দুতে আলোক রশ্মি আপতিত হয় সেই বিন্দুতে ওই তলের উপর অঙ্কিত লম্ব-রেখাকে বলে **নর্ম্যাল** ; এই নর্ম্যালের সঙ্গে আপতিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বলে **অ্যাঙ্গেল-অব-ইন্সিডেন্স**, বা আপতন কোণ; আর
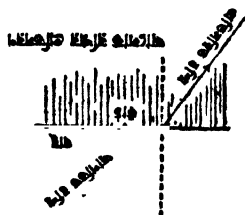
প্রতিসরিত রশ্মি (রিফ্রাক্টেড রে) ওই লম্বের অপর পার্শ্বে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে বলে **অ্যাঙ্গেল-অব-রিফ্রাক্‌সন**, বা প্রতিসরণ কোণ। আলোকরশ্মি বায়ু, বা অপর কোন হাল্‌কা মাধ্যমের ভিতর দিয়ে জল, কাঁচ প্রভৃতি ঘন স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতরে প্রবেশ করলে অ্যাঙ্গেল-অব-ইন্সিডেন্স অপেক্ষা অ্যাঙ্গেল-অব-রিফ্রাক্‌সন ক্ষুদ্রতর হয়, অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি নর্ম্যালের দিকে বেঁকে যায়। কোন রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে হাল্‌কা মাধ্যমে প্রবেশ করলে এর বিপরিত অবস্থা ঘটে। কোন বস্তুর মাধ্যমে এরূপ প্রতিসরিত রশ্মি কতকটা বেঁকবে তা ওই বস্তুর প্রতিসরণ-ক্ষমতা, বা **রিফ্রাক্টিভ ইণ্ডেক্সের** উপর নির্ভর করে। আলোক রশ্মির এরূপ প্রতিসরণের ফলে জলের তলায় কোন জিনিস অপেক্ষাকৃত উপরে দেখায়, অর্থাৎ জলের গভীরতা কম বলে মনে হয়।

রেফ্রিজারেটর—যে যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগের তাপ সবিশেষ হ্রাস করে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় মোটামুটি স্থির রাখা যায়। একে যান্ত্রিক শীতল-কক্ষ বলা যেতে পারে। উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায় এমন, বিশেষতঃ খাদ্য দ্রব্য, ঔষধাদি এর শীতল কক্ষে রেখে দীর্ঘ দিন অবিকৃত রাখা যায়। এর যান্ত্রিক কৌশলটা হোল মোটামুটি এইরূপ : কোন তরল পদার্থ বাষ্পীভবনের ফলে সন্নিহিত মাধ্যমের তাপ শোষণ করে; যেমন, গায়ের জল হাওয়ায় বাষ্পীভূত হলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। রেফ্রিজারেটর যন্ত্রে এরূপ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তরস্থ তাপ কৌশলে হ্রাস করবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এরূপ যন্ত্রে অত্যধিক চাপ প্রয়োগে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3) প্রভৃতি গ্যাস জমিয়ে তরল

করা হয়; কৌশলে বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে ওই তরল গ্যাস ঠাণ্ডা রাখবার ব্যবস্থা থাকে। তারপর চাপ কমিয়ে দিলে ওই তরল পদার্থ ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হতে থাকে; ফলে যন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগের উষ্ণতাও ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। ওই বাষ্পকে পুনরায় চাপ দিয়ে তরল করা হয়; আবার বাষ্পীভূত হয়। এরূপ প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে; ফলে যন্ত্রের মধ্যস্থ বায়ু ক্রমে অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। থার্মো-স্টাট্ ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে এরূপ শীতল কক্ষের উষ্ণতা স্থির রাখবার ব্যবস্থাও করা যায়।

রিভার্বেরেটরি ফার্ণেস — বিশেষ ধরণের এক রকম ফার্ণেস বা চুল্লী, যার অগ্নিশিখা উত্তপ্ত পদার্থের গায়ে সরাসরি লাগে না। চুল্লীর আবদ্ধ তাপে পৃথক পাত্রে রক্ষিত পদার্থ

রিভার্বেরেটরি ফার্ণেস (নক্সা)

দ্রবীভূত হয়ে যায়। বিভিন্ন খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে এরূপ ফার্ণেস ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বিশেষতঃ যে স্থলে খনিজের সঙ্গে জ্বালানি পদার্থের সংমিশ্রণ বা সংযোগ বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় নয়।

রিয়েলগার — আর্সেনিক ডাইসালফাইড (As_2S_2) নামক রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। লাল রং-এর খনিজ পদার্থ। বাংলায় বলে মনঃশিলা বা মোমছাল।

রিলে (ইলেক্ট্রিক্যাল) — এক রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর কৌশলটা হোল এই যে, এক সার্কিটে ↑ প্রবাহিত তড়িৎ স্রোত অপর সার্কিটের তড়িৎ প্রবাহকে প্রয়োজনানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। প্রথম সার্কিটের স্বল্প বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে দ্বিতীয় সার্কিটে অপেক্ষাকৃত শক্তি-শালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ ইচ্ছানুযায়ী প্রবিষ্ট ও নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়। দূরাগত স্তিমিত রেডিও (বেতার) তরঙ্গ (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্তিশালী করে তোলা যায়।

রিলেটিভিটি (থিয়োরি অব) — অপেক্ষিকতা বাদ; পদার্থবিজ্ঞানে আপেক্ষিকতা সম্পর্কীয় আইনস্টাইন প্রবর্তিত মতবাদ। এই মতবাদ মূলতঃ দুটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রথমতঃ—কোন বস্তুর গতি অন্য নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ, স্থান ও কাল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ আপেক্ষিক; ও

একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কোন বস্তুর গতি অপর কোন স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হতে পারে মাত্র। কিন্তু বিশ্ব চরাচরে কোন বস্তুই স্থির নই—পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্রাদি সবই মহাশূন্যে গতিশীল। সুতরাং পদার্থের অন্য নিরপেক্ষ নিজস্ব গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাজেই সব রকম গতিই আপেক্ষিক। এভাবে আবার স্থান এবং কালও পরস্পর আপেক্ষিক; যেহেতু মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান বস্তুর অবস্থান অনুযায়ী সময় এবং সময় অনুযায় অবস্থান হতে বাধ্য। এই মতবাদের বিস্তৃত যুক্তিতে জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন অভিনব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; পদার্থের পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধীয় বিবিধ সত্য প্রমাণিত হয়েছে; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল গঠন-বৈচিত্র্য একই নিয়মে গ্রথিত হয়েছে। বহু জটিল যুক্তি ও আঙ্কিক সমাধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ বাস্তব পরীক্ষাদিতেও নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

রিলেটিভ ভেলোসিটি — ভেলোসিটি (রিলেটিভ) ↑ ।

রেজিন — পাইন প্রভৃতি উদ্ভিদের ঘনীভূত রস। ওই জাতীয় বৃক্ষের ছাল কেটে দিলে উদ্ভিজ্জ তেল ও রজন মিশ্রিত রস নির্গত হয়। এর উদ্বায়ী তেল বাষ্পীভূত হয়ে উবে গেলে গাছের কাটামুখে কঠিন রেজিন জমে থাকে। একে **রোজিনও** বলা হয়, বাংলায় বলে রজন। কোপ্যাল, ক্যানাডা-ব্যালসাম প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন রকমের রজন পাওয়া যায়। রজনের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল; পদার্থটা যেন এক রকম স্বভাবজাত প্ল্যাস্টিক ↑ শ্রেণীর পলিমার ↑ । এই রেজিনের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ তেল মিশ্রিত থাকলে তাকে বলা হয় **ওলিয়োরেজিন**।

রেটর্ট — এক রকম পাত্র, বাংলায় বলে বক-যন্ত্র। সাধারণতঃ কাঁচের তৈরী এরূপ বিশেষ আকারের পাত্রে বিভিন্ন পদার্থ উত্তপ্ত করলে
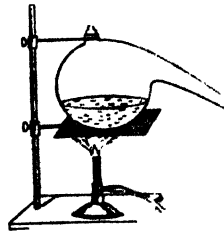
উৎপন্ন গ্যাস বা বাষ্প সহজে সংগ্রহ করা যায়। ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায়ও এরূপ পাত্র ব্যবহৃত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে বাষ্পীয় ডিস্টিলেট ↑ এর নলপথে নির্গমনের সময়ে তরল

হয়ে বেরোয়। কোল গ্যাস ↑ তৈরীর প্রক্রিয়ায় এরূপ বিরাটাকার ধাতুনির্মিত বকযন্ত্রে কয়লা উত্তপ্ত করা হয়; ওর নলমুখে নির্গত গ্যাস প্রকাণ্ড গ্যাস-হোল্ডারের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা হয়।

রেটিনা — চক্ষুগোলকের পশ্চাদ্ভাগস্থ যে পর্দার গায়ে চোখের বিভিন্ন স্নায়ু এসে মিলিত হয়েছে। ওই স্নায়ুগুলোর প্রান্তভাগ রেটিনার সঙ্গে সংযুক্ত। আলোকসুগ্রাহী এই সব স্নায়ুর রেটিনা-সংলগ্ন প্রান্তগুলো আলোকপাতে উত্তেজিত হয়; সেই উত্তেজনা স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে বিভিন্ন বর্ণ ও দৃশ্যের অনুভূতি জাগায়।

অপটিক নার্ভস মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত

রেটিনা

রেড লেড — লেড অক্সাইড, Pb_3O_4; উজ্জ্বল লাল বর্ণের চূর্ণ। পদার্থটা **মিনিয়াম** ↑ নামেও পরিচিত। পেইন্ট ও ভার্নিসের ↑ রং হিসেবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়; কাঁচ-শিল্পে ও অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বাংলায় বলে মেটে সিন্দুর।

রেডিও — কথাটার শব্দার্থ হোল, রে, বা রশ্মি সম্বন্ধীয়; অথবা রশ্মি দ্বারা; যেমন — রেডিওথেরাপি ↑, রেডিওঅ্যাক্টিভ ↑ এলিমেন্ট ইত্যাদি। সাধারণতঃ আজকাল রেডিও বললে বেতার যন্ত্র (রেডিও টেলিফোন ↑) বুঝায়।

রেডিও অ্যাক্টিভিটি — বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের স্বয়ংক্রিয় তেজস্ক্রিয়তা। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থের অস্থায়ীত্বের জন্য তাদের পরমাণু-কেন্দ্রীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে (ফিসন ↑) তা থেকে তড়িতাবিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকা ধারা নির্গত হতে থাকে। এর মধ্যে আল্‌ফা ↑, বিটা ↑, গামা ↑ এই তিন রকম কণিকার ধারা বা তেজ-রশ্মি বিকিরিত হয়। এর মধ্যে আল্‌ফা কণিকা ধন-তড়িৎযুক্ত, বিটা কণিকা ঋণ-তড়িৎবিশিষ্ট এবং গামা রশ্মি তড়িৎবিহীন। একটা চুম্বক নিকটে আনলে ওই তিন রকম রশ্মি বেঁকে পৃথক হয়ে তিন দিকে বিকিরিত হতে দেখা যায় (চিত্র দেখ)।

ত্রিবিধ তেজ-রশ্মি

এরূপ ক্রমাগত তেজ বিকিরণের ফলে পদার্থটার পারমাণবিক গঠন বদলে গিয়ে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে

যায় (ট্রান্সমুটেসন ↑) ; যেমন — রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্রমে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় (লেড) পরিণত হয়। ভারী মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রেডিও-অ্যাক্টিভ্ আইসোটোপ ↑ স্বভাবতঃ পাওয়া যায় ; আবার অ্যাটমিক-পাইল ↑ , সাইক্লোট্রোন ↑ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়েও এরূপ বিভিন্ন রেডিও-অ্যাক্টিভ আইসোটোপ তৈরী করা যেতে পারে।

রেডিওথেরাপি — বিভিন্ন রে, বা রশ্মি প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ রোগের চিকিৎসা প্রণালী। এরূপ চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন রোগে আলোকরশ্মি, তাপরশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি (এক্স-রে ↑) প্রভৃতি বিভিন্ন কৌশলে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। রেডিয়াম ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় (রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑) পদার্থের তেজরশ্মি প্রয়োগ করেও ক্যান্সার প্রভৃতি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা হয়।

রেডিওগ্রাফি — যে যন্ত্রের সাহায্যে এক্স-রে ↑ , গামা-রে ↑ প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রশ্মিপাতের ফলে ফটো-গ্রাফিক ↑ প্লেট, বা ফ্লোরেসেন্ট ↑ পর্দার উপরে কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়। সাধারণতঃ রোগ নির্ণয়ের জন্যে এক্স-রে সাহায্যে যে যন্ত্রে দেহাভ্যন্তরের এক রকম ফটো তোলা হয় তাকেই রেডিওগ্রাফি বলে।

রেডিও টেলিগ্রাফি — বেতারে সংবাদ প্রেরণের কৌশল। সাধারণ টেলিগ্রাফের ↑ মোর্স-প্রবর্তিত সাংকেতিক ধ্বনি বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে দূর স্থানে প্রেরণ করবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এর কৌশল মোটামুটি রেডিও-টেলিফোনির ↑ অনুরূপ।

রেডিও টেলিফোনি — সাধারণ রেডিও, বা বেতার-যন্ত্রের কৌশল। বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গধারার মাধ্যমে এতে কথাবার্তা, গানবাজনা প্রভৃতির ধ্বনি দূরান্তরে প্রেরিত হয়। এর প্রেরক-যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যার বেতার তরঙ্গ অনবরত বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। মাইক্রো-ফোন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গ তড়িৎ-স্পন্দনে রূপান্তরিত করে ওই ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক তড়িত্তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-স্পন্দন শূন্যপথে অতি দ্রুত ছড়িয়ে যায়, ও দূরবর্তী রেডিও গ্রাহক-যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে। বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে এই ক্ষীণ

তড়িৎ-স্পন্দনগুলো এম্‌প্লিফায়ারের সাহায্যে বিশেষভাবে সংবর্ধিত হয়ে রিসিভার যন্ত্রের লাউড-স্পিকারের পর্দায় প্রেরিত শব্দানুযায়ী কম্পন ঘটায়। এর ফলে পুনরায় শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই শব্দই আমরা রেডিও যন্ত্রে শুনতে পাই। রেডিও সম্বন্ধে এ হোল অতি সাধারণ মোটামুটি বিবরণ। এই বেতার তরঙ্গ গ্রহণ, সংশোধন এবং পরিবর্ধনের জন্যে এর মধ্যে থার্মোআয়নিক ভাল্‌বের ↑ নানা রকম জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে।

রেডিও মাইক্রোমিটার — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপশক্তি পরিমাপের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। এর সাহায্যে অতি ক্ষীণ তাপের পরিমাণও নির্ধারণ করা যায়। এরূপ যন্ত্রে প্রধানতঃ থাকে একটা থার্মো কাপ্‌ল ↑ ও একটা গ্যাল্‌ভ্যানোমিটার ↑ ; এ দুটো পরস্পরের সঙ্গে তামার তার দিয়ে যুক্ত করে তড়িৎ-চক্র সৃষ্টি করা হয়। বিকিরিত তাপশক্তি থার্মোকাপ্‌লের মধ্যে যে ক্ষীণ তড়িৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে গ্যালভ্যানোমিটারে তার পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

রেডিওমিটার— উত্তপ্ত পদার্থ থেকে বিকিরিত তাপরশ্মির পরিমাপক এক প্রকার সাধারণ যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রটা মোটামুটি বায়ুশূন্য একটা আধারে রক্ষিত ঘূর্ণায়মান একটা চক্রের মত। এর লম্বা দণ্ডগুলোর মাথায় সংলগ্ন ধাতব চাকৃতি সমূহের এক দিক উজ্জ্বল চকচকে, ও অপর দিক কালো থাকে। কালো রঙের তাপশক্তি শোষণের ক্ষমতা আছে। কাজেই চাকৃতির প্রত্যেকটার
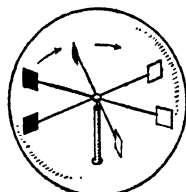
রেডিওমিটার

কালো দিক বিকিরিত তাপশক্তি দ্রুত শোষণ করে নেয়; ফলে, আধারের অভ্যন্তরস্থ স্বল্পাবশিষ্ট বায়ুতে একটা একমুখী প্রবাহের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটা চাকৃতির একই দিকের কালো অংশে এরূপ প্রবাহের জন্যে চক্রটা ঘুরতে থাকে। চক্রটার এরূপ ঘূর্ণনের বেগ লক্ষ্য করে বিকিরিত তাপের মোটামুটি পরিমাণ জানা যায়।

রেডিয়াম — মৌলিক তেজস্ক্রিয় ধাতু। সাংকেতিক চিহ্ন Ra, পরিমাণবিক ওজন 226·05; পারমাণবিক সংখ্যা 88; অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু। মাদাম কুরি পিচ্‌ব্লেণ্ড ↑ থেকে

নিষ্কাশিত করে রেডিয়াম ধাতু আবিষ্কার করেন। প্রধানতঃ ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় এর তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাসায়নিক হিসেবে ধাতুটা ক্যালসিয়াম ↑ ও বেরিয়ামের অনুরূপ। তেজ বিকিরণের ফলে (রেডিও-অ্যাক্টিভিটি ↑) রেডিয়াম ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে শেষে সীসায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

রেডিয়াস — ব্যাসার্ধ (জ্যামিতিক); বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত অঙ্কিত যে কোন সরল রেখা। কেন্দ্র ভেদ করে উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখাকে বলে বৃত্তের ব্যাস, বা **ডায়মেটার**।

রেডিয়াস ভেক্টর — জ্যোতিবিজ্ঞানের গণনাদিতে ব্যবহৃত রাশি। কোন জ্যোতিষ্ক যদি অপর কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে উপবৃত্ত (ইলিপ্টিক) পথে প্রদক্ষিণ করে (যেমন—পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরছে), তাহলে যে কোন অবস্থানে ওই জ্যোতিষ্ক দুটির সংযোগকারী সরল রেখাকে বলে রেডিয়াস ভেক্টর। স্থির জ্যোতিষ্কটার অবস্থানকে ওই ডিম্বাকার কক্ষপথের **ফোকাস** বলে। রেডিয়াস ভেক্টরের দৈর্ঘ্য ও কৌণিক অবস্থানাদি পর্যবেক্ষণ করে যে কোন সময়ে ওই চলমান জ্যোতিষ্কের গতি, স্থিতি, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি জানা যায়। গণিতশাস্ত্রেও কোন স্থির বিন্দুর তুলনায় অপর কোন গতিশীল বিন্দুর বিভিন্ন পরিমাপ এরূপ রেডিয়াস ভেক্টরের সাহায্যে নির্ধারিত হয়।

রেডিয়াস ভেক্টর

রেডিয়ান — জ্যামিতিক বৃত্তাংশ পরিমাপের একটা একক বিশেষ। কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধের (রেডিয়াস ↑) সমান করে পরিধি থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে তার উভয় প্রান্তে দুটা ব্যাসার্ধ অঙ্কিত করলে কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন হয় তাকে বলে এক রেডিয়ান। এক রেডিয়ান $= 57{\cdot}3°$; এক ডিগ্রি $= 0{\cdot}017$ রেডিয়ান।
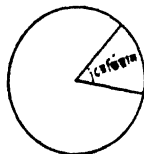
রেডিয়ান

রেডিয়্যান্ট হিট — উত্তপ্ত পদার্থ থেকে যে তাপশক্তি বিকিরিত হয়। আমরা সূর্যের যে তাপ পাই তা সূর্যের রেডিয়্যান্ট হিট, বা বিকিরিত তাপশক্তি। একটা উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দেহের কাছে আনলে তার

রেডিয়্যাণ্ট হিটের ফলে আমাদের তাপ বোধ হয় ; কিন্তু উত্তপ্ত লোহা গায়ে লেগে গেলে যে উত্তাপ বোধ হয় তা আর রেডিয়্যাণ্ট হিট নয়।

রেডিরেটর — যে যন্ত্রের সাহায্যে নিয়মিতভাবে তাপ বিকিরণ করা সম্ভব হয়। উত্তপ্ত জল বা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ এরূপ যন্ত্র থেকে বিশেষ কৌশলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিকিরিত তাপ চারিদিকের বায়ু উত্তপ্ত করে তোলে। শীতপ্রধান দেশে গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু উষ্ণ রাখবার জন্যে এরূপ রেডিয়েটর যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রেডিয়েসন — শক্তির উৎস থেকে রশ্মি বা তরঙ্গ প্রবাহের আকারে শক্তির বিকিরণ বা বিচ্ছুরণ। তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি বিভিন্ন রূপ অদৃশ্য রশ্মি, বা তরঙ্গের আকারে বিকিরিত হয়ে থাকে। ইলেকট্রন ↑, নিউট্রন ↑, আলফা ↑, বিটা ↑ প্রভৃতি কণিকার তরঙ্গাকার ধারা-প্রবাহের ফলে এরূপ রশ্মির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ↑ তরঙ্গ প্রবাহ, বা অদৃশ্য রশ্মিকেই রেডিয়েসন বলা হয়।

রেইন-গেজ — বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ধারক যন্ত্র। এর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন স্থানে কতটা বৃষ্টিপাত হোল তার প[রিমাণ] জানা যায়। চিত্র থেকে বুঝা য[াবে] একটা নির্দিষ্ট [...] তনের ফা[নেলের] মুখে যতটা বৃষ্টি[র] জল পড়ে নী[চের] পাত্রে জমে থা[কে] তার পরিমাণ [নির্ণয়] করে বৃষ্টি পা[তের] হ্রাস বৃদ্ধি সহ[জেই] নিরূপণ করা যায়।

রেইন-গেজ.

রেয়ন — কৃত্রিম রেশম। রাসা[য়নিক] প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত সব রকম সে[লু]লোজ ↑ জাতীয় সূত্রকেই আজ[কাল] রেয়ন বলে। সাধারণতঃ দু[ই রকম] রেয়ন বিশেষ প্রচলিত—সেলু[লোজ] অ্যাসিটেট রেয়ন ও ভিস্‌কোস্ [রেয়ন] যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিলে সেলু[লোজ] অ্যাসিটেটের ↑ ঘন দ্রব সূক্ষ্ম ছিদ্র প[থে] সূতার মত বেরিয়ে আসে। উত্ত[প্ত] বায়ু প্রবাহের সাহায্যে এই সূ[তা] থেকে দ্রাবক পদার্থ সম্যক বাষ্পীভূ[ত] হয়ে চলে যায় ; এর ফলে সূতাগু[লো] বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ ভা[বে] এই হলো **সেলুলোজ অ্যাসিটে[ট] রেয়ন**। যন্ত্রের সাহায্যে ভিস্‌কো[স] নামক রাসায়নিক পদার্থের যে সূ[ক্ষ্ম] সূতা তৈরী হয়, তাকে ব[লে] **ভিস্‌কোস রেয়ন**। বিভি

সেলুলোজের ↑ উপর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑ (NaOH) ও কার্বন ডাই-সালফাইডের ↑ (CS_2) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক রকম স্বচ্ছ অর্ধ-তরল পদার্থ সৃষ্টি হয়, একে বলে ভিস্‌কোস্।

রেয়ার গ্যাস — ইনার্ট গ্যাস ↑, বা নোবল গ্যাস : হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডন নামক মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাস-গুলো দুষ্পাপ্য বলে সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত। এদের মধ্যে র‍্যাডন ↑ ব্যতীত অন্য গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান। বায়ুমণ্ডলে আর্গন আছে কিছু বেশী ; তাও মাত্র 0·93 এর মত। (অ্যাটি-মস্ফিয়ার ↑)

রেয়ার আর্থস্ —সমগোত্রীয় কতক-গুলো দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতু। এদের রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস্ও বলে। ধাতুগুলোর বিভিন্ন ধর্ম ও গুণ অনেকাংশে অ্যালুমিনিয়ামের মত। মোনাজাইট ↑ নামক খনিজ বালুকা থেকে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। সিরিয়াম ↑ সহ প্রায় 16-টা ধাতু রেয়ার আর্থের অন্তর্গত ; এদের পারমাণবিক ওজন 57 থেকে 71 এর মধ্যে। (পরিশিষ্টে তালিকা ↑)।

রেসোর্সিন — একটা শক্তিশালী জীবাণু-প্রতিরোধক রাসায়নিক পদার্থ ; একে **রেসসিনল**ও বলে। চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জন-শিল্পেও এর কিছু ব্যবহার আছে।

রুজ — লোহার চূর্ণাকার মরিচা : আয়রন অক্সাইডের (Fe_2O_3) গুঁড়া। লাল রঙের এই সূক্ষ্ম দানা-যুক্ত চূর্ণ দিয়ে ঘসে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ পালিশ করা হয়।

রুবি — লাল রঙের এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ। অলঙ্কারা-দিতে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হোল অ্যালু-মিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3, (কোরাণ্ডাম ↑)। স্বাভাবিকই সামান্য ক্রোমিয়াম ↑ মিশ্রিত থাকায় এর বর্ণ লাল হয়ে থাকে।

রুবিডিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ ; সাংকেতিক চিহ্ন Rb, পারমাণবিক ওজন 85·48, পার-মাণবিক সংখ্যা 37 ; সোডিয়ামের ↑ মত সাদা নরম ধাতু। এর রাসায়নিক সংযোগের শক্তি যথেষ্ট প্রবল, — সহজেই অন্যান্য পদার্থের সহিত এর রাসায়নিক মিলনের ফলে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়।

রুথেনিয়াম — মৌলিক ধাতু ; সাংকেতিক চিহ্ন Ru, পারমাণবিক

ওজন 101·7, পারমাণবিক সংখ্যা 44; অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। ধাতুটা অত্যধিক তাপসহ; এর গলনাঙ্ক 2450° সেন্টিগ্রেড। কোন কোন খনিজ পদার্থে প্ল্যাটিনাম ↑ ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

রোসেল সল্ট — সোডিয়াম পটাসিয়াম টার্টারেট নামক, [COOK. $(CH.OH)_2$. COONa. $4H_2O$] রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ নাম। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। বেকিং পাউডার ↑ সিড্‌লিজ পাউডার ↑ প্রভৃতি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়।

র‍্যাডন — রেডিয়াম ↑ ধাতুর তেজস্ক্রিয়তার ফলে যে গ্যাসীয় পদার্থের উদ্ভব হয়। মৌলিক পদার্থ বিশেষ; সাংকেতিক চিহ্ন Rn, পারমাণবিক ওজন 222, পারমাণবিক সংখ্যা 86; তেজস্ক্রিয়তার ফলে রেডিয়ামের পারমাণবিক গঠন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে ওই বিকিরিত তেজ-প্রবাহের সহিত র‍্যাডন গ্যাস নির্গত হয়। রাসায়নিক হিসেবে এটা ইনার্ট ↑, বা নোব্‌ল ↑ গ্যাসের পর্যায়ভুক্ত।

র‍্যাডিক্যাল — বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু সম্মিলিতভাবে যদি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একক পরমাণুর মত কাজ করে, অর্থাৎ নিজে অপরিবর্তিত থেকে অপর পরমাণুর সঙ্গে মিলে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তবে ওই পরমাণুসমষ্টিকে র‍্যাডিক্যাল বলা হয়; যেমন—NO_3 হোল নাইট্রেট র‍্যাডিক্যাল; সোডিয়াম নাইট্রেট $NaNO_3$, সিল্‌ভার নাইট্রেট $AgNO_3$, প্রভৃতির মধ্যে NO_3 র‍্যাডিক্যাল যেন একটা পরমাণুর মত বিভিন্ন ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে মিলে বিভিন্ন সল্ট ↑ উৎপন্ন করে। কিন্তু এরূপ কোন র‍্যাডিক্যালের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। এরূপ বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে OH র‍্যাডিক্যাল মিলিত হয়ে তৈরী হয় মিথাইল অ্যালকোহল ↑ (CH_3OH), ইথাইল অ্যালকোহল ↑ (C_2H_5OH), ইত্যাদি।

র‍্যাডার — বহু দূরবর্তী অদৃশ্য বস্তুর (বিশেষতঃ বিমানপোতের) গতি, অবস্থান, দূরত্ব প্রভৃতি নির্ধারণের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। রেডিও-ডাইরেক্টিং-অ্যাণ্ড-রেঞ্জিং কথাটা সংক্ষেপ করে যন্ত্রটার নাম র‍্যাডার দেওয়া হয়েছে। এ যন্ত্রের মোটামুটি কৌশল হোল: রেডিও প্রেরক-যন্ত্র থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ (ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑)

প্রেরিত হয়। এই তরঙ্গগুলো দূরবর্তী অদৃশ্য এরোপ্লেনের গায়ে প্রতিহত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ; সেই প্রতিফলিত তরঙ্গমালা এসে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যাগত ওই তরঙ্গ-প্রবাহের গতি লক্ষ্য করে প্রতিফলক এরোপ্লেনের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। প্রেরিত বেতার তরঙ্গের গতি-বেগ জানলে
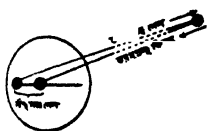
র‍্যাডারে তরঙ্গ প্রতিফলন

প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার সময় থেকে এরোপ্লেনের দূরত্ব হিসাব করে জানা যেতে পারে। আজকাল জাহাজেও এই র‍্যাডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ; মহাসমুদ্রে এর সাহায্যে বহু দূরবর্তী অদৃশ্য তীর দেশের দূরত্ব, দিক প্রভৃতি নির্ণীত হয়ে থাকে।

লং সাইট — চক্ষু-গোলকের এক প্রকার দৃষ্টিদোষ ; হাইপারমেট্রোপিয়া। চোখের এরূপ ত্রুটির জন্তে নিকটবর্তী জিনিস পরিষ্কার দেখা যায় না, বরং দূরের জিনিস ভাল দেখায়। কনভেক্স (উত্তল) লেন্সের চশমা ব্যবহারে চোখের এ দোষ সংশোধিত হয়।

লঙ্গিচিউড — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ভেদ করে যে বৃত্তরেখাগুলো ভূ-গোলককে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়, তাদের বলে লাইন্‌স অব লঙ্গিচিউড, বাংলায় বলে দ্রাঘিমা রেখা। এগুলোকে আবার মেরিডিয়ান বা লাইন্‌সও বলে। মানচিত্রে

লঙ্গিচিউড

এরূপ বৃত্তরেখা অঙ্কিত করে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্ণীত হয়। যে মেরিডিয়ান বা লঙ্গিচিউড লাইন ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ নামক স্থানের উপর দিয়ে গেছে বলে কল্পনা করা হয়েছে, তাকে বলে **প্রাইম মেরিডিয়ান**, অর্থাৎ 0° ডিগ্রি লঙ্গিচিউড। এর পূর্বে পশ্চিমে মোট 360° ডিগ্রির বিভিন্ন লঙ্গিচিউড লাইন কল্পিত হয়েছে।

লঙ্গিচিউডিন্যাল ওয়েভ — মাধ্যম পদার্থের কণিকাগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে প্রবাহ-পথের বরাবর যেরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শব্দ-তরঙ্গ এরূপ লঙ্গি-

চিউডিন্যাল গতিতে অগ্রসর হয়; বায়ু-কণাগুলো তরঙ্গ-প্রবাহের গতিপথে পর্যায়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত ও সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়ে হয়ে তরঙ্গধারা এগিয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে বাতাসের কোন অংশ ছুটে যায় না, শব্দসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের সংকোচন প্রসারণের ফলে বায়ু-সমুদ্রে উত্থিত ঢেউগুলো এগিয়ে যায় (সাউণ্ড ↑)। আলোক বা বেতার তরঙ্গের গতি এরূপ লঙ্গিচিউডিন্যাল নয়—সেগুলো ট্রান্সভার্স ↑।

লড্যানাম্ — অ্যালকোহল ↑ ও আফিম মিশ্রিত জলীয় দ্রব: আফিমের টিংচার ↑।

লাইজল — এক প্রকার অ্যান্টি-সেপ্টিক ↑ তরল পদার্থের ব্যবহারিক নাম। পদার্থটা সাবান জলের সঙ্গে ক্রিজোল (ক্রিয়োজোট ↑) মিশিয়ে তৈরী হয়।

লাইট — আলোক: এক রকম তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ (ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক ওয়েভ ↑) প্রবাহের ফলে আলোকের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ-ধারাই হোল আলোক-রশ্মি। আলোক-রশ্মি কোন বস্তুর উপর প্রতিফলিত হলে তার আকার আকৃতি অনুযায়ী প্রতিফলিত রশ্মি এসে আমাদের চোখের লেন্সে পড়ে। এর ফলে রেটিনা ↑ সংলগ্ন স্নায়ুসমূহের প্রান্তদেশ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনার স্পন্দন মস্তিষ্কে পরিবাহিত হলে আমরা বস্তু দেখতে পাই। আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 4×10^{-5} সেন্টিমিটার ↑ থেকে 8×10^{-5} সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগায়। আলোক-তরঙ্গের এই দৈর্ঘ্য সীমার বেশী, বা কম দৈর্ঘ্যের (আল্‌ট্রা ভায়োলেট ↑) তরঙ্গ-রশ্মি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। আলোক-তরঙ্গের গতি সেকেণ্ডে মোটামুটি 1,86,326 মাইল $= 2.9978 \times 10^{10}$ সেন্টিমিটার।

লাইট-ইয়ার — আলোক-বর্ষ: জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদির দূরত্ব প্রকাশের জন্যে এই একক ব্যবহৃত হয়। এক আলোক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোক-রশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাই বুঝায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে চলে 186,326 মাইল; সুতরাং এক বছরে আলোকের গতি হবে $186,326 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$ মাইল, = প্রায় 6×10^{12} মাইল।

লাইট্নিং — মেঘের তড়িৎস্ফুরণ। বিভিন্ন কারণে উচ্চাকাশে মেঘের মধ্যে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়ে

থাকে। এরূপ বিভিন্ন তড়িৎ-চাপ-বিশিষ্ট দুইটা মেঘখণ্ডের মধ্যে, অথবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে তড়িৎশক্তি সঞ্চালিত হয়। এরূপ তড়িৎ সঞ্চরণের সময়ে স্ফুরিত তড়িতের দীপ্তি প্রকাশ পায়, মেঘের গর্জন শুনা যায়; একেই আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকানো। মেঘ থেকে এই তড়িৎ-স্রোত পৃথিবীতে এলে তাকে সাধারণ কথায় বলে বজ্রপাত।

লাইট্‌নিং কণ্ডাক্টর — লাইট্‌নিং বা বজ্রপাতের ফলে অনেক সময় গৃহাদি বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই বিপদ নিবারণের জন্যে তড়িৎ-পরিবাহী মোটা কোন ধাতব তার বা রড্ (সাধারণতঃ লোহার) বাড়ীর ছাদের সর্বোচ্চ স্থান থেকে মাটি পর্যন্ত সংযুক্ত করে রাখা হয়। এরূপ একাধিক সূক্ষ্মাগ্র কণ্ডাক্টর বাড়ীর ছাদে থাকলে বাড়ীর যে অংশেই বজ্রপাত হোক না কেন, আগত তড়িৎশক্তি ওই রডের মাধ্যমে দ্রুত মাটির ভিতর পরিবাহিত হয়ে যায়, ফলে বাড়ী রক্ষা পায়।

লাইম — ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO; লাইম স্টোন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন পাথর স্বল্প বায়ুতে বিশেষ ব্যবস্থায় পুড়িয়ে যে সাদা কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। একে বলে **কুইক্-লাইম**। এই কুইক-লাইমের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনে হয় নরম চূণ, যাকে বলে **স্লেক্‌ড লাইম**, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$; এই হোল সাধারণ চূণ, যা আমরা ব্যবহার করি। কুইক লাইমের সঙ্গে জলের রাসায়নিক মিলনে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে (এক্সোথার্মিক ↑ রিঅ্যাকসন)।

লাইম স্টোন — বিভিন্ন পাথর; স্বভাবজাত ক্যালসিয়াম কার্বনেট, $CaCO_3$; পৃথিবীর পাহাড় পর্বত যা দিয়ে গঠিত।

লাইম ওয়াটার — চূণের জল; ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের $[Ca(OH)_2]$ জলীয় দ্রব। এর সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাসের মিলনে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সৃষ্টি হয়। জলে অদ্রাব্য এই ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উৎপত্তির ফলে পরিষ্কার লাইম ওয়াটার সাদা ঘোলাটে হয়ে ওঠে। উন্মুক্ত স্থানে রাখলে বায়ুর সংস্পর্শে চূণের জল এরূপ ঘোলাটে হয়ে যায়। এ থেকে বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

লাফিং গ্যাস — নাইট্রাস অক্সাইড, N_2O; বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ,

মিষ্ট গন্ধযুক্ত ; নাকে গেলে হাসির ভাব উদ্রিক্ত হয়ে থাকে ; এজন্যেই একে লাফিং গ্যাস বলে। মৃদু অ্যানেস্থ্যাটিক ↑ শক্তিরজন্যে দন্ত-চিকিৎসাদিতে কখন কখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লাম্বার পাংচার — পেল্‌ভিজের ↑ উপরে যে পাঁচ খানা হাড়ের সংযোগে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ গঠিত, তাদের বলে **লাম্বার** হাড়। মেরুদণ্ডের ওই হাড়ের সংযোগস্থলে সূঁচ ফুটিয়ে অভ্যন্তরস্থ রস বার করে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে লাম্বার পাংচার। এই রস মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে চলাচল করে। ম্যানেঞ্জাইটিস্‌ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় এই রস পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়।

লাম্বার

লার্জ ক্যালোরি — উত্তাপ পরিমাপের একক বিশেষ। এর পরিমাণ এক কিলোগ্র্যাম ক্যালোরি ↑, =1000 ক্যালোরি। (ক্যালোরি ↑)।

লিকুইড এয়ার — তরল বায়ু। উপযুক্তরূপে চাপ বৃদ্ধি করে ও তাপ কমিয়ে বায়ুকে তরল অবস্থায় আনা যায়। তরল বায়ুর বর্ণ ঈষৎ নীলাভ। এর মধ্যে বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস দুটি একত্রে তরল অবস্থায় থাকে ; অবশ্য সংগঠক অন্যান্য রেয়ার গ্যাসগুলোও একত্রে তরল হয়ে মিশ্রিত থেকে যায়। তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক −182·9° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং তরল নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক −105·7° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সুতরাং স্ফুটনাঙ্কের এই পার্থক্যের জন্যে তরল বায়ু থেকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস ফ্রাক্‌সন্যাল ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় সহজেই পৃথক করা যেতে পারে।

লিকুইফ্যাক্সন অব গ্যাসেস্‌ — গ্যাসীয় পদার্থের তরলীকরণ প্রক্রিয়া। প্রত্যেক গ্যাসেরই একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা (ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ↑) থাকে, যার চেয়ে কম উষ্ণতায় গ্যাসটাকে কেবল মাত্র চাপ প্রয়োগেই তরল করা সম্ভব হয়। স্বাভাবিক উষ্ণতা এই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের উপরে হলে গ্যাসটাকে প্রথমে উপযুক্ত কৌশলে ঠাণ্ডা করে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নীচে এনে তারপর চাপ বৃদ্ধি করে তরল করা যেতে পারে। গ্যাসের তাপ কমিয়ে ইচ্ছানুযায়ী ঠাণ্ডা

করবার নানা রকম যান্ত্রিক কৌশল ও প্রক্রিয়া আছে।

লিগ্নিন—উদ্ভিদ-দেহের সেলুলোজ ↑ স্তর মধ্যস্থিত জটিল রাসায়নিক গঠনের এক প্রকার জৈব পদার্থ। সাধারণতঃ জিনিসটা সেলুলোজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ ↑ থেকে কাগজ, রেয়ন ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করবার পূর্বে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই লিগ্নিন দূরীভূত করে সেলুলোজকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন হয়।

লিগ্নাইট — এক প্রকার কাল্‌চে ধূসর বর্ণের খনিজ কয়লা বিশেষ। সাধারণ (অ্যান্‌থ্রাসাইট্‌ ↑) কয়লার চেয়ে এর মধ্যে হাইড্রোকার্বনের ↑ ভাগ অনেক বেশী থাকে। সম্ভবতঃ সাধারণ কয়লার স্তর সৃষ্টির অনেক কাল পরে ভূ-গর্ভে এই লিগ্নাইটের স্তর সৃষ্টি হয়েছে। লিগ্নাইট জ্বালিয়েও যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়।

লিট্‌মাস — স্বভাবতঃ নীল রংয়ের এক প্রকার উদ্ভিজ্জ রঙীন পদার্থ; জলে দ্রবণীয়। অ্যাসিডের ↑ সংস্পর্শে লিট্‌মাসের রং লাল হয়ে যায়, এবং অ্যালকালির ↑ সংস্পর্শে পুনরায় নীল হয়। এরূপ বর্ণ পরিবর্তনের জন্যে রসায়নাগারে পদার্থটা ইণ্ডিকেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লিট্‌মাসের দ্রবণে কাগজ ডুবিয়ে শুকিয়ে নিয়ে লিট্‌মাস-পেপার তৈরী হয়; যা দিয়ে সাধারণতঃ অ্যাসিড বা অ্যাল-কালি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

লিটার — মেট্রিক সিস্টেমে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একটা একক। 4° সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় ও 760 মিলিমিটার ↑ চাপে (ব্যারোমিটার ↑) এক কিলোগ্র্যাম ↑ বিশুদ্ধ জলের আয়তনকে বলে এক লিটার। সাধারণতঃ 1000 সি, সি (ঘন সেন্টিমিটার ↑) এক লিটারের সমান ধরা হয়; প্রকৃতপক্ষে এক লিটার = 1000·027 সি. সি.। লিটারের 1000 ভাগের এক ভাগকে বলে মিলিলিটার।

লিডেন্ জার — স্থির (স্ট্যাটিক ↑) তড়িৎ-শক্তির সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্যে উদ্ভাবিত যন্ত্র বিশেষ। একে এক রকম কণ্ডেন্সার ↑ বলা যায়। যন্ত্রটা হোল মুখ্যতঃ একটা কাঁচ পাত্র; যার নিম্নাংশের ভিতর ও বহির্ভাগ পাতলা সীসার পাতে মোড়া। পাত্রটার মুখে কোন তড়িৎ-প্রতিরোধক পদার্থে তৈরী ঢাক্‌নার ছিদ্রপথে পিতলের

একটা দণ্ড পাত্রের মধ্যে বিলম্বিত থাকে। ওই দণ্ডের নিম্নপ্রান্তে সংলগ্ন ধাতব শিকল ঝুলে ভিতরের
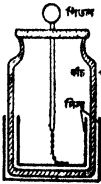
লিডেন্ জার

সীসার পাতে লেগে যায়। ওই ধাতব দণ্ডের মাধ্যমে তড়িৎশক্তি প্রবাহিত করলে তা যন্ত্রের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। স্থির (স্ট্যাটিক) তড়িতের বিভিন্ন প্রয়োজনের সময়ে ওই দণ্ড ও বহিস্থ সীসার পাত ধাতব তারের দ্বারা প্রায় সংযুক্ত করলে ওই সংযোগ মুখের স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে আবার তড়িৎ-শক্তি পাওয়া যায়। এরূপে প্রাপ্ত তড়িৎ তীব্র স্ফুরণের (স্পার্ক) আকারে নির্গত হয়ে থাকে।

লিথার্জ — লেড মনোক্সাইডের, PbO, বিশেষ নাম। লাল আভাযুক্ত হলদে স্ফটিকাকার পদার্থ। পেইন্ট, ভার্নিস প্রভৃতির রং তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁচ-শিল্পেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লিথিয়াম — মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Li; পারমাণবিক ওজন 6·94, পারমাণবিক সংখ্যা 3; রূপোর মত সাদা ও অত্যন্ত হাল্কা ধাতু। সোডিয়ামের ↑ অনুরূপ রাসায়নিক ধর্ম-বিশিষ্ট। নানা রকম হাল্কা সংকর ধাতু তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। মৌলিক ধাতুগুলোর মধ্যে লিথিয়াম সব চেয়ে হাল্কা।

লিথোপোন — জিঙ্ক সাল্ফাইড (ZnS) ও বেরিয়াম সাল্ফেটের ($BaSO_4$) সংমিশ্রণে তৈরী এক রকম সাদা পদার্থ। রং তৈরীর জন্য হোয়াইট লেডের ↑ পরিবর্তে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

লিথোস্ফিয়ার — পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের প্রস্তরময় স্তর। ভূ-গোলকের উপরিভাগের মৃত্তিকা স্তরের নীচে বহু মাইল গভীর যে কঠিন শিলাস্তর রয়েছে।

লিথোগ্রাফি — প্রস্তর ফলকের উপর অঙ্কিত চিত্র থেকে কাগজে চিত্র মুদ্রণের এক প্রকার কৌশল। এজন্যে লাইম স্টোনে ↑ তৈরী মসৃণ ফলকের উপরে তৈলাক্ত কালি দিয়ে ছবি আঁকা হয়, পরে বিশেষ কৌশলে মুদ্রণ-যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের উপর ওই ছবির ছাপ তোলা হয়। এই কৌশলে নানাবর্ণের ছবিও মুদ্রিত হয়ে থাকে। এরূপ মুদ্রণকে লিথোপ্রিন্টিং বলে।

লিবিগ্ কণ্ডেন্সার — যে যন্ত্রের সাহায্যে ডিস্টিলেসন ↑ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বাষ্পীয় পদার্থকে সঙ্গে সঙ্গে

পুনরায় তরল পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। সাধারণ লিবিগ্-কণ্ডেন্সারে একটা সরু কাঁচনলের
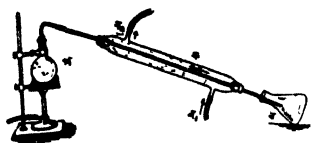
লিবিগ কণ্ডেন্সার

বহিরাবরণ স্বরূপ আর একটা মোটা কাঁচনল সংযুক্ত থাকে। বাষ্পীয় ডিস্টিলেট ↑ ওই সরু কাঁচনলের ভিতর দিয়ে নির্গমনের সময়ে বাইরের নলের মধ্যে প্রবাহিত ঠাণ্ডা জল-প্রবাহের সংস্পর্শে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে পাত্রে জমে।

লিভার — এক রকম যন্ত্র বিশেষ। কোন স্থির সূক্ষ্মাগ্র বস্তুর উপর শয়ানভাবে একটা দণ্ড স্থাপন করলে দণ্ডটা ওই স্থির অবস্থানের দুদিকে ঢেঁকি-কলের মত সহজে ওঠা নামা করতে পারে। এরূপ দণ্ডকে বলে লিভার। ওই স্থির সূক্ষ্মাগ্র বস্তুকে বলে লিভারের **ফালক্রাম** ↑। ফালক্রামের উপর দণ্ডটা

ফালক্রাম

লিভার

উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে ওর এক প্রান্তে সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে অপর প্রান্তে যথেষ্ট বেশী (ভার উত্তোলন প্রভৃতি) কাজ পাওয়া যায়। একেই বলে লিভারের **মেকানিক্যাল এড্‌ভান্টেজ**, বা যান্ত্রিক সুবিধা। লিভারের এই যান্ত্রিক সুবিধার পরিমাণ নির্ভর করে দু-দিকের বিপরীত শক্তির প্রয়োগ-রেখার উপরে ফালক্রাম থেকে অঙ্কিত লম্বদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। এরূপ লিভার ব্যবহার সাহায্যেই ক্রেন-যন্ত্র দ্বারা মালপত্র উত্তোলিত হয়।

লিভার অব সাল্‌ফার — পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) ও গন্ধক মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়। পদার্থটা প্রধানতঃ পটাসিয়াম সালফাইড ও গন্ধকের সংমিশ্রণ মাত্র। উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর পোকা-মাকড় ও ছত্রাক প্রভৃতি বিনষ্ট করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

লিমোনাইট — এক প্রকার লৌহ-ঘটিত খনিজ পদার্থ। হলদে রং-এর (হাইড্রেটেড) ফেরিক অক্সাইড, Fe_2O_3। ম্যাগ্নেটাইট ↑ ও হ্যামেটাইট ↑ নামক লৌহ-খনিজ পদার্থের রূপান্তরের ফলে এর সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ জলমগ্ন স্থানে লিমোনাইট পাওয়া যায়।

লুনার কস্টিক — সিল্‌ভার নাইট্রেট ↑ $AgNO_3$; এক রকম সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে পারে

না, এমন অন্ধকার পাত্রে দ্রবীভূত করে পদার্থটাকে সাধারণতঃ দণ্ডের আকারে ছাঁচে ঢালাই করা হয়। আলোকের সংস্পর্শে কালো হয়ে যায় বলে কালো কাগজ মুড়ে এই দণ্ডগুলো বাজারে বিক্রয় হয়। পদার্থটা সাধারণতঃ ফটোগ্রাফির ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লুনার ইক্লিপ্‌স — ইক্লিপ্‌স, লুনার ↑।

লুমিনাস্ পেইণ্ট — ক্যালসিয়াম সালফাইড প্রভৃতি বিভিন্ন ফস্‌ফোরেসেণ্ট ↑ পদার্থে তৈরী এক প্রকার রং। এরূপ পেইণ্ট মাখানো বস্তু অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়। দিনে সূর্যালোক শুষে নিয়ে ওই পেইণ্ট রাত্রির অন্ধকারে সেই আলোক বিকিরণ করে থাকে।

লুমিনসিটি — আলোকের ঔজ্জ্বল্য; কোন আলোকের উৎস থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির এই ঔজ্জ্বল্য লুমেন ↑ এককে মাপা হয়।

লুমিনেসেন্স — কোন পদার্থের আলোক বিকিরণের স্বাভাবিক ধর্ম। উপযুক্তরূপে উত্তপ্ত করলে সব পদার্থ থেকেই আলোক ও উত্তাপ বিকিরিত হয়; কিন্তু উত্তাপ ব্যতিরেকেই স্বভাবতঃ কোন কোন পদার্থে যে আলোক বিকিরণের ধর্ম লক্ষিত হয়। পদার্থের ফস্‌ফোরেসেন্স ↑ ও ফ্লোরেসেন্স ↑ ধর্মকেই সাধারণভাবে বলা হয় লুমিনেসেন্স, এবং এরূপ পদার্থকে বলে লুমিনেসেণ্ট পদার্থ।

লুমেন — কোন আলোক-উৎস থেকে বিকিরিত আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের একক। এক ক্যাণ্ডেলা ↑ পরিমাণের আলোক-বিশিষ্ট উৎস থেকে এক সেণ্টিমিটার ↑ দূরবর্তী এক বর্গ সেণ্টিমিটার স্থানে এক সেকেণ্ডে যে পরিমাণ আলোকপাত হয়, তার ঔজ্জ্বল্যকে বলে এক লুমেন। সাধারণতঃ আলোকের ঔজ্জ্বল্য মেপেই আলোকপাতের মোট পরিমাণ স্থির করা হয়।

লেক্‌ল্যান্স সেল—তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র বিশেষ; এক রকম প্রাইমারি সেল ↑। এর মধ্যে একটা কার্বন ↑ দণ্ডকে ধন-তড়িদ্বার (পজিটিভ ইলেক্ট্রোড ↑) করা হয়। কার্বন দণ্ডের চারদিকে থাকে ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড ও কয়লার গুঁড়ো সংমিশ্রিত পদার্থ। এ সব একটা সছিদ্র পোর্সিলেন পাত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়। এই পাত্রটা জিঙ্কের ↑ তৈরী অপর একটা বৃহত্তর পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দুই পাত্রের মাঝে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ↑ (NH_4Cl) দ্রব দেওয়া হয় ইলেক্ট্রোলাইট ↑ হিসেবে। জিঙ্কের

পাত্রটা ঋণ-তড়িদ্বারের (নেগেটিভ ইলেক্ট্রোড) কাজ করে। তড়িৎ-পরিবাহী তার দিয়ে এখন ভিতরের কার্বন-দণ্ড ও বাইরের জিঙ্ক-পাত্র

ল্যাক্‌ল্যান্স ড্রাই সেল
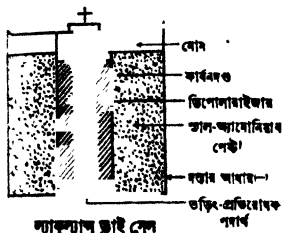
সংযোগ করে দিলে জিঙ্ক ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি ওই তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে থাকে। ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড (MnO_2) ডিপোলারাইজার ↑ হিসেবে কাজ করে। এ ভাবে উৎপন্ন তড়িৎ তারের মাধ্যমে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। আবার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবের পরিবর্তে তার এক রকম আঠালো পেস্ট ব্যবহার করে ড্রাই-সেল ↑ তৈরী হয়। এরূপ ড্রাই (লেক্‌ল্যান্স) সেল সাধারণ টর্চ বাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেড — সীসা। মৌলিক ধাতু; ল্যাটিন নাম **প্লাম্বাম** থেকে এর সাংকেতিক চিহ্ন করা হয়েছে Pb; পারমাণবিক ওজন 207·21, পারমাণবিক সংখ্যা 82; নীলাভ সাদা নরম ধাতু। গ্যালেনা ↑ নামক খনিজ লেড সালফাইড (PbS) রিভার্বেটরি ফার্নেসে ↑ উত্তপ্ত করে ধাতব সীসা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। সীসার যৌগিক পদার্থগুলো সবই বিষাক্ত; সাধারণতঃ পেইন্ট তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত হয়। জলের পাইপ, ছাপার টাইপ প্রভৃতি তৈরী করতে প্রধানতঃ সীসা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেড অ্যাসিটেট — সীসা ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন [$(CH_3COO)_2$ Pb. $3H_2O$] সল্ট; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ। জলে দ্রবণীয়, মিষ্ট স্বাদ যুক্ত, কিন্তু বিষাক্ত। পদার্থটা 'সুগার অব লেড' নামেও পরিচিত।

লেড অ্যাকুমুলেটর — অ্যাকুমুলেটর ↑ ।

লেড চেম্বার প্রোসেস — ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) প্রস্তুত করবার একটা প্রণালী। সীসার তৈরী প্রকাণ্ড চেম্বারের (কামরা) মধ্যে এই প্রণালীতে অ্যাসিডটা তৈরী হয়। এর প্রস্তুত প্রণালী হোল মোটামুটি এইরূপ: সালফার (গন্ধক) পুড়িয়ে উৎপন্ন সালফার ডাইঅক্সাইডের (SO_2) খুব

ওই লেড চেম্বারের মধ্যে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। উত্তাপের সাহায্যে কোন নাইট্রেট সল্ট ডিকম্পোজ করিয়ে ওই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপাদিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এ থেকে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন হয়ে থাকে। চেম্বারের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নাইট্রিক অক্সাইড পুনরায় নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়ে যায়। আর সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) জলের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) এই অবিশুদ্ধ জলীয় দ্রবকে বলা হয় **কমার্শিয়াল সালফিউরিক অ্যাসিড**। একে পরে নানা উপায়ে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়।

লেড মনোক্সাইড — লিথার্জ ↑।

লেড, হোয়াইট (বা **রেড**) — হোয়াইট লেড ↑, রেড লেড ↑।

লেন্স — বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট যে স্বচ্ছ পদার্থখণ্ডের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি পরিচালিত হলে রশ্মিগুলো এক বিন্দুতে সংহত, বা তা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়। লেন্স হয় সাধারণতঃ কাঁচের তৈরি; যার এক দিক বা উভয় দিক বক্রতল-বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যে লেন্সের মধ্যভাগ চার ধার অপেক্ষা মোটা, অর্থাৎ উপরিভাগ উত্তল, তাকে বলে **কনভেক্স** ↑ লেন্স আর, যে লেন্সের মধ্যভাগ পাতলা, অর্থাৎ উপরটা অবতল তাকে বলে **কন্‌কেভ** ↑ লেন্স। আলোকরশ্মি কন্‌ভেক্স লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে এক বিন্দুতে সংহত, অর্থাৎ মিলিত হয়; আর, কন্‌কেভ লেন্সের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ওই বিন্দুকে লেন্সের **ফোকাস** বলে। লেন্সের মধ্যবিন্দু বা **কেন্দ্র** থেকে ফোকাসের দূরত্বকে বলে **ফোকাল লেংথ**। টেলিস্কোপ ↑ মাইক্রোস্কোপ ↑ ক্যামেরা ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন রকম লেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
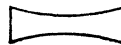
কনভেক্স লেন্স

কনকেভ লেন্স

লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস — সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3, প্রস্তুত করবার একটা পুরাতন প্রণালী। একে সল্ট কেক্ প্রোসেসও বলা হয়। এই প্রণালীতে সাধারণ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl

ও সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে উত্তপ্ত করে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম সালফেট, (Na_2SO_4) তৈরী হয়। একে সাধারণতঃ বলে **সল্ট-কেক্**। কয়লা ও লাইম স্টোনের ↑ সঙ্গে এই সল্ট-কেক উত্তপ্ত করে পাওয়া যায় অবিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট, যাকে বলে ওয়াসিং সোডা ↑।

লেসিথিন — এক শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা প্রায় জান্তব ফ্যাট্ ↑ বা চর্বির অনুরূপ। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহকোষে ও ডিমের হলুদে অংশে যথেষ্ট লেসিথিন থাকে; জীবজন্তুর স্নায়ু ও মস্তিষ্ক থেকেও পাওয়া যায়। লেসিথিনের প্রধান উপাদান হোল নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাস ↑ ; এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনও থাকে। বিভিন্ন টনিক ঔষধে লেসিথিন ব্যবহৃত হয়।

লেংথ — দৈর্ঘ্য। দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক :

10 লাইন্‌স = 1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার
12 ইঞ্চি = 1 ফুট
3 ফুট = 1 ইয়ার্ড, বা গজ
= ·9144 মিটার
22 ইয়ার্ড = 1 চেইন
10 চেইন = 1 ফার্লং
= 201·17 মিটার
8 ফার্লং = 1 মাইল
= 1609·3 মিটার

মেট্রিক সিস্টেমে দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন একক :

10 মিলিমিটার = 1 সেন্টিমিটার
= ·3937 ইঞ্চি
100 সেন্টিমিটার = 1 মিটার
= 1·0936 গজ
1000 মিটার = 1 কিলোমিটার
= ·62137 মাইল

লোকাস — কোন গতিশীল বস্তু, বা বিন্দুর সঞ্চরণ পথ। কোন নির্দিষ্ট নিয়মানুসারী কোন বিন্দু সঞ্চালিত হলে ওই বিন্দুর বিভিন্ন অবস্থানের সংযোগকারী রেখাকে বলে ওই বিন্দুর লোকাস। বৃত্তের পরিধি হোল কেন্দ্রের সমদূরবর্তী বিন্দুর এরূপ গতি-পথ, অর্থাৎ লোকাস।

লোডস্টোন — চৌম্বক শক্তি বিশিষ্ট বিভিন্ন লৌহ-খনিজ। ম্যাগ্নেটাইট ↑ প্রভৃতি স্বভাবজাত কতকগুলো অবিশুদ্ধ আয়রন অক্সাইডের, Fe_3O_4, স্বভাবতঃই চৌম্বক শক্তি লক্ষিত হয়, সাধারণ লোহা আকর্ষণ করে। চৌম্বক শক্তির পরিচয় মানুষ এরূপ লোড্‌স্টোন থেকেই প্রথম পায়। এজন্যে এক সময়ে সব ম্যাগ্নেটকেই ↑ লোডস্টোন বলা হতো।

ল্যাক্টিক অ্যাসিড — জৈব অ্যাসিড, $CH_3CH(OH)COOH$; বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ। টকে-যাওয়া দুধে অ্যাসিডটা পাওয়া যায়। এক রকম ব্যাক্টিরিয়ার ↑ প্রভাবে টকে যাওয়ার সময়ে দুধের উপাদান ল্যাক্টোজ ↑ নামক শর্করা ল্যাক্টিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ল্যাক্টিক অ্যাসিডের সাধারণতঃ দু' রকম স্টিরিয়ো আইসোমেরিক ↑ রূপ হয়ে থাকে ; এদের গুণ ও ধর্মের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

ল্যাক্টোজ — জান্তব শর্করা ; সব রকম প্রাণীর দুগ্ধে পাওয়া যায়, এজন্যে একে মিল্ক-সুগারও বলে। রাসায়নিক ফর্মুলা $C_{12}H_{22}O_{11}$; স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, মিষ্টত্ব অতি কম। হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় এই ল্যাক্টোজ গ্লুকোজ ↑ ও গ্যাল্যাক্টোজ নামক শর্করায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। আবার বিশেষ এক রকম ব্যাক্টিরিয়ার ↑ প্রভাবে দুধের এই ল্যাক্টোজ অংশ ল্যাক্টিক অ্যাসিডে ↑ রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

ল্যাক — লাক্ষা ; কক্কাস-লাক্কা জাতীয় স্ত্রী-লাক্ষাকীটের দেহনিঃসৃত আঠালো রস। কীট-অধ্যুষিত গাছের ডালে ওই রস শুকিয়ে লেগে থাকে, একে তখন বলে স্টিক-ল্যাক। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ থেকে চমৎকার লাল রং ও সেল্যাক ↑ নামে রঞ্জন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পে সেল্যাক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ল্যাকার — কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ, যার অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ লাগিয়ে বিভিন্ন জিনিসের ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সোডিয়াম সিলিকেট ↑, স্যালুলয়েড ↑ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের এরূপ ল্যাকার দিয়ে রঙীন পুতুল, পিতলের জিনিস প্রভৃতি অনেক দিন চক্‌চকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড — অশ্রু-গ্রন্থি ; চোখের বহিস্থ কোণের উপরদিকে অবস্থিত এই গ্রন্থি উত্তেজিত হলে লবণাক্ত জল উৎপন্ন হয়। দুঃখ বা বিষাদের উত্তেজনায় উৎপন্ন সেই জলই নলপথে অশ্রুরূপে চোখে আসে।

ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যাণ্ড

ল্যাভুলোজ — ফ্রাক্টোজ, বা ফ্রুট সুগার, $C_6H_{12}O_6$; (ফ্রাক্টোজ ↑)।

ল্যাটিচিউড (লাইন্‌স) — ভৌগোলিক অক্ষরেখা। সু-মেরু ও

কু-মেরু থেকে সমদূরবর্তীভাবে যে কাল্পনিক বৃত্তরেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে বলে মনে করা হয়, তাকে বলে নিরক্ষ বা বিষুব-রেখা (ইকোয়েটর ↑), অর্থাৎ 0° ডিগ্রি অক্ষরেখা। এই নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে উত্তর ও দক্ষিণে কাল্পনিক বৃত্তগুলোকে বলা হয় অক্ষরেখা, বা **প্যারালালস্ অব ল্যাটিচিউড**। ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান নির্দিষ্ট করবার জন্যে মানচিত্রে এরূপ ল্যাটি-চিউড (এবং লঙ্গিচিউড ↑) রেখাগুলো অঙ্কন করা হয়। ওই বিষুবরেখা বা নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে এক থেকে 90 ডিগ্রির অক্ষরেখা কল্পিত হয়। পৃথিবীর সুমেরু প্রান্তকে 90°-উত্তর এবং কুমেরুকে 90°-দক্ষিণ অক্ষাংশ ধরা হয়।
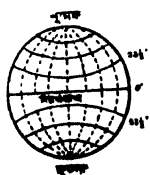
ল্যাটিচিউড লাইন্‌স

ল্যাটেন্ট হিট — হিট্, ল্যাটেন্ট ↑।

ল্যান্থানাম্ — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন La; পারমাণবিক ওজন 138·92, পারমাণবিক সংখ্যা 57; অন্যতম রেয়ার আর্থ ↑ ধাতু।

ল্যানোলিন — বিভিন্ন জীব-জন্তুর, বিশেষতঃ ভেড়ার লোম বা পশম থেকে মোমের মত যে এক রকম চর্বিজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। পদার্থটা **উল্ ফ্যাট** নামেও পরিচিত। নানারকম জটিল গঠনের রাসায়নিক জৈব পদার্থে এই ল্যানোলিন গঠিত। মানুষের গাত্রচর্মে পদার্থটা অতি দ্রুত শুষে যায়; এজন্যে বিভিন্ন মলম ও প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়।

ল্যাম্প ব্ল্যাক — ভূষা কালি; তেলের বাতি জ্বালালে উপরের ঢাকনায় যে কালি জমে। তেলের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে হাইড্রো-কার্বন ↑ বিশ্লিষ্ট হয়ে এর উৎপত্তি ঘটে। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা বিশুদ্ধ অ্যালোট্রোপিক ↑ কার্বন।

ল্যাম্বার্ট — আলোকের উজ্জ্বলতা পরিমাপের একক বিশেষ। যে সব প্রতিফলক-তল থেকে আলোক-রশ্মি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, তার উজ্জ্বলতা বা দীপ্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যেই বিশেষভাবে এই ল্যাম্বার্ট একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ কোন তলের ঔজ্জ্বল্য এক ল্যাম্বার্ট হবে যদি এক ক্যাণ্ডেলা ↑ আলোকপাতে তার এক বর্গ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান থেকে এক লুমেন ↑ আলোক প্রতিফলিত হয়।

ল্যামিনা — কোন পদার্থের পাতলা

স্তর বা পর্দা। ল্যামিনেটেড অর্থে পাত্‌লা পর্দার মত সিটে পরিণত করা কোন পদার্থ বুঝায়, যেমন — ল্যামিনেটেড স্টিল বললে ইস্পাতের পাত্‌লা সিট বুঝায়; ল্যামিনেটেড প্লাস্টিক ↑ মানে কাগজের মত পাত্‌লা প্লাস্টিকের পাত।

ল্যারিংস — শ্বাস-নলের উর্ধ্বভাগের প্রায় দু-ইঞ্চি পরিমাণ অংশ; যার মধ্যে বাক্‌-যন্ত্র অবস্থিত। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা বা অন্য কোন কারণে এই ল্যারিংস অংশের স্ফীতি বা প্রদাহজনিত রোগকে বলে **ল্যারিঞ্জাইটিস্**, যাতে লোকের স্বরভঙ্গ হয়।

ল্যারিংস

সফ্‌ট আয়রন — বিশুদ্ধ নরম লোহা; যে লোহার মধ্যে কার্বন বা অন্য কোন পদার্থ প্রায় থাকে না। উপযুক্ত পরিমাণে কার্বন মিশ্রিত করলে এরূপ লোহা কঠিন স্টিলে ↑ পরিণত হয়। সফ্‌ট আয়রনে চৌম্বক শক্তি স্টিলের মত স্থায়ী হয় না; চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে এর মধ্যে সঞ্চা[রিত] চৌম্বক ধর্ম সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সম্পূ[র্ণ] লোপ পায়। সফ্‌ট আয়রনে অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হয় না; আর্মেচার প্রভৃতি কোন কোন যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয় মাত্র।

সফ্‌ট ওয়াটার — মৃদু জল; যে জলে সাবান গুললে সঙ্গে সঙ্গে ফেনা হয়, এবং অল্প সাবানেই বস্ত্রাদি ভাল পরিষ্কৃত হয়ে থাকে। জলে ক্যাল-সিয়াম ↑, ম্যাগ্নেসিয়াম ↑, আয়রন প্রভৃতি ধাতুর কোন সল্ট ↑ দ্রবীভূত থাকলে সেরূপ জলে সাবানের সঙ্গে ওই সব সল্টের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অদ্রাব্য পদার্থ জন্মায়; সাবানে ভাল ফেনা ওঠে না, যথেষ্ট সাবানেও কাপড়-চোপড় তেমন পরিষ্কার হয় না। এরূপ ধাতব সল্ট মিশ্রিত জলকে বলে **হার্ড-ওয়াটার** ↑, বাংলায় বলে খর জল। এ রকম কোন ধাতব সল্ট বর্জিত বিশুদ্ধ জলকে বলে সফ্‌ট ওয়াটার।

সফ্‌ট সোপ — বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের ↑ পটাসিয়াম সল্টকে বলে সফ্‌ট সোপ। চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক পটাসের ↑ রাসায়নিক মিলনে এ জাতীয় নরম সাবান তৈরী হয়। ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম সল্ট

হোল সাধারণ সোপ ↑ ; যে সাবান আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি। (স্যাপোনিফিকেসন ↑)।

সর্ট সাইট — মাইয়োপিয়া ↑ ।

সর্ট সার্কিট — তড়িৎ-চক্রের যে ত্রুটির ফলে প্রয়োজনানুরূপ পথে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত না হয়ে হ্রস্বতম পথে প্রবাহিত হয়ে যায়। চিত্রে তড়িৎ-উৎস যেন একটা ব্যাটারি ↑ , বা জেনারেটর ↑ ; ওর ইলেক্ট্রোড ↑ দুটা তড়িৎ-পরিবাহী তারের দ্বারা সংযুক্ত করে একটা তড়িৎচক্র (সার্কিট ↑) সম্পূর্ণ করা হয়েছে ; যার ভিতরে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে বাতি জ্বলছে। এখন ওই চক্রের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তের ক ও প বিন্দুদ্বয় সহসা কোন কারণে যদি সংযুক্ত হয়ে পড়ে, (বা কোন তড়িৎ-পরিবাহী তারে যুক্ত হয়) তবে তড়িৎ-স্রোত হ্রস্বতম ক-প পথে প্রবাহিত হবে ; পূর্বের চক্র-পথে আর যাবে না ; ফলে বাতিও আর জ্বলবে না। এরূপ অবস্থাকে বলে সর্ট সার্কিট ; তড়িৎ-স্রোত ক ও প বিন্দুতে সর্ট সার্কিটেড, বা সর্টেড হয়েছে, এরূপ বলা হয়।
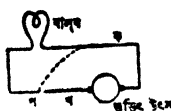
সর্ট-সার্কিট

সল — কোলয়ডাল সল্যুসন ↑ ; (কোলয়েড ↑)।

সল্ট (কেমিক্যাল) — অ্যাসিড ↑ ও বেসের ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। কোন বেসের ধাতব পরমাণু (অথবা ধাতব প্রকৃতিবিশিষ্ট কোন রেডিক্যাল ↑) কোন অ্যাসিডের হাইড্রোজেন পরমাণুর বিচ্যুতি ঘটিয়ে তার স্থান অধিকার করার ফলে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় ; যেমন — সালফিউরিক অ্যাসিড, (H_2SO_4) ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, (NaOH) মিলে হয় সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) সল্ট। এরূপ পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl), ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) ইত্যাদি।

সল্ট, কমন — কমন সল্ট ; সাধারণ লবণ, যার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। সোডিয়াম ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট। যে লবণ আমরা খাই।

সল্ট কেক — অবিশুদ্ধ সোডিয়াম সালফেট, $Na_2SO_4 . 10H_2O$; জমাট বাঁধা স্ফটিকাকার পদার্থ (লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস ↑)।

সল্টপিটার — নাইটার ↑ ; পটাসিয়াম নাইট্রেট ↑ , (KNO_3)। বাংলায় একে বলে সোরা। বারুদ তৈরী করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

চিলি সল্টপিটার হোল সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$)।

সল্ট অব লেমন — পটাসিয়াম কোয়াড্রক্সলেট, $KH_3C_4O_8.2H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার বিষাক্ত পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। এর জলীয় দ্রব দিয়ে কালির দাগ সহজে তোলা যেতে পারে।

সল্ডার — ধাতব পদার্থের বিভিন্ন অংশ পরস্পর জোড়া লাগাবার জন্যে ব্যবহৃত নিম্ন গলনাঙ্কের নরম সংকর ধাতু; যা অল্প তাপে সহজে গলে গিয়ে ধাতব জোড়ামুখে লেগে যায়। একে বাংলায় বলে রাং ঝাল। সাধারণতঃ সীসা ও টিন বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে **সফ্‌ট সল্ডার** তৈরী হয়। আর এক রকম সল্ডার তামা ও দস্তা মিশিয়ে তৈরী হয়, যাকে বলে **ব্রেজিং সল্ডার**।

সলিউট — দ্রাব্য পদার্থ। সাধারণতঃ যে তরল পদার্থের মধ্যে অপর কোন পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে সল্যুসনের ↑ সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **সলভেন্ট**, অর্থাৎ দ্রাবক পদার্থ; আর ওই দ্রবীভূত পদার্থকে বলে **সলিউট**, বাংলায় বলে দ্রাব্য। চিনির রসে জল সল্ভেন্ট, চিনি সলিউট, আর ওই রস হোল সল্যুসন, অর্থাৎ দ্রব বা দ্রবণ।

সলিড স্টেট — পদার্থের কঠিন অবস্থা; যে অবস্থায় পদার্থের সংগঠক অণুগুলো পরস্পর আকর্ষণের ফলে সংবদ্ধ হয়ে তার আকার আয়তন নির্দিষ্ট রাখে। বাইরের কোন শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত কঠিন পদার্থের আকারের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। তরল ও বায়বীয় অবস্থার মত কঠিন অবস্থায়ও পদার্থের অণুগুলো নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে; তবে কঠিন পদার্থে এই স্পন্দন স্থিরাবস্থার দু'দিকে অতি সামান্য সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে বলে অণুগুলো পরস্পরকে ছেড়ে যেতে পারে না। এ জন্যেই কঠিন পদার্থের আকার অপরিবর্তিত থাকে। কঠিন পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে এরূপ যুক্তির অবতারণা করা হয় (চেঞ্জ অব স্টেট ↑)।

সলিড সল্যুসন — বিভিন্ন কঠিন পদার্থের একীভূত সংমিশ্রণ। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে যে সংকর ধাতু সৃষ্টি হয় তাকে ওই ধাতুগুলোর সলিড সল্যুসন বলা যায়। অবশ্য তরল পদার্থের মধ্যে কঠিন পদার্থের দ্রবণ বা একীভূত সংমিশ্রণকেই সাধারণতঃ সল্যুসন ↑ বলা হয়।

সলিডিফাইং পয়েন্ট — স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোন তরল পদার্থ যে উষ্ণতায় (টেম্পারেচার ↑)

জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। সম্যক তরল পদার্থ জমে সম্পূর্ণরূপে কঠিনাকার না হওয়া পর্যন্ত এর এই উষ্ণতার, অর্থাৎ সলিডিফাইং পয়েন্টের কোন পরিবর্তন ঘটে না, একই থেকে যায়। একই বায়বীয় চাপে প্রত্যেক তরল পদার্থের এই সলিডিফাইং পয়েন্ট সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে (মেল্টিং পয়েন্ট ↑)।

সলিনয়েড — গোল রডের গায়ে ধাতব তার জড়িয়ে যেরূপ তার-কুণ্ডলী তৈরী হয়। ওই তারের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হলে কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে লম্বালম্বিভাবে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে কোন লৌহ দণ্ড ওই কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট করে রাখলে সেটা চৌম্বক শক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে।
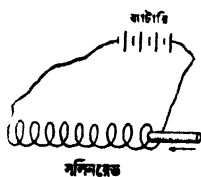
ব্যাটারি

সলিনয়েড

সলিস্টিস্ — পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একটা ডিম্বাকার কক্ষপথে প্রতি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে; এর ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। এভাবে সম্বৎসরে পৃথিবী সূর্য থেকে দু'বার সবচেয়ে দূরবর্তী হয়; এরূপ দু'দিন হোল সলিস্টিস্, বা অয়নান্ত দিন। 21 জুনকে বলা হয় উত্তর অয়নান্ত দিন, অর্থাৎ সূর্যের উত্তরায়নের শেষ দিন (**সামার সলিস্টিস্**); আর 22 ডিসেম্বর হোল দক্ষিণ অয়নান্ত দিন (**উইন্টার সলিস্টিস্**)। উত্তর অয়নান্ত দিনে
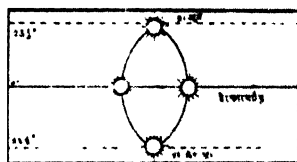
সলিস্টিস

মধ্যাহ্নকালে সূর্য কর্কট-ক্রান্তিতে (ট্রপিক অব ক্যান্সার, 23½° উত্তর অক্ষ-রেখা) অবস্থিত পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক মাথার উপরে থাকে; আবার দক্ষিণ অয়নান্ত দিনে মকরক্রান্তিতে (ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ণ, 23½° দক্ষিণ অক্ষ-রেখা) অবস্থিত সকল দেশে মধ্যাহ্ন সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে। (ইকুইনক্স ↑)

সল্যুসন — যে তরল পদার্থের মধ্যে এক বা একাধিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ তরল পদার্থের মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ গলে গিয়ে সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত থাকলে তাকেই বলে সল্যুসন; বাংলায় বলে দ্রব বা দ্রবণ।

অবশ্য তরল পদার্থের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থের সল্যুসনও হতে পারে। আবার দুই বা ততোধিক কঠিন পদার্থের মিশ্রণে যে সংকরধাতু (অ্যালয় ↑) উৎপন্ন হয়; অথবা কঠিন পদার্থের মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থ পরিশোষিত হলে তাকেও এক রকম সল্যুসন বলা যেতে পারে (সলিড সল্যুসন ↑)।

সল্যুবিলিটি — কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সল্ভেন্টের ↑ মধ্যে যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সলিউট ↑ দ্রবীভূত থাকতে পারে তার অনুপাতকেই ওই সলিউটের সল্যুবিলিটি বলে। সাধারণতঃ স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় 100 গ্র্যাম সল্ভেন্টের (জলের) মধ্যে যত গ্র্যাম সলিউট দ্রবীভূত থাকতে পারে তাকেই সলিউট পদার্থটার সল্যুবিলিটি, অর্থাৎ দ্রবণীয়তা বলা হয়।

সাউণ্ড — শব্দ। কোন বস্তুর বিশেষ দ্রুত কম্পনের ফলে সংলগ্ন বায়ুতে পর্যায়ক্রমিক চাপ-বৈষম্য ঘটে; ফলে, বায়ু-সমুদ্রে এক রকম তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বায়ুর মাধ্যমে প্রবাহিত এই তরঙ্গমালা এসে কানের পর্দা স্পন্দিত করে শব্দের অনুভূতি জাগায়। বায়ু-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার উপর শব্দ কর্ণগোচর হওয়া না হওয়া নির্ভর করে (অডিবিলিটি লিমিট ↑)। বায়ুর মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গ লঞ্জিচিউডিন্যাল গতিতে প্রবাহিত হয়ে শ্রোতার কাণে এসে পৌছয়। তরল পদার্থের মাধ্যমেও শব্দ-তরঙ্গের অপেক্ষাকৃত মৃদু স্পন্দন প্রবাহিত হয়ে থাকে। শব্দের তীব্রতা ও গতি তার মাধ্যমের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের গতি (0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়) প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট, বা 332 মিটার ↑; ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল।

সাইফন — সাধারণ এক রকম যন্ত্র বিশেষ; যার সাহায্যে কোন পাত্রের তরল পদার্থ নিম্নতলে রক্ষিত অপর কোন পাত্রে সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। সাইফন একটা বক্রনল মাত্র; ওই নলটি তরল পদার্থে সম্পূর্ণরূপে ভর্তি করে তার এক মুখ উচ্চ তরের পাত্রের তরল পদার্থে ডুবিয়ে দেওয়া হয়

সাইফন

ওই পাত্রস্থ তরল পদার্থের উপরে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রভাবে ওই তরল পদার্থ নলপথে উপরে উঠে যায় এবং নীচে

ধীরে নিম্নতল পাত্রের মধ্যে পড়তে থাকে। সাইফনের নল তরল পদার্থে পূর্ণ করে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা দরকার। কাঁচ বা রাবারের নল দিয়ে এরূপ সাইফনের ব্যবস্থা করা হয়। এক পাত্রের তরল পদার্থ সাইফনের এই সহজ ব্যবস্থায় অনায়াসে অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়ে থাকে।

সা ই ট্রি ক অ্যা সি ড — সাদা স্ফটিকাকার অম্ল স্বাদযুক্ত জৈব অ্যাসিড, $C_6H_8O_7$; বিভিন্ন অম্ল-স্বাদযুক্ত ফলের, বিশেষতঃ লেবুর রস থেকে পাওয়া যায়। টক লেবুর রসে প্রায় 6% সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। নানা রকম অম্ল-স্বাদী স্বাস্থ্যকর পানীয় প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

সা ই ক্লো ট্র ন — উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকা (যেমন—আল্ফা পার্টিকল, প্রোটন ↑ ইত্যাদি) উৎপাদনের জন্যে উদ্ভাবিত এক রকম জটিল যন্ত্র। যান্ত্রিক কৌশলে প্রচণ্ড গতি সঞ্চারণের ফলে আয়নায়িত কণিকাগুলো লক্ষ লক্ষ ইলেক্ট্রন ভোল্ট ↑ শক্তিবিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ শক্তিশালী কণিকার আঘাতে পদার্থের নিউক্লিয়াস ↑ (স্ট্রাক্‌চার অব অ্যাটম ↑) ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব হয়। এভাবে সোডিয়াম ↑ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থের নিউক্লিয়াস বিভাজনের (ফিসন ↑) ফলে পদার্থটা তেজস্ক্রিয়, অর্থাৎ রেডিও-অ্যাক্টিভ ↑ হয়ে ওঠে ; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের সৃষ্টি হয় (ট্রান্সমুটেসন অব এলিমেন্ট ↑)। সাইক্রোট্রন যন্ত্রের মূল ব্যবস্থা মোটামুটি এরূপ : ইংরেজী D অক্ষরের অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট শূন্যগর্ভ দুটো অর্ধ-বৃত্তাকার ইলেক্ট্রোডের উপরে নীচে দুটো অতি শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বক স্থাপিত হয়। ওই ইলেক্ট্রোডদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ বায়ুশূন্য ঘূর্ণায়মান পথে প্রবিষ্ট তড়িৎ-কণিকাগুলো বহিঃস্থ ওই শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। এই অর্ধবৃত্তাকার ইলেক্ট্রোডকে বলে 'ডি' ; বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গের প্রভাবে এই দুটো ডি-র অভ্যন্তরে বৃত্তাকারে ঘূর্ণন-শীল ওই তড়িৎকণিকাগুলো ক্রমশঃ ত্বরান্বিত হতে থাকে। এরূপ সঞ্চরণের ফলে ক্রমাগত দ্রুত
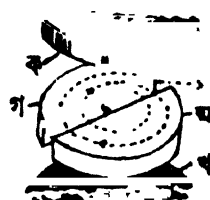
সাইক্রোট্রন

গতিশীল হতে হতে তাদের বৈদ্যুতিক বিভবও বর্ধিত হয়। এভাবে উপযুক্তরূপ শক্তিশালী হলে এদের সাহায্যে পদার্থের ফিসন ↑ ঘটান সম্ভব হয়ে থাকে।

সান — সূর্য; প্রায় গোলাকার একটা জলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড, জ্যোতিষ্ক বিশেষ। সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলো (সোলার সিস্টেম ↑) আপন আপন উপবৃত্ত কক্ষপথে ক্রমাগত ঘুরছে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল। সৌরপিণ্ডের ব্যাস প্রায় 8 লক্ষ 66 হাজার মাইল, ওজন (মাস ↑) 2×10^{27} টন; বিভিন্ন অংশের গড়ে উষ্ণতা প্রায় 5700° সেন্টিগ্রেড হবে। সূর্যের অভ্যন্তরে গ্যাসীয় পদার্থগুলোর মধ্যে পারমাণবিক ভাঙাগড়া চলছে, বিশেষতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম ↑ সৃষ্টি হচ্ছে; ফলে অহরহ প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হওয়ায় সূর্যের উষ্ণতা বজায় রয়েছে, কোটি কোটি বছর ধরে সূর্য এত তাপ ছড়িয়ে চলেছে। সূর্যরশ্মির স্পেক্ট্রাম অ্যানালিসিস ↑ থেকে জানা গেছে, পৃথিবীতে যে সব মৌলিক পদার্থ আছে তার অধিকাংশই সূর্যের অভ্যন্তরে গ্যাসীয় অবস্থায় বর্তমান।

সান স্পট — সৌরকলঙ্ক; সূর্য-গোলকের উপরিভাগে যে সব অনুজ্জ্বল স্থান দেখা যায়। চারদিকের ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় ওই সব স্থান নিষ্প্রভ হওয়ায় কালো দাগের মত দেখায়। সূর্যের নিজস্ব আবর্তনের ফলে ওই সব সৌর-কলঙ্কের স্থান পরিবর্তন লক্ষিত হয়, সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। মোটামুটি প্রতি 11 বছর পরে পরে পৃথিবী থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সৌরকলঙ্ক দৃষ্ট হয়ে থাকে। নৈসর্গিক কারণে সৌর কলঙ্কের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম ↑ ও অরোরা বোরিঅ্যালিসের ↑ আধিক্য পরি-লক্ষিত হয়।

সার্কল — বৃত্ত; কোন স্থির বিন্দু সমদূরবর্তীভাবে অপর কোন বিন্দুর সঞ্চরণ-পথের (লোকাস ↑) দ্বারা সীমাবদ্ধ গোলাকার ক্ষেত্র। ওই স্থির বিন্দুকে বলে বৃত্তের কেন্দ্র, বা **সেন্টার**; আর ওই গোলাকার সঞ্চরণ-রেখাকে বলে বৃত্তের পরিধি, বা **সারকামফারেন্স**। কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত সরল রেখাকে বলে ব্যাসার্ধ, বা **রেডিয়াস**; এই ব্যাসার্ধ রেখা উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তাকে বলে বৃত্তের ব্যাস, বা **ডায়মেটার**

পরিধির যে কোন দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখাকে বলে বৃত্তের **জ্যা**, বা **কর্ড**। কোন বৃত্তের পরিধি $=2\pi r$ এবং ক্ষেত্রফল $=\pi r^2$; এখানে r হোল ব্যাসার্ধ, বা রেডিয়াস এবং π (পাই ↑) হোল একটা নির্দিষ্ট রাশি, $=3{\cdot}14159\cdots$, = প্রায় 22/7 ।

সার্কিট (ইলেক্ট্রিক্যাল) — তড়িৎ-চক্র ; তড়িৎপ্রবাহের সম্পূর্ণ গতিপথ। তড়িৎ-পরিবাহী তারের অবিচ্ছিন্ন মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ সম্ভব হয়ে থাকে। যদি তড়িৎ-স্রোত কোন ব্যাটারি ↑ বা জেনারেটর ↑ থেকে বেরিয়ে প্রয়োজনীয়
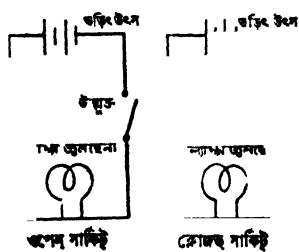
পথ ঘুরে পুনরায় উৎসে ফিরে আসে, অর্থাৎ উৎসের পজিটিভ ও নেগেটিভ ইলেক্ট্রোডদ্বয় ↑ অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়, তবেই একটি সম্পূর্ণ তড়িৎ-চক্র, বা সার্কিট রচিত হবে। তড়িৎপ্রবাহ একই তারে ব্যাটারি থেকে বাল্বের ফিলামেন্টের ↑ ভিতর দিয়ে আবার ব্যাটারিতে ফিরে এলেই সার্কিট সম্পূর্ণ হয়, ও তড়িৎপ্রবাহ সম্ভব হয়ে থাকে।

সায়েনাইড — হাইড্রোসায়েনিক (HCN) অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্ট ↑ ; যেমন — পটাসিয়াম সায়েনাইড, KCN। সায়েনাইড সল্ট মাত্রেই তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। সিল্ভার প্লেটিং ↑ প্রক্রিয়ায় ও খনিজ থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্যে সায়েনাইড সল্ট প্রয়োজন হয়।

সায়েনেট — সায়েনিক (HCNO) অ্যাসিডের সল্ট ; যেমন—পটাসিয়াম সায়েনেট, KCNO। সায়েনেট সল্টগুলো সায়েনাইড সল্টের মতই তীব্র বিষাক্ত পদার্থ।

সায়েনোজেন — তীব্র বিষাক্ত বর্ণহীন গ্যাস, C_2N_2 ; এর রাসায়নিক ধর্ম হ্যালোজেনের ↑ অনুরূপ। হ্যালোজেন শ্রেণীর ক্লোরিন ↑ গ্যাস যেমন বিভিন্ন ক্লোরাইড সৃষ্টি করে, সায়েনোজেন তেমনই বিভিন্ন সায়েনাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন করে।

সায়েনোটাইপ — ব্লু-প্রিন্ট ↑।

সায়েন্তামাইড — বর্ণহীন স্ফটিকাকার পদার্থ, NH_2CN ; হাইড্রোসায়েনিক ↑ অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক মিলনে গঠিত অ্যামাইড শ্রেণীর সল্ট। অবশ্য কেবল সায়েন্তামাইড বললে

সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড, $CaCN_2$ বুঝায়; পদার্থটা আবার **নাইট্রো-লাইম** ↑ নামেও পরিচিত, যা উদ্ভিদাদির পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট রাসায়নিক সার।

সি-ওয়াটার — সমুদ্রজল; লবণাক্ত সমুদ্রজলে লবণ ব্যতীত আরও নানা রকম ধাতব রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। মোটামুটি হিসেবে সমুদ্রজলে থাকে — জল 96·4%, লবণ (কমন সল্ট ↑, NaCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড) 2·8%, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড ($MgCl_2$) 0·4%, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট ($MgSO_4$) 0·2%, ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) প্রত্যেকে 0·1%; এ ছাড়া সামান্য ব্রোমাইড ↑ ও আয়োডাইড ↑ সল্টও কখন কখন সমুদ্রজলে পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বদা সব সমুদ্রের জলেই যে এরূপ হবে এমন কোন কথা নেই, তবে মোটামুটি এরূপ হয়ে থাকে।

সিক্যাণ্ট — (1) বৃত্তের ছেদক, অর্থাৎ যে সরল রেখা বৃত্তের পরিধি ছেদ করে উভয়দিকে চলে যায় এবং বৃত্তকে দুই সেগ্‌মেণ্টে ↑ বিভক্ত করে। এই সিক্যাণ্ট বা ছেদক দ্বারা বিভক্ত পরিধির দুই অংশকে বলে বৃত্তচাপ (আর্ক ↑)। (2) সমকোণী কোন ত্রিভুজের অতিভুজ (হাইপটেনিউজ) ÷ ভূমি (বেস), অর্থাৎ H B, এই অনুপাতকে ব... ভূমি সংলগ্ন কোণের (x) সিক্যাণ্ট; সংক্ষেপে লেখা হয় Sec x.

সিক্যাণ্ট
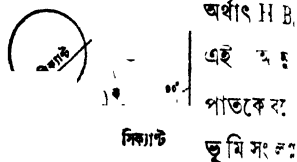
সিড্‌লিজ পাউডার — সোডিয়াম বাইকার্বনেট ↑, রোসেল সল্ট ↑ ও টার্টারিক অ্যাসিড ↑ মিশিয়ে এ চূর্ণ তৈরী হয়। জলে দিলে এ থেকে গ্যাস বেরোয়। এর দ্রব পা... হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ... জোলাপের কাজ করে।

সিডারাইট — এক প্রকার লৌহ খনিজ; স্বভাবজাত অবিশুদ্ধ ফেরাস কার্বনেটের ($FeCO_3$) বিশেষ নাম। এ থেকে বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

সিডিরিয়্যাল ইয়ার — আপন উপবৃত্ত (ডিম্বাকার) কক্ষপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ... সময় লাগে; অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বছর, = 365·2564 সৌর দিন। কোন স্থির জ্যোতিষ্কের তুলনায় এই সময়ে (বছরে) ...

যেন আবার একটা উপবৃত্ত কক্ষে জ্যোতিষ্কটাকে এক বার প্রদক্ষিণ করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কোন **গ্রহের** সিডিরিয়্যাল ইয়ার হোল আপন কক্ষপথে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে গ্রহটার (পৃথিবীর হিসাবে) যত দিন লাগে; যেমন,—মঙ্গলগ্রহের সিডিরিয়্যাল ইয়ার হোল আমাদের 687 দিন (মার্স ↑)।

সিডিরিয়্যাল ডে — নাক্ষত্রিক ; কোন আপাতদৃষ্ট স্থির জ্যোতিষ্কের তুলনায় পৃথিবীর আপন মেরুদণ্ডের উপরে একবার আবর্তিত হতে যে সময় লাগে। সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর এই সময় হোল আমাদের সাধারণ সৌর দিন, মোটামুটি 24 ঘণ্টা।

সিন্‌ক্রোট্রন — এক রকম বিশেষ যন্ত্র; যার সাহায্যে ইলেক্ট্রন ↑ প্রভৃতি কণিকাসমূহ অত্যধিক দ্রুত গতিশীল ও শক্তিশালী করা সম্ভব হয়ে থাকে। বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকা প্রচণ্ড শক্তিবিশিষ্ট করবার পক্ষে এ যন্ত্র বিটাট্রন ↑ ও সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্রের চেয়েও বেশী শক্তিশালী। বস্তুতঃ শেষোক্ত যন্ত্র দু'টার সম্মিলিত কৌশলে সিন্‌ক্রোট্রন যন্ত্রের জটিল ব্যবস্থাদি পরিকল্পিত ও উদ্ভাবিত হয়েছে।

সিনাবার — খনিজ মারকিউরিক সালফাইড, HgS; চক্‌চকে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। এই খনিজ থেকেই অধিকাংশ মার্কারি ↑, অর্থাৎ পারদ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বাংলায় একে বলে হিঙ্গুল।

সিমেন্ট — ইমারতাদি তৈরীর জন্যে যে চূর্ণ পদার্থ জল মিশিয়ে লাগালে ক্রমে অত্যন্ত কঠিন হয়ে এঁটে যায়। পদার্থটা রাসায়নিক হিসেবে মোটা-মুটি ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেটের ↑ মিলনে গঠিত। জল মেশালে জমে যাওয়ার সময়ে এর মধ্যে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। বিশেষ এক রকম লাইম স্টোন ↑ ও মাটি মিশিয়ে অত্যধিক তাপে গলিয়ে পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট তৈরী হয়ে থাকে। জমাট বাঁধা পদার্থটাকে পরে গ্রাইণ্ডিং যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ করে নেওয়া হয়।

সিমেন্টাইট — লোহা ও কার্বনের মিলনে উৎপন্ন একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑। পদার্থটার রাসায়নিক নাম আয়রন কার্বাইড, Fe_3C; অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর পদার্থ। কাস্ট আয়রনে ↑ পদার্থটা যথেষ্ট থাকে বলে তা এত ভঙ্গুর হয়। কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ উপযুক্ত

পরিমাণে মিশ্রিত থাকে স্টিল ↑, বা ইস্পাতে।

সিরাম — (1) রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকাগুলো যে এক রকম হরিদ্রাভ রসে ভেসে থাকে। বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ওই রক্ত-কোষগুলো পৃথক করে ফেললে এই সিরাম, বা জৈব রস পাওয়া যায়। একে সাধারণতঃ বলে লিম্‌প ↑ (2) বিশেষতঃ ঘোড়ার দেহে কোন রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে তার রক্তে ওই রোগ-জীবাণুর প্র তি রো ধ ক অ্যান্টিবায়োটিক ↑ পদার্থ সৃষ্টি করা হয়। ঘোড়ার এরূপ সিরাম নিয়ে ওই বিশেষ জীবাণু-দুষ্ট রোগীর দেহে অনুপ্রবেশ করান হয়, একেই বলে সিরাম ইন্‌জেক্‌সন। এই সিরামের অ্যান্টি-বায়োটিক পদার্থ রোগীর দেহের রক্তে জীবাণুদের আক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি রোধ করে।

সিরিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Ce, পারমাণবিক ওজন 140·13, পারমাণবিক সংখ্যা 58; ইস্পাতের মত কতকটা ধূসর বর্ণের, কিন্তু নরম ধাতু। মোনা-জাইট ↑ প্রভৃতি কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য খনিজ থেকে পাওয়া যায়। গ্যাস লাইটের ম্যান্টেল ↑ ও সিগারেট লাইটারের তথাকথিত ফ্লিন্ট ↑ তৈরী করতে পাইরোফোরিক ↑ অ্যালয় সিরিয়াম প্রয়োজন হয়।

সিলভার — রৌপ্য, মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ag (আর্জেন্টাইন), পারমাণবিক ওজন 107·85, পারমাণবিক সংখ্যা 47; সাদা ও অপেক্ষাকৃত নরম ধাতব পদার্থ সহজেই এর তার ও পাত করা যায় সব চেয়ে ভাল তড়িৎ-পরিবাহী ধাতু। কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ অবস্থায় রৌপ্য পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ রৌপ্যই সিলভার সালফাইড (Ag_2S), সিলভার ক্লোরাইড, ($AgCl$) প্রভৃতি খনিজ থেকে নিষ্কাশিত হয়। খনিজ সিলভার সালফাইড সাধারণতঃ **আর্জেন্টাইন** বা **সিলভার-গ্ল্যান্স** নামে পরিচিত। সিলভার ক্লোরাইড খনিজকে বলে **হর্ণ-সিলভার**। মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি তৈরীর জন্যে রূপা যথেষ্ট প্রয়োজন হয়। এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ফটোগ্রাফিতে ↑ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিলভার নাইট্রেট — একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় সিলভার সল্ট, $AgNO_3$ পদার্থটা **লুনার কস্টিক** নামেও পরিচিত। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ জলে দ্রবণীয়। বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজে, ঔষধ হিসেবে ও কাপড় চিহ্নিত করার কালি (মার্কিং

হক) তৈরী করবার জন্যে সল্টটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

সিলভার প্লেটিং — রূপার ইলেক্ট্রোপ্লেটিং ↑; কোন সিলভার সল্টের ইলেক্ট্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন ধাতব জিনিসের উপরে রূপার পাতলা আস্তরণ দেওয়ার কৌশল।

সিলিকন — মৌলিক পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Si, পারমাণবিক ওজন 28·06, পারমাণবিক সংখ্যা 14; রাসায়নিক হিসেবে কার্বনের ↑ অনুরূপ পদার্থ। এর দু'রকম অ্যালোট্রোপ ↑ দেখা যায়—একটা পাটকিলে রঙের চূর্ণ; অপরটা গাঢ় ধূসর বর্ণের স্ফটিকাকার। বিভিন্ন প্রকার স্বভাবজাত সিলিকা ↑, সিলিকেট ↑ প্রভৃতি এর বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে গঠিত।

সিলিকা — সিলিকন ডাইঅক্সাইড, SiO_2; বর্ণহীন কঠিন অদ্রাব্য পদার্থ। অত্যধিক তাপ ব্যতীত গলে না। সাধারণ বালুকা, কোয়ার্জ ↑, ফ্লিন্ট ↑, রক ক্রিস্টাল ↑ প্রভৃতি সবই সিলিকা; বিভিন্ন আকারে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কাঁচের প্রধান উপাদান হোল এই সিলিকা (গ্লাস ↑)। বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে বিভিন্ন সিলিকেট ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়, যেমন — সোডিয়াম সিলিকেট, $NaO.SiO_2$ অর্থাৎ $NaSiO_3$; ক্যালসিয়াম সিলিকেট, $CaSiO_3$; যা বিভিন্ন পাথরের একটা প্রধান উপাদান।

সিলিকেট — সিলিসিক অ্যাসিডের (H_2SiO_3) বিভিন্ন সল্ট। সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে সিলিকার ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন পাথর, মাটি প্রভৃতি ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেট পদার্থে গঠিত। ধাতব সিলিকেট সবই সিলিকার ↑, অর্থাৎ বালির যৌগিক রূপ।

সিলিকোন্‌স — সিলিকন অক্সাইড (SiO) ও বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন প্লাস্টিকের ↑ মত এক শ্রেণীর জৈব পলিমার ↑ পদার্থ। এরূপ পদার্থের রাসায়নিক গঠনের সাধারণ ফর্মূলা হোল $(R_2SiO)n$; এর মধ্যে R হোল হাইড্রোকার্বন রেডিক্যাল ↑, n হোল সেই সংখ্যা যত সংখ্যক অণু মিলিত হয়ে পলিমারিজেসন ↑ ঘটে। এই শ্রেণীর পদার্থগুলোর জল, তাপ ও তড়িৎ প্রতিরোধ করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। জলের মধ্যে বা অত্যন্ত উত্তপ্ত স্থানে ব্যবহারের জন্যে

রেজিন ↑, ল্যাকার ↑ প্রভৃতি পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়।

সিলিক্‌ গ্রীণ — উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে এটা সম্ভবতঃ কিউপ্রিক আর্সেনাইট, $Cu_3(AsO_3)_2 2H_2O$; বিষাক্ত পদার্থ। পোকা-মাকড ধ্বংস করতে ও পিগ্‌মেন্ট ↑ তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত হয়।

সুটিং স্টার — যে মিটিওরাইট ↑ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার ফলে বায়ুর সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। জ্বলন্ত নক্ষত্র যেন আকাশের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায় বলে মনে হয়। এজন্যে একে সাধারণতঃ বলে সুটিংস্টার; বাংলায় বলে নক্ষত্রপাত। প্রকৃতপক্ষে এটা নক্ষত্র নয়, জ্বলন্ত মিটিওরাইট, বা উল্কা মাত্র।

সুপারকুলিং — প্রত্যেক তরল পদার্থ-ই একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (টেম্পারেচার) ঠাণ্ডা করলে তা জমে গিয়ে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়; এই উষ্ণতাকে ওই তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েন্ট ↑ বলে। বিশেষ অবস্থায় কোন তরল পদার্থকে আবার এই ফ্রিজিং পয়েন্টের নিম্নতর উষ্ণতায়ও ঠাণ্ডা করা যেতে পারে; কিন্তু তরল পদার্থটা জমে কঠিন হয় না। একে বলে সুপার কুলিং; আর ওই তরল পদার্থের তখন **মেটাস্টেবল্‌** অবস্থা বলে। কোন কঠিন পদার্থের ক্ষুদ্র একটা দানা ওর মধ্যে ফেললে, কখন কখন বা একটু নাড়া দিলেই ওই তরল পদার্থ ক্রমে সম্যক কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ওর উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে আবার ফ্রিজিং পয়েন্টে উঠে যায়।

সুপার ফস্‌ফেট — সাধারণতঃ সুপারফস্‌ফেট অব লাইম বুঝায়; এক রকম কৃত্রিম সার (ফার্টিলাইজার ↑)। এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফস্‌ফেট থাকে। যথেষ্ট ফস্‌ফেট ↑ ও ক্যালসিয়াম থাকায় জমিতে উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সুপারসোনিক্‌স — শব্দ-তরঙ্গের শ্রুতিসীমা (অডিবিলিটি লিমিট ↑) অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত স্পন্দনশীল তরঙ্গ। এরূপ অত্যধিক স্পন্দন বিশিষ্ট তরঙ্গমালা বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোয়ার্জ ↑ ক্রিস্ট্যালের দ্রুত স্পন্দন ঘটিয়ে উৎপন্ন করা যায়। একে **আলট্রাসোনিক্‌স** ও বলে। শব্দ তরঙ্গের গতি (সাউণ্ড ↑) প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1120 ফুট, ঘণ্টায় 760 মাইল; এর চেয়ে বেশী গতিশীলতা বুঝাতেও কখন কখন সুপারসোনিক বা আলট্রাসোনিক

কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে,—যেমন, কোন এ্যারোপ্লেনের সুপারসোনিক গতি বললে বুঝতে হবে, সেটা শব্দতরঙ্গের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে।

সুপার স্যাচুরেসন — অতি-সম্পৃক্ততা। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থে সর্বাধিক পরিমাণ কোন দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবকে বলে স্যাচুরেটেড সল্যুসন ↑। বিশেষ অবস্থায় কখন কখন ওই দ্রবের মধ্যে আরও দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকতে পারে। তরল পদার্থের এরূপ অবস্থাকে বলে সুপার স্যাচুরেসন; আর ওই দ্রবের তখন মেটাস্টেব্‌ল অবস্থা বলা হয়। ওই দ্রাব্য পদার্থের একটা ক্ষুদ্র দানা ওর মধ্যে ফেলে দিলে এই অতিসম্পৃক্ত অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত দ্রাব্য পদার্থ স্ফটিকাকারে পৃথক হয়ে পড়ে।

সুপারহিটেড স্টিম — যে জলীয় বাষ্প 100° সেণ্টিগ্রেড অপেক্ষাও বেশী উত্তপ্ত। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জল 100° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয় এবং উৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও সেই 100° সেণ্টিগ্রেড থাকে। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের অধিক চাপে জল বাষ্পীভূত করলে এই সুপারহিটেড স্টিম, অর্থাৎ অতিরিক্ত উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সেক্টর — কৌণিক বৃত্তাংশ। কোন বৃত্তের যে কোন দুইটি ব্যাসার্ধ (কেন্দ্র ও পরিধির যে কোন বিন্দুর সংযোজক সরল রেখা) দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ। (সার্কল ↑)

সেক্টর

সেকেণ্ড — (1) সময় পরিমাপের ইংলণ্ডীয় একক; = এক সিডিরিয়াল ডে'র ↑ 1/86,164·1 অংশ, বা এক দিন সোলার ডে'র ↑ 1/86,400 অংশ। (2) জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের একক বিশেষ; = 1/3600 ডিগ্রি; 60 সেকেণ্ড = 1 মিনিট, 60 মিনিট = 1° ডিগ্রি।

সেগ্‌মেন্ট — বৃত্তাংশ; কোন বৃত্তের যে কোন একটি জ্যা (কর্ড, সার্কল ↑) বৃত্তটাকে যে দুই অংশে বিভক্ত করে। বৃত্তের ব্যাসও একটা জ্যা, যেটা বৃত্তকে সমান দুই অংশে, অর্থাৎ সেগ্‌মেন্টে বিভক্ত করে। এরূপ সেগমেন্টকে বলে অর্ধবৃত্ত, বা সেমি-সার্কল।

সেগমেন্ট

সেক্সট্যান্ট — সাধারণতঃ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে গ্রহ-নক্ষত্রাদির কৌণিক উচ্চতা পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র; এর সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডলের কত ডিগ্রি ঊর্ধ্বে অবস্থিত তার পরিমাণ যে কোন সময়ে সহজে মাপা যায়। যন্ত্রে সংলগ্ন একখানা দর্পণ ঘুরিয়ে কোন নক্ষত্রের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে অপর এক খানা স্থিরসংবদ্ধ দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত করা হয়। এই প্রতিফলনের ফলে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রটা যন্ত্রের মধ্যে পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডলে অবস্থিত বলে মনে হয়। ওই প্রথম দর্পণখানা যত ডিগ্রি ঘুরিয়ে স্থির-দর্পণে নক্ষত্রটার প্রতিফলিত রশ্মি দেখা যাবে, দিঙ্‌মণ্ডল থেকে নক্ষত্রটা তত ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত হবে। যন্ত্রে সংলগ্ন গোলাকার স্কেল থেকে ওই সব ডিগ্রির পরিমাণ সহজেই স্থির করা যায়।
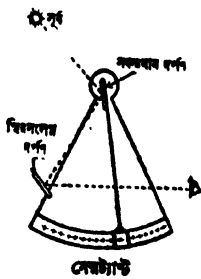
সেক্সট্যান্ট

সেকেণ্ডারি সেল — যে সেলে ↑ সোজাসুজি তড়িৎ উৎপাদিত হয় না; প্রাইমারি সেল ↑, বা কোন তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র থেকে তড়িৎ শক্তি এর মধ্যে কৌশলে আবদ্ধ করে রাখা হয়। প্রয়োজনের সময় এ থেকে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়; যেমন—স্টোরেজ ব্যাটারি ↑, অ্যাকুমুলেটর ↑ প্রভৃতি।

সেফ্‌টি ল্যাম্প — ডেভি ল্যাম্প

সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি — বস্তুর ভার-কেন্দ্র। ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ যে বিন্দুতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (গ্র্যাভিটেসন ↑) কেন্দ্রীভূতভাবে বস্তুটাকে আকর্ষণ করে। কোন বস্তুর উপরে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-শক্তির সমষ্টিগত পরিমাণই হোল বস্তুটার ওজন, বা ওয়েট ↑। বস্তুর আকার, আয়তন স্থির থাকলে যে অবস্থাতেই সেটা রাখা যাক না কেন, তার সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি, বা ভারকেন্দ্র, সর্বদাই স্থির থাকবে; ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে সর্বদাই বস্তুটার ভারসাম্য রক্ষিত হবে।

সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি — থার্মোমিটারের ↑ সাহায্যে পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপের একটা একক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (760 মিলিমিটার, ব্যারোমিটার ↑) জলের স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের উষ্ণতা

পার্থক্যের 100 ভাগের এক ভাগ তাপকে এক ডিগ্রি (1°C) সেন্টিগ্রেড বলা হয়। সেন্টিগ্রেড স্কেলে জলের হিমাঙ্ক (যে উষ্ণতায় জল জমে বরফ হয়, বা বরফ গলতে সুরু করে) 0° সেন্টিগ্রেড, এবং স্ফুটনাঙ্ক (যে উষ্ণতায় জল ফুটে বাষ্পীভূত হতে আরম্ভ করে) 100° সেন্টিগ্রেড বলা হয়। বিভিন্ন থার্মোমিটারে পদার্থের উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে **ফারেনহাইট** ↑ ও **রুমার** ↑ নামে অন্য দু'রকম স্কেল, বা এককও ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সচরাচর সেন্টিগ্রেড এককেই পদার্থের উষ্ণতা পরিমিত হয়ে থাকে।

সেন্ট্রিফিউজ — কোন তরল পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত কঠিন পদার্থের অতি সূক্ষ্ম কণিকাগুলো পৃথক করে ফেলবার জন্যে ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র। দুটো নলাকার লম্বা পাত্রে ওই তরল পদার্থ রেখে যন্ত্রটার দু'দিকে সংবদ্ধ করা হয়; পরে ওই পাত্র সমেত যন্ত্রটাকে অতি দ্রুত বেগে কিছুকাল ঘোরালে মিশ্রিত কণিকাগুলো পাত্রের তলায় (কণিকাগুলো বিশেষ হাল্কা হলে কোন কোন ক্ষেত্রে উপরিভাগেও) একত্র সঞ্চিত হয়ে পড়ে; পরিষ্কার তরল পদার্থ পৃথক হয়ে যায়। পদার্থ-বিদ্যার যুক্তি অনুসারে সেন্ট্রিফিউগ্যাল ↑ ফোর্সের প্রভাবে এরূপ হয়ে থাকে। এজন্যে এরূপ যন্ত্রকে সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেসিনও বলা হয়।

সেন্ট্রিফিউজ

সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স — কেন্দ্রাতিগ শক্তি: কোন কেন্দ্রীয় বিন্দুর চারদিকে চক্রাকারে কোন বস্তু দ্রুত বেগে ঘোরালে ওই বস্তুতে যে বহির্মুখী গতি শক্তির সৃষ্টি হয়। যে শক্তি প্রয়োগে বস্তুটাকে ঘূর্ণায়মান রাখা হয় তাকে বলে **সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স**। সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স ও সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স পরস্পর সমান, কিন্তু বিপরীতমুখী। সুতা বেঁধে এক টুকরা পাথর চক্রাকারে ঘোরালে হাতের যে শক্তি সুতার মাধ্যমে ওটাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে, তাকে বলে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। আর, এরূপ ঘূর্ণনের ফলে প্রস্তর খণ্ডে যে শক্তি সৃষ্টি হয় তাকে বলে সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স। সুতাটা যদি ছিঁড়ে যায় তবে ওই প্রস্তরখণ্ডটা এরূপ

সেন্টিফিউগ্যাল ফোর্সের প্রভাবে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স — সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স ↑।

সেন্টিমিটার — এক মিটারের ↑ শতাংশ ; = 0·394 ইঞ্চি।

সেরিব্রাম — মস্তিষ্কের প্রধান অংশ ; যাকে বাংলায় গুরু-মস্তিষ্ক বলে। এটা মস্তিষ্ক বা মগজের ঊর্ধ্বভাগের বৃহত্তর অংশ। সেরিব্রামের নীচের দিকে করোটির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত

সেরিব্রাম

মস্তিষ্কের ক্ষুদ্রতর অংশকে বলে **সেরিবেলাম** ; বাংলায় যাকে বলে লঘু-মস্তিষ্ক।

সেল — রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র। এর মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তড়িৎশক্তি উৎপাদিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব
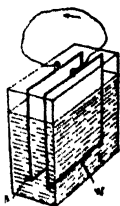
অ্যাকুমুলেটর

তারের মাধ্যমে তা প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। সেল প্রধানতঃ দু'রকম—প্রাইমারি সেল ↑ ও সেকেণ্ডারি সেল ↑। অবশ্য সেকেণ্ডারি সেলে তড়িৎ সোজাসুজি উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে না, (অ্যাকুমুলেটর ↑)। প্রাইমারি সেল আবার নানা রকমের আছে, যেমন—লেকল্যান্স সেল ↑, (স্ট্যাণ্ডার্ড) ওয়েস্টন সেল, ডেনিয়েল সেল ↑ প্রভৃতি।

সেলিনিয়াম — মৌলিক পদার্থ সাংকেতিক চিহ্ন Se ; পারমাণবিক ওজন 78·96, পারমাণবিক সংখ্যা 34 ; পদার্থটা ধাতব ; রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা গন্ধকের মত। বিভিন্ন ধাতব সালফাইডের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় নানা রকম ধাতব সেলিনাইড সল্ট পাওয়া যায়। রাবার শিল্পে ও রুবি গ্লাস তৈরী করতে এর ব্যবহার আছে। নানা রকম অ্যালোট্রোপ ↑ পাওয়া যায়। এক রকম স্ফটিকাকার সেলিনিয়ামের আলোকের সংস্পর্শে তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতার তারতম্য ঘটে ; এজন্যে পদার্থটা ফটো-ইলেক্ট্রিক সেলে ↑ ব্যবহৃত হয়। এরূপ ফটো-ইলেক্ট্রিক সেলকে **সেলিনিয়াম সেল** বলে।

সেলুলয়েড — সেলুলোজ নাইট্রেট ↑ ও ক্যাম্ফরের (কর্পূর) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন বিশেষ এক শ্রেণীর প্ল্যাস্টিক ↑। ব্যা

লাইট ও ↑ এক রকম সেলুলয়েড। বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন গঠনের সেলুলয়েড তৈরী হয়ে থাকে। বিশেষ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এক রকম সেলুলয়েডে চলচ্চিত্রের ফিল্ম তৈরী হয়। সব রকম সেলুলয়েডই অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ।

সেলুলোজ — যে জৈব পদার্থে উদ্ভিদের দেহ-কোষ গঠিত; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তুর রাসায়নিক উপাদান। এর রাসায়নিক গঠন মোটামুটি ($C_6H_{10}O_5)n$; এর n হোল সেই সংখ্যা, যত সংখ্যক অণু সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ গঠিত হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন গঠনের পলিমার ↑ পদার্থের এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাঠের মণ্ড বা গুঁড়া, তুলা ও বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ আঁস এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ। কাগজ, প্ল্যাস্টিক ↑, রেয়ন ↑, বিস্ফোরক পদার্থ (নাইট্রো সেলুলোজ ↑) প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্যের প্রধান উপাদান।

সেলুলোজ এসিটেট — তুলা প্রভৃতি সেলুলোজ ↑ পদার্থের উপর বিশুদ্ধ গ্ল্যাসিয়াল অ্যাসিটিক ↑ অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন সল্ট, বা এস্টার ↑ জাতীয় সাদা কঠিন পদার্থ। এ থেকে রেয়ন ↑, প্ল্যাস্টিক ↑ প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

সেলুলোজ নাইট্রেট — নাইট্রোসেলুলোজ ↑। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হোল সেলুলোজের নাইট্রিক অ্যাসিড এস্টার ↑। এ থেকে উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ, সেলুলয়েড ↑, প্ল্যাস্টিক ↑ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ তৈরী হয়ে থাকে।

সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ার — নভোমণ্ডলের যে কাল্পনিক অবতল চাঁদোয়ার গায়ে গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক অবস্থিত বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। পৃথিবীর যে কোন স্থানে দণ্ডায়মান দর্শক যেন ওই গোলাকার নভোমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বলে ধরা হয়।

সেলেস্টিয়াল ইকোয়েটর — পৃথিবীর ভৌগোলিক ইকোয়েটর ↑, বা বিষুব-বৃত্তের সামতলিক ক্ষেত্র চারদিকে বর্ধিত করলে সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ারকে ↑ যে কাল্পনিক বৃত্ত-রেখায় ছেদ করে। এক কথায় বলা যায়, নভোমণ্ডলীয় বিষুব-বৃত্ত; অর্থাৎ যে মহাবৃত্তরেখা জেনিথ ↑ ও নাদির ↑ থেকে সমদূরবর্তীভাবে সেলেস্টিয়াল স্ফিয়ারকে বেষ্টন করে আছে বলে কল্পনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ ও গণনাদিতে নভোমণ্ডলে এরূপ বৃত্ত রেখার কল্পনা করা আবশ্যক হয়ে থাকে।

সেলেস্তিয়াল ডেক্লিনেসন — নভোমণ্ডলে কোন জ্যোতিষ্ক সেলেস্তিয়াল ইকোয়েটর ↑ থেকে যত ডিগ্রি কৌণিক উচ্চতায় অবস্থিত তাকে বলে ওই জ্যোতিষ্কের ডেক্লিনেসন। কোন গ্রহ-নক্ষত্রের

ডেক্লিনেসন (৫ ৪৫০)
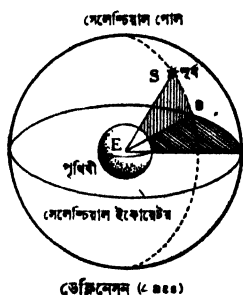
ডেক্লিনেসন সাধারণতঃ ওই কোণের পরিমাণে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রদত্ত চিত্রে S জ্যোতিষ্কের ডেক্লিনেসন হোল BES কোণ। (কম্পাস যন্ত্রে ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানের **ম্যাগ্নেটিক ডেক্লিনেসন** ↑ নিরূপিত হয়।)

সোডা — সোডিয়ামের বিভিন্ন সল্ট ↑ বিভিন্ন শ্রেণীর সোডা নামে পরিচিত ; যেমন, ওয়াশিং সোডা ↑ হোল সোডিয়াম কার্বনেট, $Na_2CO_3.10H_2O$; বেকিং সোডা ↑ হোল সোডিয়াম বাইকার্বনেট, $NaHCO_3$; কস্টিক সোডা ↑ $NaOH$ ইত্যাদি।

সোডা ওয়াটার — চাপ প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস জলে দ্রবীভূত ও পরিপৃক্ত করে যে পানীয় তৈরী হয়। বোতলের মুখ খুলে প্রযুক্ত চাপ মুক্ত করলে দ্রবীভূত অতিরিক্ত গ্যাস সশব্দে বেরিয়ে যায়। সুস্বাদু করবার জন্যে বিভিন্ন সুগন্ধ নির্যাস, স্যাকারিন ↑ প্রভৃতি এই জলে মেশান হয়ে থাকে। একে বাংলায় বলে বাতান্বিত জল। লিমনেড, আইসক্রিম সোডা, প্রভৃতি সব রকমের ইরেটেড ওয়াটার, অর্থাৎ বাতান্বিত জলেই কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত থাকে।

সোডা লাইম — সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা ↑ $NaOH$) এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের [স্লেকড লাইম ↑ $Ca(OH)_2$] সংমিশ্রণে উৎপন্ন কঠিন পদার্থ। কুইক লাইমের ↑ সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রব মিশিয়ে এক রকম নরম পদার্থ পাওয়া যায় ; একে উত্তপ্ত করে শুকিয়ে ফেললেই সোডা লাইম উৎপন্ন হয়। পদার্থটা কাঁচশিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস শুষে নেয় বলে জিনিসটা আবদ্ধ স্থানের দূষিত বায়ু শোধনের জন্যে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম— মৌলিক ধাতব পদার্থ

সাংকেতিক চিহ্ন Na (ন্যাট্রিয়াম), পারমাণবিক ওজন 22·997, পারমাণবিক সংখ্যা 11 ; সাদা নরম ধাতু। বিশেষ রাসায়নিক শক্তি-সম্পন্ন : জলের সংস্পর্শে এর দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা ↑, NaOH) উৎপন্ন হয়, এবং হাইড্রোজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। বাতাসের সংস্পর্শে এর অক্সাইডের সৃষ্টি হয় ; ফলে তার একটা আবরণ উপরিভাগে জমে গিয়ে সোডিয়াম দ্রুত ময়লা হয়ে পড়ে। এরূপ অত্যধিক রাসায়নিক শক্তির জন্যে সোডিয়াম বিশুদ্ধ ধাতব অবস্থায় পাওয়া যায় না ; কিন্তু বিভিন্ন রকম সোডিয়াম সল্ট প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে ; এদের মধ্যে সাধারণ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl,) জলে স্থলে পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে। ক্যালসিয়ামের মত সোডিয়ামও জীবদেহের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

সোডিয়াম কার্বনেট — ওয়াশিং সোডা ↑, $Na_2CO_3 . 10H_2O$: সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয় ; তীব্র ক্ষারধর্মী। বস্ত্রাদি পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়। (লেব্ল্যাঙ্ক প্রোসেস ↑)।

সোডিয়াম বাইকার্বনেট — বেকিং সোডা ↑, $NaHCO_3$; সাদা চূর্ণ পদার্থ, জলে দ্রবণীয়, একটা বেসিক ↑ সল্ট। বেকিং পাউডার ↑ তৈরী করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। একেই বলা হয় খাওয়ার সোডা, পেটের পীড়ায় লোকে খায়।

সোডিয়াম পারক্সাইড — Na_2O_2 ; সোডিয়াম খোলা বাতাসে পোড়ালে যে হলদে গুঁড়া পাওয়া যায়। জলের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিলনে কস্টিক সোডা, অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑ (NaOH) উৎপন্ন হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

সোডিয়াম সালফেট — সোডিয়াম ক্লোরাইড, (NaCl, কমন সল্ট ↑) ও সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সল্ট। পদার্থটার বিশেষ নাম **গ্লোবার্স সল্ট**, $Na_2SO_4 . 10H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। ঔষধ হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

সোডিয়াম সিলিকেট—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সিলিকার ↑ (SiO_2) রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন সাদা স্ফটিকাকার সল্ট, Na_2SiO_3। একে **ওয়াটার গ্লাস** ↑ বলে ; জলে দ্রবণীয়। এর স্বচ্ছ জলীয় দ্রব

মাখিয়ে ডিম সংরক্ষণ করা হয়। বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার জন্তেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওয়াশিং সোপে অনেক সময় জিনিসটা মেশান হয়।

সোডিয়াম থায়োসালফেট — সোডিয়াম হা ই পো সা ল ফা ই ট, $Na_2S_2O_3 . 5H_2O$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে বিশেষভাবে দ্রবণীয়। পদার্থটা সাধারণতঃ **হাইপো** নামেই সমধিক পরিচিত; ফটোগ্রাফির ↑ কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় (হাইপো ↑)।

সোডিয়াম নাইট্রেট — চিলি সল্ট পিটার ↑, $NaNO_3$; একে সোডা-নাইটারও বলে। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। নাইট্রিক-অ্যাসিড ↑ তৈরী করবার জন্যে ও জমির সার হিসেবে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড — কস্টিক সোডা, NaOH ; সাদা কঠিন পদার্থ। খোলা রাখলে বাতাসের জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে গলে যায়। এর জলীয় দ্রব তীব্র ক্ষারধর্মী (অ্যালকালি ↑), যাতে লাগে তাই ক্ষয়ে যায়; বিশেষ রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন। এর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন সোডিয়াম সল্ট উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সোপ — সাবান। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণ। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা প্রধানতঃ স্টিয়ারিক অ্যাসিড ↑, পামিটিক অ্যাসিড ও অলিয়িক অ্যাসিডের তিন রকম সোডিয়াম সল্টের সংমিশ্রণে গঠিত। এ সব ফ্যাটি অ্যাসিডের পটাসিয়াম সল্টের সংমিশ্রণেও এক রকম নরম সাবান তৈরি হয়, যাকে বলে **সফ্‌ট সোপ** ↑ উত্তাপের সাহায্যে নানা রকম চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কস্টিক সোডার (বা কস্টিক পটাসের) রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে সাবান তৈরি হয়। কস্টিক সোডা বা পটাসের যে জলীয় দ্রব ব্যবহৃত হয় তাকে **কস্টিক-লাই** বলে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বিশেষ এক রকম হাইড্রোলিসিস ↑ (স্যাপোনিফিকেসন ↑) প্রক্রিয়ায় সাবানের সঙ্গে বাই-প্রোডাক্ট ↑ হিসেবে গ্লিসারিন ↑ উৎপন্ন হয়। সাধারণ ব্যবহারের সাবানে কস্টিক সোডা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যান্য ধাতব সল্টগুলোকেও অনেক সময় সোপ বলা হয়; যদিও সেগুলো সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সল্টের মত সাবান জাতীয় নয়।

সোপ স্টোন — এক রকম নরম পাথর; ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেটে গঠিত। এরূপ পাথরকে সহজেই মসৃণ গুঁড়ায় পরিণত করা যায়—বেশ তেলতেলে ভাব, এজন্যে একে সোপস্টোন বলা হয়। এর অন্য নাম স্টিয়াটাইট ↑। এর চূর্ণকে বলে ট্যাল্‌ক ↑ পাউডার। এরূপ পাথরের তৈরী বিভিন্ন জিনিস উপযুক্তরূপে উত্তপ্ত করলে বেশ শক্ত ও ব্যবহারযোগ্য হয়।

সোলার ইক্লিপ্‌স — ইক্লিপ্‌স (সোলার) ↑।

সোলার ডে — সাধারণতঃ সূর্যের উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করে দিনের (দিন-রাত্রির) কাল পরিমাণ করা হয়; কিন্তু সূর্যের উদয়াস্তের সময় নির্দিষ্ট নয়, দিন রাত্রি ছোট বড় হয়। এজন্যে পর পর দুদিন সূর্যের মেরিডিয়ানে ↑ আসার সময়ের ব্যবধানকে সাধারণতঃ এক দিন ধরা যায়। সূর্যের অয়ন-গতির (সলিস্টিস্ ↑) জন্যে এই সময়ও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে; সুতরাং সম্বৎসরে দিনের এরূপ পরিবর্তনশীল কাল পরিমাণের গড় নিয়ে প্রকৃত সৌর দিন, বা মিন সোলার ডে স্থির হয়েছে, অর্থাৎ 24 ঘণ্টা।

সোলার সিস্টেম—সৌর পরিবার; সূর্য ও তার চারদিকে ভ্রাম্যমান নয়টা গ্রহ নিয়ে মোটামুটি এই সোলার সিস্টেম, বা সৌর পরিবার গঠিত। সূর্য থেকে দূরত্বের ক্রম অনুসারে গ্রহগুলো: বুধ (মার্কারি ↑), শুক্র (ভেনাস ↑), পৃথিবী (আর্‌থ), মঙ্গল (মার্স ↑), বৃহস্পতি (জুপিটার ↑), শনি (স্যাটার্ন ↑), ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। এই ন'টা গ্রহ আপন আপন নির্দিষ্ট উপবৃত্ত কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বে একটা গ্রহপুঞ্জ (অ্যাস্টারয়েড্‌স ↑) সূর্যের চারদিকে ঘুরছে; একেও সৌর পরিবারের অন্তর্গত ধরা হয়। গ্রহগুলো মহাশূন্যে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

স্টার্চ — উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার পদার্থ; রাসায়নিক হিসেবে বিশেষ এক শ্রেণীর কার্বোহাইড্রেট ↑; চাউল, গম প্রভৃতি বিভিন্ন শস্য বীজে স্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে। সাদা, স্বাদ-গন্ধহীন চূর্ণ পদার্থ, জলে অদ্রাব্য। সামান্য কোন অ্যাসিড সংযোগে এর জলীয় মিশ্রণ ফুটালে হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়ায় প্রথমে ডেক্‌স্ট্রিন ↑ উৎপন্ন হয়, ক্রমে শেষে তা গ্লুকোজে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়।

স্টার্চ গাম — ডেক্‌স্‌ট্রিন ↑।

স্ট্রন্সিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Sr, পারমাণবিক ওজন 87·63, পারমাণবিক সংখ্যা 38; ধাতুটা ক্যালসিয়ামের অনুরূপ, দেখতে সাদা। বিভিন্ন খনিজ প্রস্তরে এর স্ট্রন্সিয়ানাইট নামক স্ফটিকাকার কার্বনেট পাওয়া যায়। এর হাইড্রক্সাইড, $Sr(OH)_2$, শর্করা-শিল্পে চিনি পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্ট্রন্সিয়াম সল্ট লাল আলোক সৃষ্টি করবার জন্যে বাজির বারুদে মেশান হয়।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার — পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটা বিশেষ স্তর। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে এই স্তর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 6 মাইল এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় 11½ মাইল উচ্চে অবস্থিত। এই স্তরের উপর নীচে বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা প্রায় স্থির থাকে, উপরে উঠলে উচ্চতার সঙ্গে উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এই স্তরের উষ্ণতা নিরক্ষরেখার উপরে প্রায় $-110°$ ফারেন্‌হাইট, মেরুপ্রদেশের উপরে প্রায় $-40°$ ফারেন্‌হাইট (অর্থাৎ, অধিকতর উষ্ণ)।

স্ট্রিক্‌নিন — নাক্স ভোমিকা উদ্ভিদের বীজ থেকে প্রাপ্ত একটা অ্যাল্‌কালয়েড ↑, $C_{21}H_{22}N_2O_2$; সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে সামান্য দ্রবণীয়। পদার্থটা অত্যন্ত তিক্তস্বাদযুক্ত, জীবের স্নায়ুমণ্ডলের উপরে বিশেষ মারাত্মক বিষক্রিয়া সম্পন্ন। অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে অতি সামান্য মাত্রায় ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন — পেনিসিলিনের ↑ অনুরূপ একটা অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ; অ্যাক্টিনোমাইসেস নামক এক প্রকার তারকা-আকৃতি ছত্রাক বিশেষ থেকে পাওয়া যায়। কোন কোন জীবাণু প্রতিরোধের ব্যাপারে পদার্থটা পেনিসিলিনের চেয়েও শক্তিশালী; বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগের জীবাণু (টিউবার্কুল বেসিলাস) ধ্বংসের জন্যে এর প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমানিত হয়েছে। ছত্রাকঘটিত এই বিশেষ রাসায়নিক পদার্থটা 1944 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান আবিষ্কার করেন।

স্ট্যাটিক — স্থির, গতিশীল নয় এমন। যেমন, স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি হোল স্থির-তড়িৎ, অর্থাৎ যে তড়িৎশক্তি কোন পদার্থে নিবদ্ধ থাকে, তা থেকে প্রবাহিত হয় না। এরূপ তড়িৎ সাধারণতঃ স্ফুরণের (স্পার্ক) আকারে পাওয়া যায়; প্রবাহ আকারে পাওয়া যায় না।

রঞ্জন, বা কাচের একটা রড পশম বা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘসলে ওই রডে স্ট্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি জন্মায়; এরূপ রডে উৎপন্ন তড়িৎশক্তির প্রভাবে কাগজের টুকরা আকৃষ্ট হয়।

স্ট্যাটিক্‌স — বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের স্থিরতা বা স্থির অবস্থা সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য আলোচিত ও নির্ধারিত হয়; যেমন — সেতু নির্মাণের কাজে লোহার পাটির কতটা বক্রতায় সর্বাধিক ওজন বহন করেও স্থির থাকবে, জাহাজ নির্মাণের কাজে খোলটা কিরূপ হলে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, এরূপ বিভিন্ন তথ্যের আলোচনা স্ট্যাটিক্সের অন্তর্গত।

স্ট্যাটিস্টিক্‌স — পরিসংখ্যান, বা রাশি বিজ্ঞান। একই জাতীয় বিভিন্ন নমুনার নির্দেশক রাশি বা সূচক সংখ্যার গড় নির্ণয় করে কোন বিষয়ের সাধারণ তথ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া। এভাবে কোন দেশের শিক্ষা বিস্তার, শস্যোৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে মোটামুটি তথ্য নির্ধারণ করা রাশিবিজ্ঞানের সাহায্যে হয়ে থাকে।

স্ট্যানাম — টিন। মৌলিক ধাতু টিনের ল্যাটিন নাম; এ থেকেই টিনের রাসায়নিক সাংকেতিক চিহ্ন Sn হয়েছে। স্ট্যানিক অক্সাইড হোল SnO_2, স্ট্যানাস অক্সাইড SnO; যে যৌগিক পদার্থের মধ্যে টিন বাইভ্যালান্ট ↑ তাকে বলে স্ট্যানাস; আর যার মধ্যে কোয়াড্রিভ্যালান্ট (ভ্যালেন্সি ↑ চার) তাকে বলে স্ট্যানিক সল্ট।

স্টিগ্‌মা — উদ্ভিদের স্ত্রী-পুষ্পগুলোর গর্ভ-দণ্ডের অগ্রভাগ। এখানে পুং পুষ্পের রেণুনিষেক ঘটলে তা গর্ভকোষে প্রবিষ্ট হয়ে বীজের উৎপত্তি ঘটায়। স্টিগ্‌মা থেকে গর্ভ-দণ্ডের মধ্য দিয়ে ওই রেণু গর্ভকোষের অভ্যন্তরস্থ ডিম্বকোষে পৌছায়, সেই ডিম্বকোষের মধ্যেই বীজ সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্টিগ্‌মা যেন গর্ভকোষে রেণু প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। কথাটার বহুবচনে বলে স্টিগ্‌মাটা।

স্টিম — জলীয় বাষ্প, বাষ্পীভূত জল, H_2O; জলের বয়েলিং পয়েন্ট ↑ 100° সেন্টিগ্রেড; এর অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে তরল জল এরূপ স্টিম বা বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণ অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ; সাধারণতঃ মেঘের মত ঘোলাটে সাদা যে পদার্থকে বাষ্প বলা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে অতি সূক্ষ্ম জলকণা মাত্র, জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থা; প্রকৃত স্টিম নয়।

স্টিম ইঞ্জিন — বাষ্পচালিত যন্ত্র

বা ইঞ্জিন; জলীয় বাষ্পের অত্যধিক চাপ নিয়ন্ত্রিত করে যে যন্ত্রে গতি সঞ্চারিত হয়। বাষ্পচালিত টার্বাইন ↑ যন্ত্রকেও স্টিম ইঞ্জিন বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ যে যন্ত্রের প্রকাণ্ড আধারে আবদ্ধ বাষ্পের চাপে সংলগ্ন সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টন চলাচল করে, এবং ওই পিস্টনের সঙ্গে সংলগ্ন যন্ত্রাংশের গতির সাহায্যে বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইঞ্জিনটা সামগ্রিকভাবে চলতে থাকে।

স্টিব্‌নাইট — খনিজ অ্যান্টিমনি সালফাইড, Sb_2S_3; স্বভাবজাত এই সালফাইড খনিজ থেকেই প্রধাণতঃ অ্যান্টিমনি ↑ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

স্টিবাইন — এক রকম বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা অ্যান্টিমনির গ্যাসীয় হাইড্রাইড ↑ (SbH_3) মাত্র। হাইড্রোজেন ও অ্যান্টিমনির বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑।

স্টিয়্যাটাইট — সোপস্টোন ↑।

স্টিয়ারিন — মোমের মত সাদা কঠিন পদার্থ; এর মধ্যে প্রধানতঃ স্টিয়ারিক অ্যাসিড ও পামিটিক অ্যাসিড ↑ সম্মিলিতভাবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। স্যাপোনিফিকেশন ↑ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীব জন্তুর চর্বি থেকে পদার্থটা পাওয়া যায়।

স্টেইনলেস স্টিল —ক্রোমিয়াম ↑ ঘটিত বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন ইস্পাত, যাতে সহজে মরিচা ধরে না। এর মধ্যে সাধারণতঃ 70 থেকে 90% লোহা, 12 থেকে 20% ক্রোমিয়াম ↑ ও ·1 থেকে ·7% কার্বন থাকে। বিশেষতঃ শস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদি এরূপ স্টিলে তৈরী হয়ে থাকে।

স্টোমা — উদ্ভিদের পাতায় যে সব অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এই সব ছিদ্র-পথে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে (ফটোসিন্থেসিস ↑)।

স্টোমা

পাতার এরূপ ছিদ্র, বা স্টোমাগুলো যেন উদ্ভিদের নাসিকা বা মুখের মত। চিত্রে পাতার শিরা-জালের মধ্যে বর্ধিতাকারে স্টোমা দেখান হয়েছে। কথাটার বহুবচনে বলে **স্টোমাটা**।

স্টোরেজ ব্যাটারি — যে সব ব্যাটারি ↑ কোন জেনারেটর ↑, প্রাইমারি সেল ↑ প্রভৃতি তড়িৎ

উৎস থেকে সঞ্চারিত তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা আহিত করা হয়। এভাবে সঞ্চিত বা সংবদ্ধ তড়িৎশক্তি তা থেকে পরে আবার প্রবাহরূপে পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময়ে এ থেকে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায় বলে এগুলোকে সেকেণ্ডারি সেলও ↑ বলা হয়। এ থেকে সোজা-সুজি তড়িৎশক্তি উদ্ভূত হয় না। যেমন- লেড অ্যাকুমুলেটর ↑, নিকেল আয়রন সেল প্রভৃতি। সাধারণতঃ মোটর গাড়ীতে সহজে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়ার জন্যে লেড অ্যাকুমুলেটর জাতীয় স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্ট্যাণ্ডার্ড — সুনির্দিষ্ট ও সর্বস্বীকৃত বিষয়; সবত্র সকলে স্বীকার করে নেবে কোন কিছুর এমন একক। যেমন, **স্ট্যাণ্ডার্ড মেজার**—বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-নির্মিত একটা সুনির্দিষ্ট রডের দৈর্ঘ্যকে এক ফুট ধরা হয়েছে। **স্ট্যাণ্ডার্ড ফিল্ম**—সাধারণতঃ চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত 35 মিলিমিটার প্রস্থের ফিল্ম। **স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ** — বৃটেনে রেলগাড়ীর দুই পাটি রেল-লাইনের মধ্যে 4 ফুট 8½ ইঞ্চি ব্যবধান থাকলে তাকে বলা হয় স্ট্যাণ্ডার্ড গেজ লাইন। (গেজ ↑)।

স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম — পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থানে ঘড়ির সময়ের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়: কারণ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সবত্র এক সময়ে হয় না। পৃথিবীর যত পূর্বাভিমুখে যাওয়া যাবে তত আগে সূর্যোদয় হবে, সময় এগিয়ে যাবে। এভাবে এক দেশে যখন সকাল, তার পূর্বাঞ্চলে তখন অনেক বেলা হয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলে অনেক রাত। একজন্যে পৃথিবীর সবত্র সময়ের একটা পারম্পর্য বিধানের জন্যে একটা নির্দিষ্ট স্থানের সময়কে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরা হয়েছে। ইংলণ্ডের গ্রিনউইচ। (০ মেরিডিয়ান) নামক স্থানের সময় হোল এই স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম: একে **গ্রিনউইচ টাইম**ও বলে। গ্রিনউইচের পশ্চিমে অবস্থিত কোন স্থানে প্রতি ডিগ্রি মেরি-ডিয়ান ↑ ব্যবধানে 4 মিনিট করে সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম থেকে বাদ দিলে স্থানীয় সময় পাওয়া যায়; আর পূর্বাঞ্চলে ওইরূপ প্রতি ডিগ্রি মেরিডিয়ানে 4 মিনিট করে সময় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে যোগ দিয়ে স্থানীয় সময় স্থির করা যেতে পারে।

স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স — ইমারতাদিতে উৎকৃষ্ট কনক্রিট জমাবার জন্যে যে অনুপাতে সিমেন্ট ↑, বালি ও পাথর-কুচি মেশান হয়। এর সর্বসম্মত নির্দিষ্ট অনুপাত অর্থাৎ, স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স বা

সংমিশ্রণ হোল, এক ভাগ সিমেন্ট, দুই ভাগ বালি ও চার ভাগ পাথর কুচি।

স্ট্যাণ্ডার্ড সেল — বিশেষ এক রকম প্রাইমারি সেল ↑; যেমন— ওয়েস্টন সেল, যাতে উৎপাদিত তড়িৎ-শক্তি (ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স ↑) দীর্ঘ সময়ের জন্তে সুনির্দিষ্ট স্থির বিভবযুক্ত থাকে। সাধারণ সেলে বিভিন্ন কারণে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্সের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে; কিন্তু স্ট্যাণ্ডার্ড সেলে এই পার্থক্য তেমন লক্ষিত হয় না।

স্ট্যাণ্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার — সংক্ষেপে বলে S. T. P.; অথবা, নর্ম্যাল টেম্পারেচার অ্যাণ্ড প্রেসার (N. T. P.)। যে নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও চাপে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন মাপা বা তুলনা করা হয়। এই নির্দিষ্ট চাপ হোল 760 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান (ব্যারোমিটার ↑) এবং উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) হোল 0° সেন্টিগ্রেড।

স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাটমস্ফিয়ার — বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একক বিশেষ; 45° ল্যাটিচিউডে ↑ ও সাগরপৃষ্ঠের সমউচ্চে অবস্থিত কোন স্থানে 0° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 760 মিলিমিটার (29·92 ইঞ্চি) উচ্চ পারদস্তম্ভের ওজনের সমান বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে বলে এক নর্ম্যাল বা স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাটমস্ফিয়ার। এক স্ট্যাণ্ডার্ড অ্যাটমস্ফিয়ার = 1·0132 বার ↑, = প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 14·72 পাউণ্ড। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুমণ্ডলের চাপ এই পরিমাণের উপরে বা নীচে ওঠানামা করে।

স্যাকারিন — সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, অত্যধিক মিষ্ট স্বাদযুক্ত। রাসায়নিক ফর্মুলা $C_6H_4SO_2$ ·CONH; জলে সামান্ত দ্রবণীয়। চিনির চেয়ে প্রায় 550 গুণ অধিক মিষ্ট; কিন্তু এর কোন খাদ্যগুণ নেই, বেশী খেলে বরং অনিষ্টকর হতে পারে। অবশ্য আজকাল লিমোনেড, আইসক্রিম প্রভৃতি পানীয় ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে স্যাকারিন ব্যবহার করা হচ্ছে। কোল-টার ↑ থেকে পাওয়া যায় টলুইন ↑; বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই টলুইন থেকে স্যাকারিন পাওয়া যায়।

স্যাকারোমিটার — শর্করা দ্রবের ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র। চিনির জলীয় দ্রবে দ্রবীভূত চিনির পরিমাণ নির্ধারণের জন্তে ব্যবহৃত এক রকম হাইড্রোমিটার ↑। দ্রবের মধ্যে শতকরা কত ভাগ চিনি আছে যন্ত্রের গায়ে তার নির্দেশক স্কেলের দাগ কাটা থাকে।

স্যাকারিমিটার — শর্করা দ্রবের ঘনত্ব পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত বিশেষ এক রকম যন্ত্র। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্রবের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি পোলারাইজ করা হয়। এই পোলারিজেসনের ↑ ফলে আপতিত রশ্মির যে কৌণিক বিবর্তন ঘটে তা থেকে দ্রবের ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

স্যাকারোজ — সুক্রোজ ↑।

স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড — যে সব যৌগিক পদার্থের অণুর মধ্যে সংগঠক পরমাণুগুলোর কোনটিরই অসংবদ্ধ কোন ভ্যালেন্সি ↑ থাকে না। প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রত্যেকটি ভ্যালেন্সি-বণ্ড ↑ পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হওয়ার ফলে গঠিত সুসম্পূর্ণ অণুর সমবায়ে যে সব যৌগিকের সৃষ্টি হয়। এরূপ স্যাচুরেটেড কম্পাউণ্ড অর্থাৎ সম্পৃক্ত যৌগিকের পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোন পরমাণু বা রেডিক্যাল ↑ যুক্ত হয়ে আর কোন নূতন যৌগিকের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেমন—মিথেন ↑, CH_4, একটি স্যাচুরেটেড অর্থাৎ সম্পৃক্ত যৌগিক; কিন্তু ইথিলিন ↑, C_2H_4, স্যাচুরেটেড নয়, এর সঙ্গে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে ইথিলিন ডাইক্লোরাইড, $C_2H_4Cl_2$, (ডাচ্ ফ্লুইড ↑) তৈরী হয়ে থাকে।

স্যাচুরেটেড সল্যুসন — সম্পৃক্ত দ্রব। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল দ্রাবক পদার্থে সর্বোচ্চ পরিমাণ দ্রাব্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে ওই দ্রবকে সম্পৃক্ত দ্রব, বা স্যাচুরেটেড সল্যুসন ↑ বলে। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আরও দ্রাব্য পদার্থ (সলিউট ↑) মেশালে আর দ্রবীভূত হয় না (সুপারস্যাচুরেসন ↑)। উষ্ণতা কমালে সলিউট পৃথক হয়ে পড়ে, উষ্ণতা বাড়ালে আরও সলিউট দ্রবীভূত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ সল্‌ভেন্টের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ সলিউটের দ্রবীভূত থাকা, অর্থাৎ সল্যুসনের স্যাচুরেসন বা সম্পৃক্ততা প্রধানতঃ তার উষ্ণতার উপর নির্ভর করে।

স্যাটেলাইট — উপগ্রহ; যে সব জ্যোতিষ্ক নিজ কক্ষপথে অপর কোন জ্যোতিষ্কের (গ্রহের) চার দিকে প্রদক্ষিণ করে; যেমন—চন্দ্র পৃথিবীর স্যাটেলাইট, বা উপগ্রহ। জুপিটার ↑, মার্স ↑ প্রভৃতি অধিকাংশ গ্রহেরই বিভিন্ন সংখ্যক স্যাটেলাইট আছে।

স্যাণ্ড — বালি, বালুকা; রাসায়নিক হিসেবে অবিশুদ্ধ সিলিকা, SiO_2, অর্থাৎ সিলিকন ডাইঅক্সাইড।

স্যাপোনিফিকেসন — সাবান তৈরীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া। অ্যালকালির ↑ সাহায্যে জান্তব চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তৈল থেকে উৎপন্ন হয়

বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড এস্টার ↑। এই এস্টারগুলোর এক রকম হাইড্রোলিসিস ↑ প্রক্রিয়াকে বলে স্যাপোনিফিকেসন; যার ফলে সাবান তৈরী হয়। সোপ ↑ বা সাবানকে ফ্যাটি অ্যাসিডের বিভিন্ন সল্টের সংমিশ্রণও বলা যেতে পারে।

স্যাটার্ন — শনি গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব মোটামুটি 88 কোটি 60 লক্ষ মাইল; বৃহস্পতি (জুপিটার ↑) ও ইউরেনাস ↑ গ্রহদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটা কক্ষপথে এটা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর সিডিরিয়াল ইয়ার ↑ পৃথিবীর হিসেবে 29·46 বছর, অর্থাৎ সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে শনিগ্রহের 29·46 পার্থিব বছর লাগে।

শনিগ্রহের বলয়

এর ভর (মাস্ ↑) পৃথিবীর প্রায় 95 গুণ অধিক; উপরিভাগের উষ্ণতা প্রায় −150° সেন্টিগ্রেড। শনিগ্রহের ন'টা ছোট ছোট উপগ্রহ আছে; গ্রহটাকে বেষ্টন করে একই সমতলে আবার পর পর তিনটা বলয়ও দেখা যায়। মনে হয়, এই বলয়গুলো এর কোন কোন উপ-গ্রহের চূর্ণিত দেহাবশিষ্টে গঠিত হয়ে ওকে বেষ্টন করে রয়েছে।

স্যাফায়ার — স্বভাবজাত এক রকম নীলবর্ণের স্বচ্ছ স্ফটিকাকার প্রস্তর বিশেষ। বাংলায় বলে নীলকান্ত মণি। রাসায়নিক হিসেবে পদার্থটা হোল কোরাণ্ডাম ↑, বা অ্যালুমিনা, Al_2O_3; সামান্য কিছু কোবাল্ট ↑ সংমিশ্রিত থাকায় প্রস্তরটা নীলবর্ণ দেখায়। সুদৃশ্য মূল্যবান পাথর, অলঙ্কারাদিতে ব্যবহৃত হয়।

স্যামারিয়াম — মৌলিক ধাতব পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন Sm, পারমাণবিক ওজন 150·43, পারমাণবিক সংখ্যা 62; রেয়ার আর্থ ↑ ধাতু গোষ্ঠির অন্যতম। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মোনাজাইটে ↑ কখন কখন অতি সামান্য পরিমাণে দেখা যায়।

স্যাল অ্যামোনিয়াক — অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, NH_4Cl; বাংলায় একে বলে নিশাদল। ড্রাইসেল ↑, বা ব্যাটারিতে ও অন্যান্য নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

স্যাল ভোলাটাইল — অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট, NH_4HCO_3, অ্যামোনিয়াম কার্বামেট, $NH_4O.CO.NH_2$, ও অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, $(NH_4)_2CO_3$, এই তিন রকম সল্টের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ। সাধারণতঃ একে এক কথায় অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, বা অ্যামন-কার্ব বলে। অবসাদ ও দুর্বলতায় একটা

সাধারণ উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। উদ্বায়ী পদার্থ, তীব্র ঝাঁজ বিশিষ্ট ; সর্দি, মাথাধরা প্রভৃতির জন্যে লোকে এর গন্ধ সোঁকে, বা জলে দিয়ে পান করে। আবার কেবল অ্যামোনিয়াম কার্বনেট, লেবুর রস ও অ্যালকোহল ↑ মিশিয়েও এরূপ এক রকম উত্তেজক পানীয় তৈরী করা যেতে পারে।

স্যালিনোমিটার — লবণাক্ত জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ নির্দেশক এক রকম হাইড্রোমিটার ↑। দ্রবের ঘনত্ব নিরূপণ করবার জন্যে যন্ত্রের গায়ে লবণ ও. জলের শতকরা হিসেবে স্কেলের দাগ কাটা থাকে। দ্রবে ডুবিয়ে এরূপ হাইড্রোমিটারের স্কেল থেকে সোজাসুজি দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ জানা যায়।

স্ল্যাগ — ধাতুমল ; ধাতব খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ায় ময়লা ও বিভিন্ন সংমিশ্রিত পদার্থের যে গাদ বেরোয় (বেসিক-স্ল্যাগ ↑)। সাধারণতঃ গলিত ধাতুর উপরে এই গাদ বা স্ল্যাগ ভেসে ওঠে।

স্লেকৃড লাইম — ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ↑, $Ca(OH)_2$; কুইক লাইমের ↑ (CaO) সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ, সাধারণ চুণ (লাইম ↑)।

স্লাইড রুল — গাণিতিক গণনাদির জন্যে ব্যবহৃত এক রকম যন্ত্র বিশেষ। মোটামুটি এতে থাকে এক খানা রুলারের উপরে আর এক খানা রুলার এমনভাবে সংবদ্ধ যাতে উপরের রুলারখানা নীচের রুলারের উপরে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া যায়। বিশেষ এক রকম (লগারিদ্‌ম) স্কেলে উভয় রুলারে অনুরূপ দাগ কাটা থাকে। দুই স্কেলের দাগ সংখ্যা যোগ বিয়োগ করে বিশেষ নিয়মের হিসাব তালিকা (লগারিদ্‌ম টেবল) অনুসারে গুণ ও ভাগের কাজ এর সাহায্যে অতি সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

স্ক্যাণ্ডিয়াম — মৌলিক পদার্থ, সাংকেতিক চিহ্ন Sc ; পারমাণবিক সংখ্যা 21 ; দুষ্প্রাপ্য ধাতু।

স্ক্রুপ্‌ল — ইংলণ্ডীয় ওজন পরিমাণের একটা একক বিশেষ। এক আউন্সের 24 ভাগের এক ভাগ, (ট্রয় ওয়েট ↑)।

স্পার্ক কয়েল — ইণ্ডাক্‌সন কয়েল ↑।

স্পার্কিং প্লাগ — ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌চন ইঞ্জিনে ↑ তড়িৎস্ফুরণের জন্যে যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারের মধ্যে পেট্রলের ↑ বাষ্প ও বাতাসের সংমিশ্রণে এর সাহায্যে যথাসময়ে সহসা বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব হয়।

স্পার্ম — শুক্রকীট, পুরুষের প্রজনন-কোষ। বিভিন্ন জীবের অতি সূক্ষ্ম এই স্পার্ম বা জীব-কোষ বিভিন্ন গঠন ও আকার-আকৃতির হয়ে থাকে। মাইক্রোস্কোপের ↑ সাহায্যে এদের চেহারার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একে **স্পার্মাটো-জোয়া**-ও বলে।

স্পার্মাসেটি — মোমের মত এক রকম সাদা জিনিস; তিমি মাছের চর্বি থেকে পাওয়া যায়। এর গলনাঙ্ক 40° থেকে 50° সেন্টিগ্রেড মাত্র। ক্রিম, পোমেড প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যে ও সাবান তৈরীর কাজে জিনিসটা ব্যবহৃত হয়।

স্পিজেল — লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কার্বনের এক রকম সংকর ধাতু। বিসিমার প্রোসেসে ইস্পাত (স্টিল ↑) তৈরী করবার প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমাণে এই স্পিজেল মেশান হয়।

স্পিরিট অব সল্ট—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ↑ ।

স্পিরিট অব ওয়াইন — ইথাইল অ্যালকোহল ↑ ।

স্পিরিট লেভেল — একটা সাধারণ যন্ত্র; যার সাহায্যে কোন স্থানের সমতলতা পরীক্ষা করা হয়। একটা ছোট বদ্ধমুখ কাঁচনলের মধ্যে কোন তরল পদার্থ, সাধারণতঃ স্পিরিট (অ্যালকোহল ↑) পুরে তার মধ্যে সামান্য বাতাসের একটা ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ রাখা হয়। এটাকে সমতল একটা কাঠের ফ্রেমের মাঝখানে এঁটে স্পিরিট-লেভেল তৈরী হয়
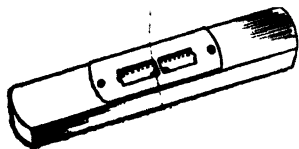
স্পিরিট লেভেল

কাঁচনলটার ঠিক মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে। ফ্রেমটা সমতল স্থানে রাখলে কাঁচনলের বুদ্বুদ্টা ওই দাগের সঙ্গে মিলে যায়, অসমতল হলে এক দিকে সরে গিয়ে স্থানের অসমতলতা নির্দেশ করে।

স্পেকুলাম মেটাল — এক রকম সংকর ধাতু; দুই ভাগ তামা ও এক ভাগ টিন মিশিয়ে তৈরী হয়। মাইক্রোস্কোপ ↑, এপিডায়াস্কোপ ↑ সিনেমা যন্ত্র প্রভৃতিতে আলোক-রশ্মি প্রতিফলনের জন্যে প্রতিফলক দর্পণাদি সাধারণতঃ এ দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

স্পেক্ট্রাম — বর্ণালী; সাধারণ আলোক-রশ্মি কোন প্রিজ্ম ↑, বা ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং-এর ↑ ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে যে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে তোলে। এই বর্ণালীর দৃশ্য অংশের এক দিকে লাল ও অপর দিকে বেগুনী রং দেখা

যায়; মাঝে থাকে পর পর মোটামুটি অন্য পাঁচটা বর্ণের সমাবেশ। সাদা আলোক-রশ্মি এভাবে তার সংগঠক বিভিন্ন বর্ণের আলোক
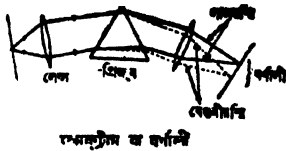
স্পেকট্রাম বা বর্ণালী

রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে এই স্পেক্‌ট্রাম, বা বর্ণালীর সৃষ্টি করে। আলোক-রশ্মি মাত্রেই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহের (ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভস্ ↑) ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে (লাইট ↑)। বর্ণহীন সাধারণ আলোকের তরঙ্গমালা বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও স্পন্দনবিশিষ্ট বিভিন্ন তরঙ্গের (বর্ণের) সমবায়ে গঠিত; প্রিজ্‌ম বা ডিফ্র্যাক্সন গ্রেটিং-এর মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের ফলে ওই সংগঠক তরঙ্গগুলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গজনিত বিভিন্ন বর্ণে প্রকাশ পায়।

মূল আলোক-রশ্মির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন রকম বর্ণালীর সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের প্রদীপ্ত ফিলামেন্ট, বা এরূপ কোন অত্যুত্তপ্ত ভাস্বর পদার্থ থেকে বিকিরিত আলোক-রশ্মির বর্ণালীতে ধারাক্রমিকভাবে মোটামুটি সাতটা বর্ণ (স্পেক্‌ট্রাম-কালার ↑) ফুটে ওঠে; অবশ্য নানা রকম মিশ্র বর্ণাভাও দেখা যায়। এরূপ বর্ণালীকে বলে **কণ্টিনিউয়াস স্পেক্‌ট্রাম**। কোন প্রদীপ্ত গ্যাস, বা বাষ্প থেকে যে আলোকরশ্মি বেরোয় তার বর্ণালীতে সব বর্ণ থাকে না; এরূপ বর্ণালীতে কয়েকটা মাত্র বর্ণের রেখা দেখা যায়, মাঝে মাঝে থাকে বর্ণহীন ব্যবধান; একে বলে **লাইন স্পেক্‌ট্রাম**। কোন কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে ওই বর্ণরেখাগুলো চওড়া ফিতার মত দেখায়, মাঝে মাঝে বর্ণহীন; একে বলে **ব্যাণ্ড-স্পেক্‌ট্রাম**। এরূপ নানা রকম বর্ণালী সৃষ্টির মূল কারণ হোল এই যে, সাদা আলোকরশ্মি বিভিন্ন গ্যাস বা সল্যুসনের ↑ মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবার সময়ে তার কোন কোন সংগঠক তরঙ্গ (বর্ণ) ওই গ্যাস বা সল্যুসনে শোষিত হয় এবং স্পেক্‌ট্রামে সেই বর্ণ বা তরঙ্গের স্থানে বর্ণহীন ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এজন্যে এ রকম বর্ণালীকে বলা হয় অ্যাব্‌জর্পসন স্পেক্‌ট্রাম।

স্পেক্‌ট্রাম কালার — সাদা আলোকরশ্মির ধারাবাহিক বর্ণালীতে (কণ্টিনিউয়াস স্পেক্‌ট্রাম ↑) মোটামুটি যে সাতটা বর্ণ দেখা

যায়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নিম্নক্রম অনুসারে ওই বর্ণগুলো যথাক্রমে লাল, কমলা, হলুদে, সবুজ, নীল, গাঢ়নীল, বেগুনী—এভাবে সাজান থাকে। এই হোল স্পেক্ট্রামের দৃশ্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে বর্ণ অসংখ্য, সুস্পষ্টভাবে ওই সাতটা বর্ণ মাত্র দেখা যায়; এ ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্ন বর্ণাভা সৃষ্টি হয়ে থাকে। লালবর্ণের পরবর্তী দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে বলে **ইন্‌ফ্রা-রেড রে** ↑ (অবলোহিত রশ্মি) এবং বেগুনী রশ্মির চেয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘের রশ্মিকে বলে **আলট্রা-ভায়োলেট রে** ↑ (অতি-বেগুনী রশ্মি)। বর্ণালীর দু'দিকের এই দুই অংশই আমাদের চোখে অদৃশ্য থেকে যায়।

স্পেক্ট্রোস্কোপ — যে যন্ত্রের সাহায্যে স্পেক্ট্রাম ↑, বা বর্ণালীর বিভিন্ন বর্ণরেখার পারস্পরিক অবস্থান, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

স্পেক্ট্রোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে স্পেক্ট্রামের ↑ বিভিন্ন বর্ণ-সমাবেশের আকার, বিস্তৃতি, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি মেপে মূল আলোক-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও মাধ্যম পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় (স্পেক্ট্রাম-অ্যানালিসিস্ ↑)।

স্পেক্ট্রোগ্রাফ — যে যন্ত্রের সাহায্য বর্ণালীর আলোকচিত্র বা ফটোগ্রা তোলা হয়। আবার এভাবে গৃহী আলোকচিত্রকেও অনেক সম স্পেক্ট্রোগ্রাফ বলা হয়ে থাকে।

স্পেক্ট্রাম অ্যানালিসিস — স্পেক্ট্রামের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থ আয়তন, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষ করে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক গ ও উপাদান বিশ্লেষণ করবার প্রক্রিয়া কোন পদার্থ থেকে বিকিরিত, কোন মাধ্যম পদার্থে পরিচালি আলোকরশ্মির বর্ণালীতে যে বিভি রূপ বর্ণরেখা উদ্ভাসিত হয় ত বিস্তৃতি ও গঠন সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে এজন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থায় স্পেক মিটার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহা বর্ণালী বিশ্লেষণ করে উৎস, মাধ্যম পদার্থের গঠন, উপাদান, প্রভৃতি সহজেই স্থির করা যে পারে। (মাস্-স্পেক্ট্রাম ↑)

স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি — আ ক্ষিক গুরুত্ব; কোন পদার্থের গুরু অর্থাৎ ওজন সম-আয়তন জ ওজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নি করে যে আনুপাতিক সংখ্যা পাও যায়। সোনার স্পেসিফিক গ্র্যা 19·3; এতে বুঝতে হবে, যে কে আয়তনের খানিকটা সোনা সম আয়তনের জলের চেয়ে 19·3

বেশী ভারী। 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের গুরুত্ব বা ওজন সব চেয়ে বেশী; এজন্যে সর্বদা 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের তুলনায় পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করা হয়। এই আপেক্ষিক গুরুত্ব, বা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি একটা সংখ্যা মাত্র। কোন পদার্থের এক ঘন সেন্টিমিটার ↑ আয়তনের ওজন যত গ্র্যাম তাকে বলে পদার্থটার **ডেন্সিটি** ↑।

স্পেসিফিক হিট — হিট, স্পেসিফিক ↑।

স্পেল্টার — অবিশুদ্ধ জিঙ্ক ↑, অর্থাৎ দস্তার ব্যবহারিক নাম; যেরূপ দস্তা সাধারণতঃ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এবং গ্যাল্‌ভ্যানাইজিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে সীসা (লেড ↑) প্রভৃতিও কিছু কিছু মিশ্রিত থাকে; বিশুদ্ধ দস্তা প্রায় 97% থাকে।

হ

হর্ন´ সিলভার — খনিজ অবিশুদ্ধ সিলভার ক্লোরাইড, AgCl; এই খনিজ থেকেই অধিকাংশ রৌপ্য নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। একে কখন কখন **ক্লোরার্জিরাইট**ও বলা হয়।

হর্ন´ ব্লেণ্ড — এক রকম ধাতব খনিজ প্রস্তর বিশেষ; প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ↑, ম্যাগ্নেসিয়াম ↑ ও আয়রনের সিলিকেট ↑ পদার্থে গঠিত। কালো বা সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ। বালি, চূণ ও ম্যাগ্নেসিয়ার ↑ রাসায়নিক মিলনের ফলে কৃত্রিম উপায়েও পদার্থটা সৃষ্টি করা যায়।

হর্মো´ন — দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী (অ্যাণ্ডোক্রাইন ↑) গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত রস; অতি জটিল গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত রাখবার জন্যে বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ↑ থেকে এরূপ বিভিন্ন হর্মোন, বা জৈব রস নিঃসৃত হয়ে থাকে। দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনে এই রস যথাসময়ে নিঃসৃত হয়ে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। হঠাৎ কোনরূপ ভয় পেলে অ্যাড্রিনেলিন হর্মোন নিঃসৃত হয়; পিটুইটারি হর্মোন দেহের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে; বিশেষ এক রকম সেক্স হর্মোন নিঃসরণের ফলে পুরুষের দাঁড়ি গোঁফ গজায়; ইন্‌সুলিন ↑ নামক হর্মোন রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে। এরূপ নানা কাজের জন্যে আরও নানা রকম হর্মোন দেহাভ্যন্তরে স্বতঃই নিঃসৃত হয়ে থাকে।

হর্স পাওয়ার — শক্তি পরিমাপের একক বিশেষ; বাংলায় বলে অশ্ব-শক্তি। 550 পাউণ্ড ↑ ওজনের কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে এক ফুট উচ্চে উত্তোলন করতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে বলে এক হর্স পাওয়ার। এর পরিমাণ 746 ওয়াট ↑, বা প্রায় 3/4 কিলো-ওয়াট ↑। ডায়নামো, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রের শক্তি এই হর্স পাওয়ার এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

হটেন্‌টট — দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার আদিম মানব জাতি। অধুনা এদের মধ্যে বান্টু, বুশম্যান, নামাকোয়া প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। পশুপালনই এদের প্রধান উপজীবিকা।

হর্টিকাল্‌চার — বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদাদির উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিপোষণ প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদির বিজ্ঞান; শাকসব্জি, ফল, ফুল উৎপাদনের সৌখিন কৃষিবিদ্যা। বিভিন্ন উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে, আলোক ও উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে চাষ আবাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এর অন্তর্গত। জলের মধ্যে (হাইড্রো-পোনিক্‌স ↑), শূন্যে, বালির মধ্যে বিভিন্ন কৌশলে বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎপাদনের প্রক্রিয়া হর্টিকাল্‌চারের

হাইগ্রোস্কোপিক — যে সব পদার্থ বায়ুর জলীয় বাষ্প টেনে নেয়; যেমন — সোডিয়াম ক্লোরাইড ↑ বা সাধারণ লবণ, NaCl, কতকটা এরূপ। চুণ বা কুইক লাইম ↑, CaO, অত্যন্ত হাইগ্রোস্কোপিক পদার্থ।

হাইগ্রোস্কোপ — যে সব যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের আনুপাতিক আর্দ্রতার (রিলেটিভ হিউমিডিটি ↑) পরিমাণ প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ বাতাসে সংমিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জানা সম্ভব হয়। এর সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার হ্রাসবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

হাইগ্রোমিটার — বায়ুমণ্ডলের হিউমিডিটি ↑, বা আর্দ্রতা পরি-মাপক যন্ত্র; যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন স্থানের বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প মিশ্রিত রয়েছে তা স্থির করা যায়। সাধারণ হাই-গ্রোমিটারে থাকে দুটো থার্মো-মিটার ↑ —একটা ভিজা কাপড় জড়ানো, অপরটা শুষ্ক (ওয়েট অ্যাণ্ড ড্রাই বাল্‌ব থার্মোমিটার)। বায়ুর আর্দ্রতা অনুযায়ী ভিজা কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে ক্রমে উবে যায়, ফলে সংলগ্ন বায়ুর

তাপ হ্রাস পায়; কাজেই ওই থার্মোমিটারে কম উষ্ণতা জ্ঞাপন করে; অপরটায় স্বাভাবিক উষ্ণতাই ওঠে। থার্মোমিটার দুটাতে পরিলক্ষিত উষ্ণতাসূচক ডিগ্রি স্কেলের পার্থক্য থেকে নির্দিষ্ট তালিকা (চার্ট) দেখে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সহজেই নির্ধারণ করা হয়।
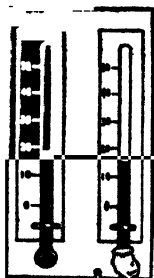
ড্রাই অ্যাণ্ড ওয়েট বালব থার্মোমিটার

হাইড্রক্সিল গ্রুপ — একটা হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটা অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে যে র‍্যাডিক্যাল↑ গঠিত হয়। এই হাইড্রক্সিল গ্রুপ বা র‍্যাডিক্যাল (OH) রাসায়নিক প্রক্রিয়াদির সহজ ব্যাখ্যার জন্যে কল্পিত হয় মাত্র। এর পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণতঃ হাইড্রক্সাইড শ্রেণীর যৌগিক পদার্থগুলো এর সংযোগেই উৎপন্ন হয়, এরূপ মনে করা যেতে পারে; যেমন — NaOH, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Cu(OH)_2$, কপার হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি।

হাইড্রক্সাইড — যে সব যৌগিক পদার্থ কোন ধাতব পরমাণুর সঙ্গে কোন হাইড্রক্সিল↑ র‍্যাডিক্যালের মিলনে গঠিত হয়। সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে জলের রাসায়নিক সংযোগের ফলে হাইড্রক্সাইড সৃষ্টি হয়ে থাকে। জলের (H_2O) একটা হাইড্রোজেন পরমাণু বিচ্যুত হলে যে হাইড্রক্সিল (OH) গ্রুপ জন্মায় তার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতব পরমাণু বা র‍্যাডিক্যাল সংযুক্ত হয়ে এই শ্রেণীর যৌগিকের উৎপত্তি ঘটে; যেমন — $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, বা স্লেকড্ লাইম↑। হাইড্রক্সাইডগুলো সবই ক্ষারধর্মী। জলে দ্রবীভূত হলে হাইড্রক্সিল আয়ন↑ ও ধাতব আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়; এজন্যে অ্যাসিডের সঙ্গে হাইড্রক্সাইডের রাসায়নিক সংযোগে সহজেই বিভিন্ন সল্ট↑ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

হাইড্রাইড — হাইড্রোজেনঘটিত বাইনারি কম্পাউণ্ডের সাধারণ নাম। কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে এরূপ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়; যেমন — সোডিয়াম হাইড্রাইড, NaH; ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড, CaH_2; জলকে বলা যায় অক্সিজেন হাইড্রাইড, H_2O, হাইড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড যেন ক্লোরিন হাইড্রাইড, HCl, ইত্যাদি।

হাইড্রেট — নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত স্ফটিকাকার যৌগিক পদার্থ। যে সব সল্টে ↑ ওয়াটার অব ক্রিস্টালিজেসন ↑ থাকে তাদেরই সাধারণতঃ হাইড্রেট বলে; একে আবার **হাইড্রেটেড সল্ট**ও বলা হয়। যেমন— কপার সালফেট (ব্লু ভিট্রিয়ল ↑), $CuSO_4, 5H_2O$, নীলবর্ণ স্ফটিকাকার পদার্থ। উত্তপ্ত করলে এর জলীয় ভাগ চলে যায়, সাদা পাউডার পড়ে থাকে, একে বলে অ্যান্হাইড্রাস কপার সালফেট।

হাইড্রলিক সিমেণ্ট — বালি ও সিমেণ্টের ↑ যে সংমিশ্রণ পর্যাপ্ত জলের সংস্পর্শে শক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ অনুপাতে (স্ট্যাণ্ডার্ড মিক্স ↑) বালি, চুণ ও সিমেণ্টের ↑ এরূপ সংমিশ্রণে জল মিশিয়ে ইট জোড়া দেওয়া হয়। একেই হাইড্রলিক সিমেণ্ট বলে, যা পরে হাওয়ায় শক্ত হয়ে যায়।

হাইড্রলিক প্রেস — যে যন্ত্রের সাহায্যে জলের চাপ পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত চাপশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা যায়। তরল পদার্থের স্বাভাবিক ধর্মানুসারে (প্যাস্ক্যাল ল ↑) আবদ্ধ পাত্রে রক্ষিত জলের যে কোন স্থানে চাপ প্রয়োগ করলে তা সর্বত্র সমশক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, এবং জলের উপরি-ভাগের আয়তন অনুসারে সে শক্তি সমষ্টিগতভাবে বেড়ে যায়। এভাবে

হাইড্রলিক প্রেস

ক্ষুদ্র এক পিস্টনের সাহায্যে অ জলে যে সাম শক্তি প্রয়ো করা হয় সেই শক্তি সংযোগ-ন জলের মাধ্যমে পরিচালিত হ বৃহত্তর পাত্রের জলে প্রভাবি হয়। এর ফলে ওই বৃহ পাত্রের অভ্যন্তরস্থ জলের উপরি ভাগের আয়তন অনুসারে পরিবর্ধি শক্তিতে বড পিস্টনে ঊর্ধ্ব চা পড়ে। ছোট পিস্টনের এক ব ইঞ্চিতে এক পাউণ্ড শক্তি প্রয়ো করলে বড় পিস্টনের 50 ব ইঞ্চিতে 50 পাউণ্ড শক্তি সঞ্চারি হবে। হাইড্রলিক ↑ প্রেসের এ কৌশলে অল্প শক্তি প্রয়োে অধিক কাজ পাওয়া যায়। এ সাহায্যে ভারী মাল উত্তোলন তুলা, পাট প্রভৃতির গাঁট বাঁ প্রভৃতি নানা রকম কাজ ক হয়ে থাকে।

হাইড্রা — ক্ষুদ্র নলাকৃতি সূক্ষ্ম জল-জীব। শোঁয়া নিয়ে এগুলো লম্বায় প্রায় আধ ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে; মুখের কাছে 6 থেকে 8-টা পর্যন্ত শোঁয়ার মত থাকে, ওই শোঁয়া-গুলোর সাহায্যে ক্ষুদ্র কীটাদি টেনে নিয়ে মুখে পোরে। হাইড্রার বৈশিষ্ট্য হোল এই যে, এদের দেহাংশ বেড়ে বেড়ে বংশ বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন অংশে উপজাত কুঁড়ির মত বর্ধিত পিণ্ড বিচ্যুত হয়ে জলে ভেসে যায়, নূতন হাইড্রা জন্মায়। আবার স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেও হাইড্রো জন্মাতে পারে। হাইড্রোজোয়া ↑ শ্রেণীর এসব জীব মিঠা (লবণাক্ত নয় এমন) জলে জন্মে থাকে।

হাইড্রোকার্বন — হাইড্রোজেন ↑ ও কার্বনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ; যেমন — মিথেন, CH_4, ইথেন, C_2H_6 প্রভৃতি। প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর সকল পদার্থই হাইড্রোকার্বনে গঠিত। পেট্রল ↑, কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তৈলগুলো প্রধানতঃ বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ মাত্র। হাইড্রোকার্বন কঠিন, তরল ও বায়বীয় সব রকমেরই আছে।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত অ্যাসিড। একে ক্লোরিন হাইড্রাইড ↑ বা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডও (HCl) বলা যেতে পারে। একে কখন কখন আবার **মিউরিয়েটিক ↑ অ্যাসিড**, বা **স্পিরিট অব সল্টও** বলা হয়। বর্ণহীন ধূমায়মান তরল পদার্থ; যাতে লাগে তা ক্ষয়ে যায়। অধিকাংশ ধাতু এতে দ্রবীভূত হয়ে ধাতব ক্লোরাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন হয় ও হাইড্রোজেন ↑ গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। সাধারণতঃ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl) উপর সা ল ফি উ রি ক ↑ (H_2SO_4) অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন ↑ গ্যাসের রাসায়নিক মিলনেও (হাইড্রাইড ↑) এর উৎপত্তি ঘটে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোগ্রাফি — সমুদ্রের তল-দেশের মানচিত্র; বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের গভীরতা অনুযায়ী তল-দেশের অসমতলতা নির্দেশক এরূপ মানচিত্র জাহাজ চালনার সময়ে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন — মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ; সাংকেতিক চিহ্ন H; পারমাণবিক ওজন 1·008,

পারমাণবিক সংখ্যা 1 ; বর্ণহীন, গন্ধহীন, দাহ্য গ্যাস। সবচেয়ে হাল্‌কা মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালালে বায়ুর অক্সিজেনের ↑ সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে সৃষ্টি হয় (H_2O) জল। এর প্রত্যেকটি অণু দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত ; এজন্যে হাইড্রোজেন অণুকে H_2 লেখা হয়। এর প্রত্যেকটি পরমাণু আবার একটি প্রোটন ↑ ও একটি ইলেক্ট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত (হেভি হাইড্রোজেন ↑)। অক্সি-হাইড্রোজেন ফ্লেম ↑ সৃষ্টির জন্যে, রিডিউসিং এজেন্ট ↑ হিসেবে, কৃত্রিম উপায়ে অ্যামোনিয়া ↑, তৈরীর জন্যে এবং উদ্ভিজ্জ ঘৃত (হাইড্রোজেনেটেড অয়েল ↑) প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে গ্যাসটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন আয়ন — হাইড্রোজেন পরমাণুর ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন ↑ ; প্রোটন ↑ কণিকা। বিভিন্ন অ্যাসিডের জলীয় দ্রবের মধ্যে এরূপ তড়িতাবিষ্ট, অর্থাৎ আয়নায়িত হাইড্রোজেন কণিকা বিমুক্ত হয়ে ধাতব সল্টের ↑ উৎপত্তি ঘটায়। অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগের শক্তি এর উপরই নির্ভর করে, এজন্যে একে কখন কখন **অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন**ও বলা হয়।

হাইড্রোজেন আয়ন কন্সেন্ট্রেসন — রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কোন অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হলে হাইড্রোজেন আয়ন ↑ বিমুক্ত হয়, সে ধন-তড়িতাবিষ্ট (+H) হয়ে থাকে। এই হাইড্রোজেন আয়ন যে OH গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হোল ঋণ-তড়িতাবিষ্ট (−OH)। এদের মিলনে হয় জল (+H. −OH =H_2O) ; এই জল + বা − কিছুই নয়, তড়িৎহীন। যে কোন তরল পদার্থের মধ্যে অ্যাসিড ও অ্যালক্যালির ↑ অনুপাত পরীক্ষা করবার জন্যে তার মধ্যে এরূপ হাইড্রোজেন আয়নের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ করা হয় ; অ্যাসিডভাবাপন্ন হলে তরল পদার্থে হাইড্রোজেন আয়নের আধিক্য ঘটবে—অ্যালক্যালি হলে বিপরীত হবে। সাধারণতঃ এক লিটার ↑ সল্‌ভেন্টের ↑ মধ্যে এক গ্র্যাম-অ্যাটম ↑ সলিউট ↑ দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন তরল পদার্থে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (+H) বিমুক্ত হয় তাকেই বলে হাইড্রোজেন আয়ন কন্সেনট্রেসন ; সংক্ষেপে একে pH বলে উল্লেখ করা হয়। pH7 বললে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝায়, অর্থাৎ (+H) ও (−OH) সমপরিমাণ আছে, যেমন আছে জলে। pH 1 বললে বুঝতে হবে

অত্যন্ত অ্যাসিডভাবাপন্ন, অর্থাৎ যথেষ্ট +H বর্তমান। pH13 বললে বুঝায় অত্যন্ত অ্যালক্যালি-যুক্ত, অর্থাৎ যথেষ্ট বেশী (−OH) রয়েছে।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড — হাইড্রোজেন ↑ ও অক্সিজেন ↑ গ্যাসের একটা বিশেষ যৌগিক, H_2O_2 ; ঘন তরল পদার্থ। সাধারণতঃ এর জলীয় দ্রবই বাজারে বিক্রয় হয়। জীবাণুরোধক ও বিরঞ্জক (ব্লিচিং ↑) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জল হোল H_2O ; এর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত অক্সিজেন পরমাণুর মিলনে হয় H_2O_2 , অর্থাৎ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন পরমাণুটা অস্থায়ী ; সুতরাং উন্মুক্ত রাখলে এ থেকে সহজেই অতিরিক্ত অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে গিয়ে জলে (H_2O) পরিণত হয়। যে সব ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্যে অক্সিজেন গ্যাস সহজলভ্য হয় না, (যেমন—টর্পেডো, সাবমেরিন প্রভৃতিতে) সেখানে অক্সিজেনের উৎস-স্বরূপ এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাইড্রোজেন সালফাইড — বর্ণহীন বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ ; পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত। একে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনও (H_2S) বলা হয়। যে কোন ধাতব সালফাইডের ↑ সঙ্গে যে কোন মৃদু অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ কিপ্‌স অ্যাপারেটাস ↑ নামক যন্ত্রে সোডিয়াম সালফাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে গ্যাসটা তৈরী হয়। রসায়নাগারে বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষাদি কার্যে এর বিশেষ প্রয়োজন।

হাইড্রোজেন ফস্‌ফাইড — ফস্‌ফরাস ↑ ও হাইড্রোজেনের একটা বাইনারি কম্পাউণ্ড। একে সাধারণতঃ ফসফিন ↑ (PH_3) বলা হয়।

হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল— হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন তরল উদ্ভিজ্জ তৈল ও জান্তব চর্বি (লিকুইড ফ্যাটস্‌ অ্যাণ্ড অয়েলস্‌) ঘনীভূত করবার প্রক্রিয়া। এরূপ কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন জৈব তরল তৈল ও চর্বিকে ঘৃতের মত ঘনীভূত পদার্থে রূপান্তরিত করে বনস্পতি প্রভৃতি কৃত্রিম ঘৃত প্রস্তুত হয়ে থাকে। উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বিতে প্রচুর পরিমাণে ট্রায়োলিন ($C_{57}H_{104}O_6$) নামক তরল পদার্থ থাকে, হাইড্রোজেনের প্রভাবে ওই তরল ট্রায়োলিন ট্রাইস্টিয়ারিন ($C_{57}H_{110}O_6$) নামক কঠিন পদার্থে

রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় তরল তেল কেবল ঘনীভূতই হয় না, তার স্বাভাবিক গন্ধও বিনষ্ট হয়ে যায়। তরল তেল বা চর্বির মধ্যে নিকেল ↑ ধাতুর সূক্ষ্ম কণিকা মিশ্রিত করে উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করান হয়, এর ফলেই ওইরূপ সব পরিবর্তন ঘটে থাকে। নিকেল এই প্রক্রিয়ায় ক্যাটালিস্টের ↑ কাজ করে।

হাইড্রোজেনেসন অব কোল — হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে কয়লা থেকে এক রকম কৃত্রিম খনিজ তৈল (তরল হাইড্রো কার্বন ↑) প্রস্তুত করবার প্রণালী। সাধারণতঃ প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড ↑ উষ্ণতায় ও প্রায় 250 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (ব্যারোমিটার ↑) হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে কয়লার গুঁড়া উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে কয়লার কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং বিভিন্ন তরল হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এই তরল হাইড্রোকার্বন প্রায় স্বাভাবিক খনিজ তৈলের অনুরূপ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থ ক্যাটালিস্ট হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোকার্বন তৈরীর এই প্রক্রিয়া বার্জিয়াস প্রোসেস নামে খ্যাত।

হাইড্রোজেন বম্ — হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়ার ফিউসন ↑ প্রক্রিয়ায় অতি প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদক যে বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে। একে এইচ্-বম্ও (H-bomb) বলা হয়। অ্যাটম-বোমায় ↑ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের (ফিসন ↑) ফলে শক্তির উদ্ভব হয়, বিস্ফোরণ ঘটে। আর হাইড্রোজেন-বোমায় হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন সংযোজনের (ফিউসন ↑) ফলে প্রচণ্ড শক্তি বিমুক্ত হয়, অধিকতর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। সাধারণ হাইড্রোজেনে এই ফিউসন ঘটানো সম্ভব হয় না ; হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ↑ ডয়টেরন ↑ ও ট্রাইটিয়ামের (হেভি হাইড্রোজেন ↑) ফিউসন ঘটানো হয়। অ্যাটম-বোমার (অ্যাটম বম্ ↑) বিস্ফোরণে উৎপন্ন প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে হাইড্রোজেনের ওই সব আইসোটোপের কেন্দ্রীন সংযোজন ঘটিয়ে এরূপ অসীম শক্তির উদ্ভব ঘটে। হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনগুলো এর ফলে হিলিয়াম ↑ গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

হাইড্রোজেল — কোলয়ড্যাল ↑ পদার্থের ঘন জলীয় দ্রব ; যা বিশেষ ঘনীভূত হয়ে জেলির মত কতকটা স্থিতিস্থাপক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, হাইড্রোসল ↑

ঘনীভূত হয়ে জেলির মত অবস্থায় এলে তাকেই বলে হাইড্রোজেল।

হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন ও ফ্লোরিন ↑ গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড। এই গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের (HF) জলীয় দ্রব হোল হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড। বর্ণহীন তরল পদার্থ; ধাতব পদার্থাদি যাতে লাগে তাই ক্ষয়ে গলে যায়। সাধারণতঃ কোন অ্যাসিডেই কাঁচ ক্ষয় হয় না; কিন্তু হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডে কাঁচ গলে যায়। এজন্যে কাঁচের উপর নক্সা তুলতে বা লেখার দাগ কাটতে এটা ব্যবহৃত হয়। হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড কাঁচের বদলে গাটাপার্চার ↑ শিশিতে রাখা হয়।

হাইড্রোজোয়া — এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র জলজীব বা কীট; সাধারণতঃ মিঠা (লবণাক্ত নয় এমন) জলেই এগুলো জন্মায়। এই শ্রেণীর হাইড্রা ↑, ওবেলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের নানা রকম জলজ জীবাণু আছে। শোঁয়া নিয়ে লম্বায় এর কোনটাই আধ ইঞ্চির বেশী হয় না।

হাইড্রোফোবিয়া — জলাতঙ্ক রোগ; ইংরেজিতে এর অপর নাম র‍্যাবিস। হাইড্রো মানে জল, ফোবিয়া ভয়; এরোগে রোগী জল দেখে ভয় পায়। এর অর্থ হোল: তৃষ্ণায় জল পান করতে গেলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, রোগী দূরে সরে যায়। পাগলা শেয়াল কুকুরে কামড়ালে মানুষের এ রোগ হয়ে থাকে; ক্ষিপ্ত শেয়াল কুকুরের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে ভাইরাস ↑ জাতীয় অতি সূক্ষ্ম জীবাণু জন্মে, কামড়ালে লালার সঙ্গে ওই জীবাণু অন্য জীবের দেহে প্রবেশ করে। এর ফলে রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, দেহের মাংসপেশী, বিশেষতঃ গল-নালী সংকুচিত হয়ে যায়। জল পানের চেষ্টা করলে, বা তীব্র আলোক চোখে পড়লে রোগীর সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে যায়। দুরারোগ্য ব্যাধি। বিজ্ঞানী পাস্তুর প্রবর্তিত ইঞ্জেক্‌সন প্রয়োগে অবশ্য আজকাল এ রোগ আরোগ্য হচ্ছে।

হাইড্রোপোনিক্‌স — বিভিন্ন উদ্ভিদের উপযোগী বিভিন্ন রাসায়নিক সল্টের জলীয় দ্রবের মধ্যে উদ্ভিদ উৎপাদন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মাটি নেই, শুধু জলেই গাছ জন্মায়, ফল ফুল হয়। ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে এরূপ বৃহদাকার উদ্ভিদ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান আছে।

হাইড্রোপ্লেন — যে বিমানপোত জলে অবতরণ করতে পারে, এবং জল থেকেই আবার আকাশে উঠে যেতে পারে। এরূপ বিশেষ গঠনের

এরোপ্লেন জলে ভাসতে ও আকাশে উড়তে পারার উপযোগী করেই নির্মিত হয়।

হাইড্রোমিটার — যে যন্ত্রের সাহায্যে তরল পদার্থের ডেন্সিটি ↑, বা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ↑ মাপা যায়। সাধারণ হাইড্রোমিটার যন্ত্রে থাকে অপেক্ষাকৃত লম্বা একটা কাঁচনল, যার তলদেশে সংলগ্ন থাকে একটা ছোট কাঁচগোলক। ওই গোলকটার মধ্যে সাধারণতঃ কিছু মার্কারি ↑ দিয়ে ভারী করা হয়। এর ফলে তরল পদার্থের মধ্যে যন্ত্রের নলটা উপরে খাড়াভাবে জেগে ভেসে থাকে। ওই কাঁচনলের গায়ে ঘনত্ব পরিমাপক স্কেলের দাগ কাটা থাকে। তরল পদার্থের ঘনত্ব যত বেশী হবে ওই নলটা তত বেশী উপরে ভেসে উঠবে (বয়েন্সি ↑)। স্কেলের দাগ দেখে এভাবে বিভিন্ন তরল পদার্থের ঘনত্ব বা ডেন্সিটি সহজেই নিরূপণ করা যায়। ল্যাক্টোমিটার ↑, [illegible]টার ↑ প্রভৃতি এরূপ বিভিন্ন স্কেলযুক্ত হাইড্রোমিটার মাত্র।
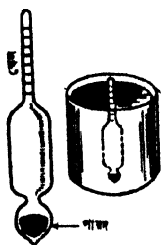
পারদ

হাইড্রোমিটার

হাইড্রোলিথ — ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের (CaH_2) বিশেষ নাম; কঠিন পদার্থ। এর সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়া এভাবে প্রকাশ করা যায়: $CaH_2 + 2H_2O = Ca(OH)_2$, (স্লেকড লাইম ↑) $2H_2$, (হাইড্রোজেন)। প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে এই হাইড্রোলিথ ব্যবহৃত হয়। উড়ন্ত খেলনা বেলুনে যে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতি করা হয় তা সাধারণতঃ এ থেকেই তৈরী করা হয়ে থাকে।

হাইড্রোলিসিস — জলের সংযোগে কোন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জলও বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অবস্থাটি ঘটে এইরূপ: যৌগিক পদার্থটা যেন AB; এখন $AB + H_2O = AOH + BH$; মৃদু অ্যাসিড বা বেসের ↑ বিভিন্ন সল্ট জলে দ্রবীভূত করলে এই প্রক্রিয়ায় তা আংশিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে; উৎপন্ন ঋণ-তড়িতাবিষ্ট হাইড্রক্সিল র্যাডিক্যাল ↑ (−OH) বেসের ধন-তড়িতাবিষ্ট র্যাডিক্যালের সঙ্গে যুক্ত হয়। এস্টার ↑ জাতীয় পদার্থ হাইড্রোলিসিসের ফলে অ্যালকোহল ↑

ং অ্যাসিডে ↑ রূপান্তরিত হয়ে যায়। সাবান তৈরীর স্যাপোনিফিকেসন ↑ প্রক্রিয়াও এক রকম হাইড্রোলিসিসের ব্যাপার।

হাইড্রোসল — কোলয়ডাল সলিউসন ↑ ; বিভিন্ন কোলয়ডাল ↑ পদার্থের জলীয় দ্রব (হাইড্রোজেল ↑)।

হাইড্রোস্ফিয়ার — পৃথিবীর জলীয় মণ্ডল। ভূ-পৃষ্ঠের সমুদ্র, সাগর হ্রদ, নদনদী প্রভৃতি সহ সমগ্র জলীয় অংশের পরিমণ্ডল।

হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড — হাইড্রোজেন গ্যাসের সায়েনাইড ↑ (HCN) ; বর্ণহীন ও মারাত্মক বিষাক্ত তরল পদার্থ। একে কখন কখন **প্রুসিক অ্যাসিড**ও বলা হয়। এর বিষ-ক্রিয়ার ফলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।

হাইড্রোস্ট্যাটিক্স — তরল পদার্থের স্থির অবস্থিতি-জনিত শক্তি, চাপ, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান। বাংলায় বলা যায় উদস্থিতি বিদ্যা।

হাইপারমেট্রোপিয়া — চোখের এক রকম দৃষ্টিদোষ, লং সাইট ↑ ।

হাইপারল — হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ↑ (H_2O_2) ও ইউরিয়ার ↑ রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন একটা যৌগিক পদার্থের ব্যবহারিক নাম। স্ফটিকাকার এক রকম কঠিন পদার্থ, $CC(NH_2)_2 . H_2O_2$; জলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থটা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে ; পুনরায় এ থেকে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড পাওয়া যায়।

হাইপো — শব্দার্থ তোল, নীচে বা কম ; যেমন—হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসন ↑ , সাধারণতঃ চামড়ার নীচে যে ইঞ্জেকসন করা হয়। **হাইপো অ্যাসিডিটি** — পাকস্থলীর পাচক রসে প্রয়োজনানুরূপ অম্ল রস বা অ্যাসিডের অভাবজনিত অগ্নিমান্দ্য ও বদহজম রোগ।

হাইপো (সল্ট) — সোডিয়াম থায়োসালফেট, $Na_2S_2O_3 . 5H_2O$; সল্টটা সংক্ষেপে হাইপো নামে পরিচিত। এর কারণ, পূর্বে একে ভুলবশতঃ সোডিয়াম হাইপোসালফাইট বলে মনে করা হতো। বরং একে সোডিয়াম হাইপোসালফেট বলা যায়। এর জলীয় দ্রব ফটোগ্রাফির ↑ ফিক্সিং প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

হাইপোক্লোরাইট — হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডের (HClO) বিভিন্ন সল্ট। সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের হাইপো ক্লো রা ইট সল্টগুলো সব বীজাণু-প্রতিরোধক

পদার্থ হিসেবে ও ব্লিচিং-এর ↑ কাজে ব্যবহৃত হয়; যেহেতু এগুলোর অক্সিডাইজিং ↑ শক্তি যথেষ্ট প্রবল।

হাইপোজিল প্ল্যাণ্ট — সম্পূর্ণরূপে মাটির তলায় প্রোথিত অবস্থায় যে সব উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজপত্রদ্বয় (কটিলিডন্‌স) মাটির ভিতরে থেকে যায়, অঙ্কুরিত উদ্ভিদকাণ্ড মৃত্তিকা ভেদ করে উপরে ওঠে। যে সব উদ্ভিদের অঙ্কুরিত কাণ্ড বীজপত্র নিয়ে উপরে উঠে যায় তাদের বলে **এপিজিল প্ল্যাণ্ট**।

হাইপোডার্মিক ইঞ্জেক্‌সন — হাইপো মানে নীচে, ডার্মিস চামড়া; সূঁচ বিদ্ধ করে গাত্রচর্মের অব্যবহিত নীচে তরল ঔষধ প্রয়োগ করবার প্রক্রিয়া। এজন্যে ব্যবহৃত সূঁচকে বলে হাইপোডার্মিক সি রি ঞ্জ। মাংসপেশীর মধ্যে যে ইঞ্জেক্‌সন দেওয়া হয় তাকে বলে **ইণ্টারমাস্কুলার**, এবং শিরার মধ্যে দিলে তাকে বলে **ইণ্টারভেনাস ইঞ্জেকসন**।

হাইস্পিড স্টিল — এক প্রকার অতি কঠিন ইস্পাত। সাধারণ স্টিলের ↑ সঙ্গে 12% থেকে 22% পর্যন্ত টাংস্টেন ↑ ও অল্প পরিমাণ ক্রোমিয়াম ↑, ভ্যানাডিয়াম ↑ প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত করে এই হাইস্পিড স্টিল তৈরী হয়ে থাকে। এরূপ ইস্পাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। অত্যন্ত তাপসহ; উত্তাপে লাল হয়ে গেলেও এ স্টিল নরম হয় না।

হার্ড ওয়াটার — খর জল; যে জলে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকায় সাবান গুল্‌লে ভাল ফেনা হয় না। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ও লৌহের বিভিন্ন সল্ট এরূপ জলে দ্রবীভূত থাকে। সাবানের সঙ্গে এই সল্টগুলোর রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের অদ্রাব্য ধাতব সল্ট উৎপন্ন হয়ে সাবানের কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে, (সোপ ↑, সফ্‌ট ওয়াটার ↑)। হার্ড ওয়াটার দু'রকম, এক রকম হোল অস্থায়ী, যার মধ্যে বাইকার্বনেট ↑ সল্ট দ্রবীভূত থাকে। এরূপ খর জল উত্তাপে ফুটালেই বাইকার্বনেট সল্ট বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যায়, অদ্রাব্য কার্বনেট সল্ট জলের তলায় পড়ে। এভাবে প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে সহজেই এরূপ হার্ড ওয়াটারকে সফ্‌ট ওয়াটারে ↑ পরিণত করা যায়, সাবানে কাজ হয়। জলে ধাতব সালফেট সল্ট দ্রবীভূত থাকলে তাকে বলে পারম্যানেণ্ট বা স্থায়ী খর জল। এরূপ হার্ড

ওয়াটারকে সফ্ট ওয়াটারে পরিণত করতে হলে প্রথমে ওয়াশিং সোডা ↑ মেশাতে হয়, যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট সল্ট উৎপন্ন হয়ে পাত্রের তলায় পড়ে। সব রকম হার্ড ওয়াটারকেই জিওলাইট ↑ মিশিয়ে উত্তপ্ত করে তার খরতা দূর করা যেতে পারে।

হার্ডেনিং অব ফ্যাট — জৈব তরল তৈল ও চর্বিকে হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রভাবে ঘনীভূত করবার কৌশল (হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল্ ↑)।

হিউমাস — ব্যাক্টেরিয়া ↑ শ্রেণীর জীবাণুর প্রভাবে লতা, পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়। এ এক রকম জৈব সার। কৃষিজমির মাটিতে হিউমাস মিশ্রিত থাকলে উদ্ভিদাদি ভাল জন্মায়।

হিউমিডিটি — বায়ুর আর্দ্রতা; বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক পরিমাণ। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও চাপের হ্রাসবৃদ্ধির উপর মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ভর করে। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুর সম্পৃক্ত অবস্থায় যতটা জলীয় বাষ্প থাকা সম্ভব (স্যাচুরেসন ↑) তার শতকরা যত ভাগ প্রকৃতপক্ষে থাকে, তাকে বলে **রিলেটিভ হিউমিডিটি**।

হিট্ — তাপ শক্তি; পদার্থের সংগঠক অণুগুলোর আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্য বৃদ্ধি বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে শক্তির উদ্ভব ঘটে। উত্তাপে স্বভাবতঃই পদার্থের আয়তন বাড়ে ও ক্রমে অবস্থান্তর ঘটে থাকে — কঠিন পদার্থ তরল হয় (মেল্টিং পয়েন্ট ↑), আরও অধিক উষ্ণতায় ওই তরল পদার্থ বায়বীয় আকার ধারণ করে (বয়েলিং পয়েন্ট ↑)। কোন পদার্থের তাপশক্তি সংলগ্ন পদার্থের মধ্যে সঞ্চারিত, পরিবাহিত ও বিকিরিত হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে পদার্থের হিট্ বা তাপশক্তির পরিমাণ স্থির করা হয়। তাপশক্তির প্রকাশ ও হ্রাসবৃদ্ধির অবস্থা নির্দেশের জন্যে টেম্পারেচারের ↑ বিভিন্ন একক (সেন্টিগ্রেড ↑ , ফারেনহাইট ↑ ও রুমার ↑) ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে কোন পদার্থে নিহিত মোট তাপশক্তি বা হিট্ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

টেম্পারেচার ও হিট এক জিনিস নয়; হিট্ হোল তাপশক্তি, যার পরিমাণ ক্যালোরি ↑ এককে নির্ণীত হয়; আর টেম্পারেচারে ওই তাপশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি অর্থাৎ পদার্থটার উষ্ণতা নির্দেশ করে। এক বালতি জলের হিট্

অর্থাৎ মোট তাপশক্তি এক গ্রাস অনুরূপ উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের চেয়ে বেশী হবে ; যদিও উভয় জলের টেম্পারেচার ↑ সমান।

হিট অব সল্যুসন — এক গ্র্যাম-মলিকিউল ↑ পরিমাণ পদার্থ জলে দ্রবীভূত করলে যতটা তাপ উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয়। কোন কোন পদার্থ দ্রবীভূত হলে সল্যুসনের ↑ তাপ বৃদ্ধি ঘটে (এক্সোথামিক ↑), আবার কোন কোন পদার্থের ক্ষেত্রে তাপ হ্রাস পায় (এণ্ডো-থার্মিক ↑)। কোন সল্যুসনে তাপের এরূপ হ্রাসবৃদ্ধি সাধারণতঃ ক্যালোরি ↑ এককে মাপা হয়।

হিট্ অব ফর্মেসন — বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক মিলনে এক গ্র্যাম-মলিকিউল ↑ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তিকালে যে পরিমাণ তাপশক্তি উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয়। যৌগিক পদার্থের সংগঠন প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই তাপের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। আবার বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার (কেমিক্যাল রিঅ্যাক্সন ↑) ফলে এক গ্র্যাম-মলিকিউল পরিমাণ নূতন যৌগিকের সৃষ্টি হতে যতটা তাপ উদ্ভূত বা বিলুপ্ত হয় তাকে বলে হিট্ অব **রিঅ্যাকসন**; একেই আবার কখন কখন বলে থার্মাল ভ্যালু অব কেমিক্যাল রিঅ্যাকসন।

হিট্ অব রেডিয়েসন — বিকিরিত তাপশক্তি। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভ, অর্থাৎ চুম্বকীয় তড়িত্তরঙ্গের আকারে তাপশক্তি বিকিরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (ওয়েভ লেংথ ↑) দৃশ্য লাল-বর্ণের আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের হতে পারে।

হিট, লেটেণ্ট — উষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীতই এক গ্রাম পদার্থের অবস্থান্তর (কঠিন থেকে তরল, বা তরল থেকে গ্যাসীয়) ঘটাতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। তাপ হ্রাসের ফলে কোন তরল পদার্থ যখন জমে কঠিন হতে থাকে (সলিডিফাইং পয়েণ্ট ↑), বা তাপ বৃদ্ধির ফলে কোন কঠিন পদার্থ গলে তরল (মেল্টিং পয়েণ্ট ↑), বা ক্রমে বাষ্পীভূত হতে থাকে (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑) তখন উত্তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সম্যক পদার্থের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওই পদার্থের উষ্ণতা (টেম্পারেচার ↑) বৃদ্ধি হয়

না, একই উষ্ণতায় থাকে। পদার্থের এরূপ অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যে প্রযুক্ত তাপশক্তি অবস্থান্তরিত পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এরূপ সঞ্চিত বা পরিশোষিত তাপ-শক্তিকেই বলে লেটেণ্ট হিট্‌। বিপরীত প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ কঠিন পদার্থ যখন তরল হতে থাকে (লেটেণ্ট হিট অব ফিউসন) বা তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হতে থাকে (লেটেণ্ট হিট্‌ অব ভেপোরি-জেসন ↑), তখন ওই লেটেণ্ট বা পরিশোষিত তাপ শক্তি পুনরায় প্রকাশ পায়।

হিট্‌, স্পেসিফিক — এক গ্র্যাম পদার্থের ও এক গ্র্যাম (4° সেণ্টি-গ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট) জলের উষ্ণতা পৃথকভাবে এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বর্ধিত করতে যতটা তাপশক্তির (হিট ↑) প্রয়োজন হয়, এতদুভয়ের অনুপাতকে বলে ওই পদার্থের স্পেসেফিক হিট। এখন, এক গ্র্যাম জল এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তপ্ত করতে মোটামুটি এক ক্যালোরি ↑ উত্তাপ প্রয়োজন হয়ে থাকে। সুতরাং যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োগে এক গ্র্যাম পদার্থের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড ↑ বর্ধিত হয়, পরিমাণ হিসেবে তাকেই ওই পদার্থের স্পেসিফিক হিট বা বিশেষ তাপ ধরা যেতে পারে। সাধারণত: ক্যালোরি ↑ এককে এই স্পেসিফিক হিট্‌ পরিমিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক পদার্থের স্পেসিফিক হিট নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন; পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপরেই এই তাপের বিভিন্নতা নির্ভর করে।

হিপ্‌সোমিটার — এক রকম যন্ত্র; যার সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑) সহজেই নির্ণয় করা যায়। সাগরপৃষ্ঠ থেকে কোন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করবার জন্যেই প্রধানত: এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক জানলে সহজেই হিসাব করে ওই স্থানের উচ্চতাও জানা যেতে পারে। এর মূল তথ্যটা হোল এই যে, তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের উপর নির্ভরশীল। (বয়েলিং পয়েণ্ট ↑) বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে; স্থানীয় উচ্চতা বাড়লে বায়ুর চাপ কমে যায়, ফলে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্কও হ্রাস পায়। এভাবে উচ্চতা অনু-সারে বায়ুর চাপ যত কমে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্কও তদনুযায়ী কমতে থাকে। এরূপ হিসাব অনুসারে হিপ্‌সোমিটার দিয়ে কোন স্থানের

উচ্চতা সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে।

হি লি য়া ম — মৌলিক গ্যাস; সাংকেতিক চিহ্ন He; পারমাণবিক ওজন 4·003, পারমাণবিক সংখ্যা 2; অন্যতম ইনার্ট ↑ গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান (প্রায় দুই লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র)। কোন কোন স্থানে ভূ-গর্ভোত্থিত গ্যাসে হিলিয়াম পাওয়া যায়। গ্যাসটা অদাহ্য ও বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা বলে বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

হিমোগ্লোবিন — লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকা নামক দু'রকম কণিকা রক্তরসে (সিরাম ↑) ভেসে আছে। এক রকম রঙীন পদার্থের জন্যে রক্তের ওই লোহিত কণিকা-গুলো রক্তবর্ণ হয়; তাই রক্ত লাল দেখায়। রক্তের এই রঙীন অংশটাই হিমোগ্লোবিন; যা এক রকম প্রোটিন জাতীয় পদার্থে গঠিত। রাসায়নিক হিসেবে জিনিসটা কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও লৌহ ঘটিত একটা অতি জটিল গঠনের জৈব যৌগিক পদার্থ। শ্বাস বায়ুর সঙ্গে যে অক্সিজেন দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে তা এই জৈব রঙীন পদার্থ অর্থাৎ হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিশে শিরা-উপশিরার পথে সার দেহে ছড়িয়ে যায়। দেহাভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন নিজে অক্সিডাইজ্‌ড হয় না, অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অক্সি-হিমোগ্লোবিনের আকারে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

হেক্টো, হেক্টা — এক শত, বা এক শত গুণ বুঝাতে কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন—হেক্টোমিটার, হেক্টাহেড্রন ইত্যাদি।

হেটারোজেনাস — যে পদার্থের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক ও বস্তুগত গঠন একরূপ নয়, বিভিন্ন গঠনের সংমিশ্রণ মাত্র। হোমোজেনাস শব্দের বিপরীত অর্থবোধক হেটারো শব্দের অর্থ বিভিন্ন।

হেয়ার সল্ট — খনিজ অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের [$Al_2(SO_4)_3 . 18H_2O$] বিশেষ নাম। সাদা স্ফটিকাকার পদার্থ, জলে দ্রবণীয়।

হেভি স্পার — খনিজ বেরিয়াম সালফেট, $BaSO_4$; সাদা অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ। একে সাধারণত ব্যারাইটস্‌ বলে।

হেভি ওয়াটার — হেভি হাইড্রোজেনকে ↑ বলে ডয়েটেরিয়াম। এই ডয়েটে রি য়া মে র অক্সাইড (D_2O) হোল হেভি ওয়াটার। সাধারণ জলের (হাইড্রোজে

অক্সাইড, H_2O) মত তরল পদার্থ। হেভি হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনকে বলে ডয়টেরন। এটা হাইড্রোজেনের একটা বিশেষ আইসোটোপ ↑, যার অ্যাটমিক ওয়েট হোল দুই; সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট এক। বিশেষ এক রকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়। অ্যাটমিক পাইল ↑ যন্ত্রে পদার্থের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকসনের ↑ তীব্রতা মন্দীভূত করবার জন্যে হেভি ওয়াটার মডারেটর ↑ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (হাইড্রোজেন বম্ ↑)।

হেভি হাইড্রোজেন — বিশেষ গঠনের ভারি হাইড্রোজেন গ্যাস; হাইড্রোজেনের একটা বিশেষ আইসোটোপ ↑, যার বিশেষ নাম ডয়টেরিয়াম। সাধারণ হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট এক; কিন্তু এই **ডয়টেরিয়াম** বা হেভি হাইড্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট দুই। এর নিউক্লিয়াস ↑ অর্থাৎ কেন্দ্রীনকে বলে **ডয়টেরন**, যা একটা প্রোটন ↑ কণিকা ও একটা নিউট্রন ↑ কণিকার সমবায়ে গঠিত হয়। সাধারণ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে কোন নিউট্রন কণিকা থাকে না। সাইক্লোট্রন ↑ যন্ত্রের সাহায্যে এই ডয়টেরনকে সবিশেষ গতিযুক্ত করে অ্যাটম ভাঙার (ফিসন ↑) জন্যে প্রয়োগ করা হয়। আবার **ট্রাইটিয়াম** নামক আর এক রকম হেভি হাইড্রোজেনও পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই ডয়টেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম উভয়ই হেভি হাইড্রোজেন; সাধারণ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ↑ মাত্র। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, মূলতঃ এই দু'রকম হেভি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকস্নন (ফিউসন) ঘটিয়েই হয়তো হাইড্রোজেন বম্ ↑ সৃষ্টি হয়েছে।

হেভিসাইড কেনেলি লেয়ার — পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার ↑ স্তরের একাংশ এই নামে পরিচিত। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 70 মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত এই স্তরে বেতার তরঙ্গ ক্রমাগত প্রতিফলিত

বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন

হয়ে হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে বেঁকে আসে, তাই বহু দূরবর্তী স্থানেও বেতার তরঙ্গ পৌছান সম্ভব হয়। এরূপ না হলে বেতার তরঙ্গ সর্বদা ঋজু পথে মহাশূন্যে চলে যেত, গোলাকার ভূ-পৃষ্ঠের দূরবর্তী স্থানে পৌছান সম্ভব হতো না। এই হেভিসাইড স্তরের বায়ু কণিকা

আয়নায়িত বা তড়িতাবিষ্ট থাকার ফলেই এরূপ হয়ে থাকে। বায়ু-মণ্ডলে এই স্তরের অবস্থান অন্যান্য স্তরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে চিত্রে দেখান হয়েছে।

হেপ্টা — সপ্ত-গুণ, বা সাত সংখ্যক বুঝাতে বিভিন্ন কথার পূর্বে ব্যবহৃত হয়; যেমন — হেপ্টাগন, হেপ্ট্যাঙ্গুলার ইত্যাদি।

হেপ্টেন হোল পেট্রোলিয়াম ↑ থেকে প্রাপ্ত সাতটা কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট একটা তরল হাইড্রো-কার্বন ↑।

হেমলক — বিষাক্ত রসযুক্ত এক শ্রেণীর উদ্ভিদ; চার পাঁচ ফুট উঁচু হয়, সাদা ফুল ফোটে। সারা ইউরোপে ও এশিয়ার কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মকালে জন্মে।

হেলিকপ্টার —বিশেষ এক শ্রেণীর বিমানপোত; যা সোজাসুজি উপরে উঠতে বা নীচে নামতে পারে। এর পাখা উপরদিকে সংবদ্ধ থাকে, এবং ব্লেডগুলো খোলের সমান্তরালভাবে ঘোরে, উপরে নীচে বাতাস কাটে। হেলিকপ্টার বিমানপোত অল্প পরিসর স্থানে স্বচ্ছন্দে অবতরণ করতে পারে বলে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ এরোপ্লেন ব্যবহৃত হয়।

হোমোজেনাস — যে পদার্থের গঠন সর্বত্র একই রূপ; রাসায়নিক হিসেবে বা গঠন-বৈশিষ্ট্যে যার কোথাও কোনরূপ বিভিন্নতা নেই। হোমো শব্দের অর্থ সমান বা একই রূপ। (হেটারোজেনাস ↑)

হোমোলগ — একই শ্রেণীর রাসায়নিক গঠন ও প্রায় একই রূপ ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের একটিকে অপরটির হোমোলগ বলে; যেমন, মিথেন ↑ (CH_4) ও ইথেন ↑ (C_2H_6) পরস্পর হোমোলগ।

হোমোলগাস সিরিজ — সমগোত্রীয় রাসায়নিক পদার্থের শ্রেণী যে সব পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও ধর্ম প্রায় একরূপ, কেবল তাদের মৌলিক উপাদানের পরমাণু সংখ্যার

বিভিন্নতার জন্তে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্যারাফিন ↑ শ্রেণীর বিভিন্ন পদার্থ এরূপ হোমোলগাস, যেমন — মিথেন ↑ CH_4, ইথেন ↑ CH_3. CH_3. প্রোপেন, $CH_3CH_2CH_3$ ইত্যাদি।

হোল্‌মিয়াম — দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতু; সাংকেতিক চিহ্ন Ho, পারমাণবিক ওজন 164, পারমাণবিক সংখ্যা 67; প্রকৃতপক্ষে ধাতুটা পৃথকভাবে পাওয়া যায় নি, বর্ণালী বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে রেয়ার আর্থ ↑ খনিজ পদার্থে এর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। সুইডিস বিজ্ঞানী ক্লিভ 1879 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন।

হ্যাবার প্রোসেস — বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ↑ থেকে অ্যামোনিয়া ↑ তৈরী করবার একটা বিশেষ রাসায়নিক প্রণালী। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্তে অ্যামোনিয়া-ঘটিত সার (ম্যানিওর ↑ ফার্টিলাইজার ↑) প্রস্তুত করবার জন্তে এই প্রণালীতে বায়ু থেকে অ্যামোনিয়া তৈরী হয় (ফিক্সেসন অব নাইট্রোজেন ↑)। যান্ত্রিক কৌশলে তিন ভাগ নাইট্রোজেন (বায়ুতে মিশ্রিত) ও এক ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাসের উত্তপ্ত সংমিশ্রণ প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন প্রভৃতির অক্সাইডের সংমিশ্রণের উপর দিয়ে চালিত করা হয়; এর ফলে ওই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাস পরে জলে দ্রবীভূত করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড আকারে পৃথক করে নিয়ে কাজে লাগানো হয়।

হ্যামাটাইট — খনিজ ফেরিক ↑ অক্সাইড, Fe_2O_3; এ থেকেই বেশীর ভাগ ধাতব লৌহ নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

হ্যালাইড — হ্যালোজেন ↑ শ্রেণীর যে কোন মৌলিকের সঙ্গে ধাতব বেসের ↑ রাসায়নিক মিলনে যে বাইনারি কম্পাউণ্ড ↑ উৎপন্ন হয়। যে কোন হ্যালোজেন সল্টকেই হ্যালাইড বলে; যেমন—বিভিন্ন ক্লোরাইড ↑ ব্রোমাইড ↑ আয়োডাইড ↑ প্রভৃতি।

হ্যালো — সূর্য বা যে কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে যে চক্রাকার আলোকপ্রভা দেখা যায়। সময় সময় কোন কোন জ্যোতিষ্কের চারদিকে এরূপ একাধিক চক্রও দৃষ্ট হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জল বা তুষার কণিকার মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ্কের বিকিরিত আলোকরশ্মি

প্রতিসরিত (রিফ্র্যাকসন্ ↑) হয়ে বিশেষভাবে বেঁকে যায়; এর ফলে বিচ্ছুরিত আলোকের ওইরূপ চক্রাকার প্রভা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

হ্যালোজেন — ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন এই চারটি সমগোত্রীয় মৌলিক পদার্থকে একসঙ্গে হ্যালোজেন বলে। এগুলো বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ হলেও এদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের একটা পর্যায়ক্রমিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। এর প্রত্যেকটি থেকে অনুরূপ হ্যালাইড ↑ সল্ট উৎপন্ন হয়।

হ্যালোজেনেটেড — কোন একটা হ্যালোজেন ↑ সংযুক্ত পদার্থকে বলে হ্যালোজেনেটেড; যেমন—হ্যালোজেনেটেড রাবার, রাবারের সঙ্গে ব্রোমিন, ক্লোরিন বা আয়োডিনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন হ্যালো[illegible]ত এবং রাবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে কোন হ্যালোজেনেটেড রাবারের উপরিভাগ বিশেষ কঠিন ও মসৃণ হয়ে থাকে। কোন ধাতব জিনিসের গায়ে রাবার এঁটে লাগাতে হয় তাতে ব্রোমিন মিশিয়ে হ্যালোজেনেটেড করা হয়

পরিশিষ্ট

মৌলিক পদার্থের তালিকা

[সাংকেতিক চিহ্ন, অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক ওয়েট]

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
অক্সিজেন	O	8	16·00
অস্মিয়াম	Os	76	190·20
অ্যাক্টিনিয়াম	Ac	89	227·00
অ্যান্টিমনি	Sb	51	121·76
অ্যামিরিসিয়াম	Am	95	241·00•
অ্যালুমিনিয়াম	Al	13	26·98
আর্সেনিক	As	33	74·91
আর্গন	A	18	39·94
অ্যাস্টেটাইন	At	85	210·00•
আর্বিয়াম	Er	68	167·20
আয়রন	Fe	26	55·85
আয়োডিন	I	53	126·91
ইউরোপিয়াম	Eu	63	152·00
ইটার্বিয়াম	Yb	70	173·04
ইট্রিয়াম	Y	39	88·92
ইউরেনিয়াম	U	92	238·07
ইণ্ডিয়াম	In	49	114·76
ইরিডিয়াম	Ir	77	193·10

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
উলফ্রাম (টাংস্টেন)	W	74	183·92
কপার	Cu	29	63·54
কার্বন	C	6	12·01
কোবল্ট	Co	27	58·94
ক্যাড্‌মিয়াম	Cd	48	112·41
ক্যালসিয়াম	Ca	20	40·08
ক্যালিফোর্নিয়াম	Cf	98	246·00*
কুরিয়াম	Cm	96	242·00*
ক্লোরিন	Cl	17	35·457
ক্রিপ্টন	Kr	36	83·80
ক্রোমিয়াম	Cr	24	52·01
গোল্ড	Au	79	197·20
গ্যালিয়াম	Ga	31	69·72
গ্যাডোলিয়াম	Gd	64	156·90
জার্মেনিয়াম	Ge	32	72·60
জিঙ্ক	Zn	30	65·38
জির্কোনিয়াম	Zr	40	91·22
জেনন	Xe	54	131·30
টার্বিয়াম	Tb	65	159·20
টিন	Sn	50	118·70
টিটানিয়াম	Ti	22	47·90
টেক্‌নেসিয়াম	Tc	43	99·00*
টেলুরিয়াম	Te	52	127·61
ট্যাণ্টেলাম	Ta	73	180·88
ডিস্প্রোসিয়াম	Dy	66	162·46

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
থলিয়াম	Tl	81	204·39
থুলিয়াম	Tm	69	169·40
থোরিয়াম	Th	90	232·12
নাইট্রোজেন	N	7	14·008
নিকেল	Ni	28	58·69
নিয়ন	Ne	10	20·18
নিয়োডিমিয়াম	Nd	60	144·27
নায়োবিয়াম	Nb	41	92·91
নেপ্‌চুনিয়াম	Np	93	237·00*
পটাসিয়াম	K	19	39·10
পোলোনিয়াম	Po	84	210·00
প্যালাডিয়াম	Pd	46	106·70
প্লাটিনাম	Pt	78	195·23
প্লুটোনিয়াম	Pu	94	239.00*
প্রাসিওডিমিয়াম	Pr	59	140·92
প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম	Pa	91	231·00
প্রোমেথিয়াম	Pm	61	147·00
ফস্‌ফরাস	P	15	30·975
ফ্রান্সিয়াম	Fr	87	223·00*
ফ্লোরিন	F	9	19·00
বার্কেলিয়াম	Bk	97	245·00*
বোরন	B	5	10·82
বিস্‌মাথ	Bi	83	209·00
বেরিলিয়াম	Be	4	9·013
ব্যারিয়াম	Ba	56	137·36

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
ব্রোমিন	Br	35	79·92
ভ্যানাডিয়াম	V	23	50·95
মার্কারি	Hg	80	200·61
মোলিব্‌ডেনাম	Mo	42	95·95
ম্যাঙ্গানিজ	Mn	25	54·93
ম্যাগ্নেসিয়াম	Mg	12	24·32
রেডিয়াম	Ra	88	226·05
রেনিয়াম	Re	75	186·31
রুথেনিয়াম	Ru	44	101·70
রুবিডিয়াম	Rb	37	85·48
রোডিয়াম	Rh	45	102·91
র‍্যাডন	Rn	86	222·00
লিথিয়াম	Li	3	6·94
লুটেসিয়াম	Lu	71	174·99
লেড	Pb	82	207·21
ল্যান্থেনাম	La	57	138·92
সাল্‌ফার	S	16	32·07
সিল্‌ভার	Ag	47	107·88
সিলিকন	Si	14	28·06
সেলেনিয়াম	Se	34	78·96
সোডিয়াম	Na	11	22·99
স্ক্যামারিয়াম	Sm	62	150·43
স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	21	45·10
স্ট্রন্সিয়াম	Sr	38	87·63
হাইড্রোজেন	H	1	1·008

নাম	সাংকেতিক চিহ্ন	অ্যাটমিক নাম্বার	অ্যাটমিক ওয়েট
হিলিয়াম	He	2	4·003
হোল্‌মিয়াম	Ho	67	164·94
হ্যাফ্‌নিয়াম	Hf	72	178·60

উপরোক্ত তালিকায় * চিহ্নিত মৌলিক পদার্থগুলোর অ্যাটমিক ওয়েট হচক সংখ্যায় ওইগুলোর সবচেয়ে স্থায়ী আইসোটোপের † মাস্‌-নাম্বার বা আইসোটোপিক ওয়েট † প্রকাশিত হয়েছে।

রেডিও-অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট

[নাম ও অ্যাটমিক নাম্বার]

সামান্য রেডিও-অ্যাক্টিভ : রুবিডিয়াম 37, সিজিয়াম 55, বিস্‌মাথ 83 ; বিশেষভাবে রেডিও-অ্যাক্টিভ : টেক্‌নেসিয়াম 43, পোলোনিয়াম 84, অ্যাস্টেটাইন 85, র‍্যাডন 86, ফ্রান্সিয়াম 87, রেডিয়াম 88, অ্যাক্টিনিয়াম 89, থোরিয়াম 90, প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম 91, ইউরেনিয়াম 92, * নেপ্‌চুনিয়াম 93, প্লুটোনিয়াম 94, অ্যামিরিসিয়াম 95, কুরিয়াম 96, বার্কেলিয়াম 97, ক্যালি-ফোর্নিয়াম 98.

* উপরোক্ত তালিকায় ইউরেনিয়ামের পরবর্তী এলিমেণ্ট ছয়টিকে বলে ট্রান্সইউরেনিক † এলিমেণ্ট।

রেয়ার-আর্থ এলিমেন্ট

[নাম ও অ্যাটমিক নাম্বার]

স্ক্যাণ্ডিয়াম 21, ইট্রিয়াম 39, ল্যান্থেনাম 57, সিরিয়াম 58, প্রাসিওডিমিয়াম 59, নিওডিমিয়াম 60, প্রোমেথিয়াম 61, স্যামারিয়াম 62, ইউরোপিয়াম 63, গ্যাডোলিনিয়াম 64, টার্বিয়াম 65, ডিস্প্রোসিয়াম 66, হোল্‌মিয়াম 67, আর্বিয়াম 68, থুলিয়াম 69, ইটাব্রিয়াম 70, লুটিসিয়াম 71.

বিভিন্ন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও গতি

আলোক তরঙ্গ ঃ

দৃশ্য আলোকের (লাইট ↑) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা মোটামুটি হিসেবে (বেগুনি বর্ণের) 4×10^{-8} সেন্টিমিটার থেকে (লাল বর্ণের) 8×10^{-8} সেন্টিমিটার ধরা যেতে পারে। সাদা আলোকের সংগঠক প্রধান সাতটা বর্ণের (স্পক্ট্রাম ↑, স্পেক্ট্রাম কালার ↑) বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরস্পর পার্থক্য সুনির্দিষ্টরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বর্ণের আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য-সীমা নিয়ে দেওয়া হোল :

অলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অ্যাঙস্ট্রম এককে (A. U.) পরিমিত হয়; 1 A. U. $= 10^{-8}$ অর্থাৎ ·00000001 সেন্টিমিটার।

লালবর্ণের রশ্মির—7800 A. U. থেকে 6400 A. U.
কমলা ,, ,, —6400 A. U. ,, 5900 A. U.
হলুদে ,, ,, —5900 A. U. ,, 5500 A. U.
সবুজ ,, ,, —5500 A. U. ,, 4900 A. U.
নীল ,, ,, —4900 A. U. ,, 4600 A. U.
গাঢ়নীল ,, —4600 A. U. ,, 4300 A. U.
বেগুনি ,, —4300 A. U. ,, 3800 A. U.

[7800 A U. $= 7800 \times 10^{-8}$ সেন্টিমিটার
$= 7800 \times$ ·00000001 সেন্টিমিটার
$=$ ·000078 সেন্টিমিটার]

আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় $2{\cdot}9978 \times 10^{10}$ সেন্টিমিটার $=$ 186, 326 মাইল। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-প্রবাহের ফলে আলোক, বেতার, এক্স-রশ্মি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পৃথক ; কিন্তু গতি সকলেরই মোটামুটি সমান।

এক্স-রশ্মি ঃ

এক্স-রশ্মির তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও সুনির্দিষ্ট নয়; একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যসীমার মধ্যবর্তী বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সকল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গই এক্সরশ্মি নামে অভিহিত। মোটামুটি হিসেবে এই সীমা হোল 10^{-6} সেন্টিমিটার থেকে 10^{-9} সেন্টিমিটার; এর মধ্যবর্তী সকল দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোই এক্সরশ্মি।

গামারশ্মি ঃ

গামারশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক্সরশ্মি অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর; প্রায় 10^{-8} সেন্টিমিটার থেকে 10^{-10} সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগুলো গামারশ্মি।

রেডিও তরঙ্গ ঃ

রেডিও বা বেতার-তরঙ্গ সুবৃহৎ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহের ফলে সৃষ্টি হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় এক সেন্টিমিটার থেকে 10,000 মিটার পর্য্যন্ত হতে পারে। সাধারণতঃ সামান্য দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গগুলো র‍্যাডার যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। রেডিও স্টেশন থেকে সাধারণতঃ 10 মিটার থেকে 10,000 মিটার পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন রেডিও-তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এর মধ্যে 10 থেকে 100 মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গগুলোকে বলে **শর্ট ওয়েভ**, 100 থেকে 1000 মিটারের গুলোকে বলে **মিডিয়াম ওয়েভ** এবং 1000 থেকে 10,000 মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোকে বলে **লঙ্ ওয়েভ**।

শব্দ তরঙ্গ ঃ

বিভিন্ন ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক † অর্থাৎ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ (যেমন আলোক, বেতার, গামারশ্মি প্রভৃতি) সম্পূর্ণ শূন্যস্থানে, অর্থাৎ কোন বস্তুমাধ্যম ব্যতীতই

প্রবাহিত হতে পারে। শব্দতরঙ্গ কিন্তু কোনরূপ বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিচালিত হতে পারে না ; কোন বস্তুর দ্রুত কম্পনের ফলে (সাউণ্ড ↑) সংলগ্ন মাধ্যম পদার্থে লঙ্গিটিউডিন্যাল আকারের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর কম্পনসংখ্যা (ফ্রিকোয়েন্সি) সেকেণ্ডে 30 থেকে 3000 পর্য্যন্ত হলে উৎপন্ন শব্দ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় (অডিবিলিটি-লিমিট ↑)। শব্দের গতি মাধ্যম পদার্থের বিভিন্নতা ও তাপ-বৈষম্যের ফলে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপ ও চাপে (এন. টি. পি. ↑) বায়ুমণ্ডলে শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফুট বা 331·7 মিটার গতিতে প্রবাহিত হয় ; = প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 760 মাইল।

বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দতরঙ্গের গতি

(প্রতি সেকেণ্ডে মিটার এককে)

গ্যাসীয় মাধ্যম (এন. টি. পি.)		কঠিন ও তরল মাধ্যম (20° সেন্টিগ্রেড)	
বায়ু	331·7	জল	·1457
কার্বন ডাইঅক্সাইড	259	অ্যালকোহল	·1210
হাইড্রোজেন	1262	অ্যালুমিনিয়াম	5100
অক্সিজেন	316	আয়রন	5000
কোল গ্যাস	490	প্ল্যাটিনাম	2700

গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ও স্পেসিফিক হিট

পদার্থের নাম	সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (1 নর্ম্যাল অ্যাটমস্ফিয়ার = 1·01325 বার)		স্পেসিফিক হিট (গ্র্যাম/সেন্টিমিটার/ক্যালোরি)	
	গলনাঙ্ক (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	স্ফুটনাঙ্ক (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	উষ্ণতার-স্তর (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	
অ্যালুমিনিয়াম	657	1800	17·1	·217
আয়রন	1530	2450	18·1	·113
আয়োডিন	113	184·4	9·98	·054
কার্বন	3500	4200	11	·160
কপার	1083	2310	15·1	·093
ক্যালসিয়াম	810	1170	·2	·149
গোল্ড	1063	2530	17·1	·031
জিঙ্ক	418	918	20	·0924
টিন	232	2270	20	·054
টাংস্টেন	3360	3700	20·1	·034
মার্কারি	− 38·8	356·7	20	·0333
ম্যাগ্নেসিয়াম	651	1120	17·1	·247
লেড	327	1620	20·1	·0305
সিলভার	960	1955	15·1	·056
সোডিয়াম	97·5	877	0	·283
অক্সিজেন	− 219	− 182·9	− 200	·35
আর্গন	− 188	− 186	—	—
নাইট্রোজেন	− 210·5	− 195·7	− 208	·028
নিয়ন	− 248·67	− 245·9	—	—
হাইড্রোজেন	− 259	− 252·7	− 253	6·0
প্ল্যাটিনাম	1773	3910	15·1	·0322
পটাসিয়াম	62·5	760	·56	·19

কয়েকটা মৌলিক পদার্থের ডেন্সিটি

(কঠিন ও তরল পদার্থ)

নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থগুলোর ডেন্সিটি মোটামুটি হিসেবে সাধারণ উষ্ণতায় (17°—23° সেন্টিগ্রেড) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে গ্র্যাম এককে প্রদত্ত হয়েছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ উষ্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে পদার্থের ডেন্সিটির কিছু কিছু তারতম্য ঘটে থাকে।

পদার্থ	ডেন্সিটি গ্র্যাম / সি, সি	পদার্থ	ডেন্সিটি গ্র্যাম / সি, সি
অ্যালুমিনিয়াম	2·70	টিন	7·29
অ্যান্টিমনি	6·62	টাংস্টেন	19·30
আর্সেনিক	5·73	ম্যাগ্নেসিয়াম	1·74
আয়োডিন	4·95	ম্যাঙ্গানিজ	7·39
আয়রন (বিশুদ্ধ)	7·86	মার্কারি	13·56 / 15°
কপার	8·93	নিকেল	8·90
ক্যালসিয়াম	1·55 / 29°	নাইট্রোজেন (তরল)	·79/ – 196°
ক্রোমিয়াম	7·10		
ক্লোরিন (তরল)	2·49 / 0°	লেড	11·37
গোল্ড	19·32	সিলভার	10·50
জিঙ্ক	7·10	সিলিকন	2·30
পটাসিয়াম	·86	সোডিয়াম	·97
প্ল্যাটিনাম	21·50	হাইড্রোজেন (তরল)	·07 (স্ফুটনাঙ্কে)
অক্সিজেন (তরল)	1·27/ – 235°		

কয়েকটা সাধারণ পদার্থের ডেন্সিটি

পদার্থ	ডেন্সিটি	পদার্থ	ডেন্সিটি
গ্লিসারিন	1·26	আয়রন, কাস্ট	7·1—7·7
গ্ল্যাস (সাধারণ)	2·4—2·6	,, , রট	7·8—7·9
টার্পেন্টাইন	·87	স্টিল	7·7—7·9
জল (0°)	·99987	পেট্রল	·68—·72
,, (4°)	1·00000	বরফ (0°)	·9168
,, (20°)	·99823		

কয়েকটা গ্যাসীয় পদার্থের ডেন্সিটি

প্রতি লিটারে (1000·028 সি. সি.) গ্র্যাম এককে ডেন্সিটি দেওয়া হোল ; — উষ্ণতা 0° সেন্টিগ্রেড, চাপ 760 মিলিমিটার, অর্থাৎ এন. টি. পি. অবস্থায়।

গ্যাস	ডেন্সিটি (গ্রাম/লিটার)	গ্যাস	ডেন্সিটি (গ্রাম/লিটার)
বায়ু	1·2928	নাইট্রোজেন, N_2	1·2507
অ্যামোনিয়া, NH_3	0·7708	মিথেন, CH_4	0·7167
অক্সিজেন, O_2	1·4290	হাইড্রোজেন, H_2	0·0899
আর্গন, A	1·7809	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, HCl	1·6390
কার্বন ডাই-অক্সাইড, CO_2	1·9968	হাইড্রোজেন সালফাইড, H_2S	1·5390
ক্লোরিন, Cl_2	3·2200	হিলিয়াম, He	0·1785
ক্রিপ্টন, Kr	3·6800	ব্রোমিন, Br_2	7·1390
জেনন, Xe	5·8500	ফ্লোরিন, F_2	1·6900
নিয়ন, Ne	0·9000		

বিভিন্ন উষ্ণতায় জল ও পারদের ডেন্সিটির তুলনা

উষ্ণতা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	জল (গ্রাম / সি. সি.)	পারদ (গ্রাম / সি. সি.)
0	·99987	13·5951
4	1·00000	—
10	·99970	13·5704
50	·98804	13·4725
100	·95835	13·3518

ফ্রিজিং মিক্‌চার

নির্দিষ্ট অনুপাতে কোন কোন পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে উষ্ণতা সবিশেষ হ্রাস পায়। এরূপ মিশ্রণকে বলে ফ্রিজিং মিক্‌চার; বাংলায় বলা যায় হিমায়ী মিশ্রণ। এরূপ কয়েকটা মিশ্রণের তালিকা নিয়ে দেওয়া হোল; এর প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভে মিশ্রণীয় পদার্থের নাম ও অনুপাত, তৃতীয় স্তম্ভে পদার্থগুলোর প্রাথমিক উষ্ণতা এবং চতুর্থ স্তম্ভে মিশ্রণের পরে উদ্ভূত নিম্নতাপ-সূচক উষ্ণতা ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলে দেখান হয়েছে :

পদার্থ ও অনুপাত	পদার্থ ও অনুপাত	প্রাথমিক উষ্ণতা	মিশ্রণের পরবর্তী উষ্ণতা
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl, 30	জল, H_2O, 100	13·3	−5·1
পটাসিয়াম আয়োডাইড KI, 140	জল, H_2O, 100	10·3	−11·7
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড NH_4Cl, 25	চূর্ণিত বরফ 100	−1	−15·4
খাদ্য লবণ, NaCl, 33	,, 1:0	−1	−21·3
জলীয় সালফিউরিক অ্যাসিড, $H_2SO_4 + H_2O$ (66·1 % H_2SO_4) 1	,, 4·32	−1	−25·0
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও জল, $CaCl_2 + 6H_2O$, 1	,, ·61	0	−39·0
,, ,, 1	,, ·70	0	−54·0
,, ,, 1	,, ·81	0	−40·0
অ্যালকোহল, $CH_3.CH_2OH$,	কার্বনডাইঅক্সাইড, CO_2 (কঠিন)	—	−72·0
ক্লোরোফর্ম, $CHCl_3$,	,, ,,	—	−77·0
ইথার, $(C_2H_5)_2O$,	,, ,,	—	−77·0
সালফার ডাইঅক্সাইড, SO_2 (তরল)	,, ,,	—	−82·0

সৌর পরিবার সম্পর্কীয় বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়

1 Km (কিলোমিটার) = 1093·611 গজ

1 Kgm (কিলোগ্র্যাম) = 2·204622 পাউণ্ড

গ্রহের নাম	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (10^6Km)	নিরক্ষীয় ব্যাস (Km)	সূর্য পরিক্রমণ কাল (দিন)	মাস্ (ওজন) (10^{24} Kmg)	নিজ কক্ষে আবর্তন কাল	উপগ্রহ সংখ্যা
মার্কারি	57·85	5000	87·97	0·312	—	0
ভেনাস	108·11	12400	224·70	4·9	30 ঘণ্টা	0
আর্থ	149·46	12756·6	365·26	6·0	23ঘ. 56মি.	1
মার্স	227·7	6783	686·98 (1 ব. 322 দি.)	0·65	24ঘ. 37মি. 23 সে.	2
জুপিটার	777·6	142600	11 ব. 314 দি.	1901·4	9ঘ. 50মি.	9
স্যাটার্ণ	1426·0	119000	29 ব. 167 দি.	568·8	10ঘ. 14মি.	10 এবং 3 বলয়
ইউরেনাস	2868·3	51500	84ব. 5দি.	87·7	10ঘ. 45মি.	4
নেপচুন	4494·3	49900	164 ব. ২৭৪ দি.	103	15ঘ. 48মি.	1
সূর্য	—	1·392 × 10^6	—	1·984 × 10^{30}	25 দিন 9·1 ঘ.	—
চন্দ্র	—	3478	—	7·36 × 10^{22}	27দি. 7ঘ. 43মি.11সে. (চান্দ্র মাস)	—

বায়ুমণ্ডলের উপাদান

সমুদ্রতলের উচ্চতায় (45° ল্যাটিটিউড) অবস্থিত বায়ুমণ্ডলীয় স্তরে ওজনের শতকরা হিসেবে সংমিশ্রিত বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান :

	% ওজন		% ওজন
নাইট্রোজেন—	75·5	নিয়ন—	$8{\cdot}4 \times 10^{-4}$
অক্সিজেন—	23·2	জেনন—	3×10^{-6}
আর্গন—	0·92	হিলিয়াম—	7×10^{-5}
কার্বন ডাইঅক্সাইড—	0·3	হাইড্রোজেন	7×10^{-6}
ক্রিপ্‌টন—	14×10^{-6}		

কয়েকটি ধ্রুবক রাশি

π (পাই) $= 3{\cdot}1415927$

π^2 $= 9{\cdot}8696044$

$1/\pi$ $= 0{\cdot}3183099$

1 রেডিয়ান = 57°·29578 (ডিগ্রি)

1° (ডিগ্রি) = 0·01745329 রেডিয়ান

M (মিউ) মাইক্রন $= 10^{-3}$ মিলিমিটার

1 A. U (অ্যাঙ্গস্ট্রম ইউনিট) $= 10^{-8}$ সেন্টিমিটার

বিভিন্ন একক পরিবর্তন

দৈর্ঘ্য :

1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার

1 গজ = 0·914399 মিটার

1 মাইল = 1·6093 কিলোমিটার

1 মিটার = 10 ডেসিমিটার (dm.)
= 100 সেন্টিমিটার (cm.)
= 1000 মিলিমিটার (mm.)
= 39·37 ইঞ্চি = 1·094 গজ

10 মিটার (m) =1 ডেকামিটার (Dm.)
100 „ „ =1 হেক্টোমিটার (Hm.)
1000 „ „ =1 কিলোমিটার (Km.)
=0·6214 মাইল

ওজন :

4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 1 ঘন সেন্টিমিটার (c.c.) বিশুদ্ধ জলের ওজন ধরা হয়েছে 1 গ্রাম :

1 গ্রাম=0·035 আউন্স
1000 গ্রাম=1 কিলোগ্র্যাম
=2·205 পাউণ্ড

1 গ্রেন =0·064799 গ্র্যাম (gm)
1 আউন্স =28·35 গ্র্যাম
1 পাউণ্ড =0·453592 কিলোগ্র্যাম
1 টন =1016 কিলোগ্র্যাম (Kgm.)

আয়তন :

4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় 760 মিলিমিটার বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 1 কিলোগ্র্যাম বিশুদ্ধ জলের আয়তন 1 লিটার :

1 লিটার =1000·027 ঘন সেন্টিমিটার (c. c.)
=1·000027 ঘন ডেসিমিটার (Cu. dm.)
=33·81 আউন্স (ফ্লুইড) =1·816 পাইন্ট
1 গ্যালন = 4·545963 লিটার
1 ঘন ইঞ্চি = 16·387 ঘন সেন্টিমিটার (c. c.)
1 মিলিলিটার = 0·999972 ঘন সেন্টিমিটার

উষ্ণতা :

উষ্ণতা পরিমাপের সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট স্কেলে জলের হিমাঙ্ক যথাক্রমে 0°C ও 32°F ; স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 100°C ও 212°F ; সুতরাং এই সমান তাপীয় ব্যবধান সেন্টিগ্রেড স্কেলে 100° এবং ফারেনহাইট স্কেলে 180° হবে। কাজেই 1° ফারেনহাইট = 100/180 অর্থাৎ 5/9 সেন্টিগ্রেড

ডিগ্রি। এভাবে ওর যে কোন একক থেকে অপর এককে নিম্নলিখিত সূত্রানুসারে সহজেই উষ্ণতার মান পরিবর্তন করা যেতে পারে :

$$F^\circ = 9/5\,(C^\circ) + 32$$

$$C^\circ = 5/9\,(F^\circ - 32)$$

এরূপ হিসেবে :

°C	°F	°C	°F
0	32	20	68
5	41	25	77
8	46·4	30	86
10	50	50	122
15	59	100	212

উষ্ণতা পরিমাপের একক হিসেবে সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহাইট এককই সমধিক প্রচলিত ; রুমার স্কেলের ব্যবহার তেমন নেই।

বিখ্যাত উদ্ভাবন ও উদ্ভাবক

উদ্ভাবিত জিনিস	কাল	উদ্ভাবকের নাম
অটোমেটিক টেলিফোন	1889	স্ট্রোজার
আর্ক ল্যাম্প	1808	ডেভি
অ্যান্টিসেপ্টিক সার্জারি	1865	লিস্টার
ইলেক্ট্রিক ফ্যান	1886	হুইলার
" ফার্নেস	1877	সিমেন্স
" লাইট	1879	এডিসন
ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ	1896	মার্কোনি
" টেলিফোন	1902	ফেসেণ্ডেন
এরোপ্লেন	1903	রাইট ব্রা

উদ্ভাবিত জিনিস		কাল		উদ্ভাবকের নাম
এক্স-রে	...	1895	...	রণ্টগেন
কালার ফটোগ্রাফি	...	1892	...	লিপ্‌ম্যান
গ্যাস ম্যাণ্টেল	...	1885	...	ওয়েল্‌স ব্যাক
জাইরোকম্পাস	...	1906	...	আন্‌সকাট্‌জ
জাইরোস্কোপ	...	1817	...	বোনেন্‌বার্জার
টকি পিক্‌চার	...	1926	...	কেজ
টাইপ-রাইটার	...	1867	...	শোল্‌স
টেলিগ্রাফ	...	1837	...	মোর্‌স
টেলিভিসন	...	1927	...	বেয়ার্ড
টেলিফোন	...	1876	...	বেল
ডায়নামো	...	1831	...	ফ্যারাডে
ডিনামাইট	...	1867	...	নোবেল
ডিজেল ইঞ্জিন	...	1896	...	ডিজেল
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট	...	1827	...	অ্যাস্‌পডিন
পেনিসিলিন	...	1929	...	ফ্লেমিং
ফোনোগ্রাফ (গ্রামোফোন)	...	1877	...	এডিসন
ফটোগ্রাফি	...	1827	...	নিপ্‌স
ফটোগ্রাফিক ফিল্ম	...	1887	...	গুড্‌উইন ইস্টম্যান
বাইসাইকল	...	1855	...	ল্যালিমেন
বুন্‌সেন বার্ণার	...	1855	...	বুন্‌সেন
বিসিমার প্রোসেস	...	1855	...	বিসিমার
মোসন পিক্‌চার	...	1893	...	এডিসন
" " প্রোজেক্টর	...	1894	...	জেন্‌কিন্স
ম্যাচ (দেশলাই)	...	1827	...	ওয়েকার
		1829	...	হোলডেন
রেডিও	...	1896	...	মার্কোনি
রেয়ন	...	1855	...	অ্যাডেমার্স
রোটারি প্রিন্টিং	...	1847	...	হো
লাইনো টাইপ	...	1883	...	ম্যাগেন্থ্যালার

উদ্ভাবিত বিষয়		কাল		উদ্ভাবকের নাম
সায়েনাইড প্রোসেস	...	1890	...	ম্যাক্ আর্থার
সেলুলয়েড	...	1870	...	হায়াট
সেফ্‌টি ল্যাম্প	...	1815	...	ডেভি
সেফ্‌টি ম্যাচ	...	1844	...	পাস্‌ক
সিউইং মেসিন	...	1845	...	হাগ্নোই
স্টিম ইঞ্জিন	...	1769	...	ওয়াট
" টার্বাইন	...	1882	...	ডি. লাভাল
স্ট্যাথিস্কোপ	...	1819	...	ল্যানেক
হাইড্রোপ্লেন	...	1911	...	কার্টিস
হাইড্রোফোবিয়া ইন্‌জেক্‌সন	...	1885	...	পাস্তুর
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	...	1944	...	ওয়াক্সম্যান

নোবেল পুরস্কার

সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল 1896 খৃষ্টাব্দের 10 ডিসেম্বর মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত এক কোটি 75 লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি উইল করে একটি ন্যাস-রক্ষক সমিতির (বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ) হস্তে অর্পণ করে যান। উইলের বিধান অনুসারে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক সুদ থেকে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা (Physics) রসায়নবিদ্যা (Chemistry), চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medicines), সাহিত্য (Literature) ও শান্তি (Peace) এই পাঁচটি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ও কৃতিত্বের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। জগতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী নোবেলের এই দান অতুলনীয়; নোবেল পুরস্কার লাভ করা জগতের বিভিন্ন দেশ ও জাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক-স্বরূপ। নোবেলের প্রদত্ত সম্পত্তির বার্ষিক সুদ হয় প্রায় সওয়া ছয় লক্ষ টাকা—প্রতি বিষয়ে প্রতি বছরে প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের মূল্য মোটামুটি 1,25,000 টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানিগণের নাম, দেশের নাম, প্রাপ্তির বছর ধারাবাহিকভাবে দিয়ে দেওয়া হোল :—

পদার্থবিদ্যা

1901	উইল্‌হেল্‌ম কনার্ড রণ্টগেন	—	জার্মানি
1902	হেন্‌রিক আণ্টুন লরেঞ্জ ও পিটার জিম্যান	—	হল্যাণ্ড
1903	এণ্টনি হেন্‌রি ব্যাকেরেল, পিয়ের কুরি ও মেরী কুরি	—	ফ্রান্স
1904	লর্ড জন উইলিয়াম স্ট্রাট র‍্যালে	—	ইংল্যাণ্ড
1905	ফিলিপ লেনার্ড	—	জার্মানি
1906	জোসেফ জন টম্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড

1907	অ্যালবার্ট আব্রাহাম মিচেল্‌সন	—	আমেরিকা
1908	গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান	—	ফ্রান্স
1909	গুগ্লিয়েমো মার্কনি ও	—	ইটালি
	কার্ল ফার্ডিন্যাণ্ড ব্রন	—	জার্মানি
1910	জোহান্স ডিডেরিক ভ্যান্‌ডার ওয়াল্‌স	—	হল্যাণ্ড
1911	উইল্‌হেল্‌ম উইয়েন	—	জার্মানি
1912	গুস্তফ নিল্‌স ডালেন	—	সুইডেন
1913	হিক ক্যামার্লিং ওনেস	—	হল্যাণ্ড
1914	ম্যাক্স ভন ল'	—	জার্মানি
1915	স্যার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ ও উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগ	—	ইংল্যাণ্ড
1916	পুরস্কার স্থগিত		
1917	চার্লস গ্লোভার বার্কলা	—	ইংল্যাণ্ড
1918	ম্যাক্স ভন প্ল্যাঙ্ক	—	জার্মানি
1919	জোহান্স স্টার্ক	—	জার্মানি
1920	চার্লস এডুয়ার্ড গুইলাম	—	সুইজারল্যা
1921	অ্যালবার্ট আইন্‌ষ্টাইন	—	জার্মানি
1922	নিল্‌স বোর	—	ডেনমার্ক
1923	রবার্ট অ্যাণ্ড্রুস মিলিকান	—	আমেরিকা
1924	কার্ল ম্যানে জর্জ সিগ্রন	—	সুইডেন
1925	জেম্‌স ফ্র্যাঙ্ক ও গুস্তভ হার্টজ	—	জার্মানি
1926	জিন ব্যাপ্টিস্ট পেরিন	—	ফ্রান্স
1927	আর্থার হোলি কম্পটন ও	—	আমেরিকা
	চার্লস টমসন রিজ উইলসন	—	ইংল্যাণ্ড
1928	ওয়েলস্‌ উইলিয়াম্‌স রিচার্ডসন	—	ইংল্যাণ্ড

1929	লুই ভিক্টর ডি ব্রগিল	—	ফ্রান্স
1930	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন	—	ভারতবর্ষ
1931	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1932	ওয়ার্নার হিসেনবার্গ	—	জার্মানি
1933	পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডির‍্যাক ও	—	ইংল্যাণ্ড
	আরউইন স্রুডিঙ্গার	—	অস্ট্রিয়া
1934	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1935	জেম্‌স চ্যাড্‌উইক	—	ইংল্যাণ্ড
1936	কার্ল ডেভিড অ্যাণ্ডারসন ও	—	আমেরিকা
	ভিক্টর ফ্র্যাঞ্জ হেস	—	অস্ট্রিয়া
1937	ক্লিন্সন জোসেফ ডেভিডসন ও	—	আমেরিকা
	জর্জ পেজেট টম্‌সন	—	ইংল্যাণ্ড
1938	অ্যান্‌রিকো ফার্মি	—	ইটালি
1939	আর্নেস্ট অর্ল্যাণ্ডো লরেন্স	—	আমেরিকা
1940	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1941	" "	—	—
1942	" "	—	—
1943	অটো স্টার্ন	—	আমেরিকা
1944	ইসাডোর আইজাক রোবি	—	আমেরিকা
1945	উল্‌ফ্‌গ্যাং পলি	—	সুইজারল্যাণ্ড
1946	পার্সি ব্রিজম্যান	—	আমেরিকা
1947	স্যার এডোয়ার্ড অ্যাপ্‌লটন	—	ইংল্যাণ্ড
1948	প্যাট্রিক মনার্ড স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট	—	ইংল্যাণ্ড
1949	হিদেকি য়ুকাওয়া	—	জাপান
1950	সিসিল পাওয়েল	—	ইংল্যাণ্ড

1951	স্যার জন কক্রফ্‌ট ও	—	ইংল্যাণ্ড
	ই, টি, উল্‌টন	—	আয়ারল্যাণ্ড
1952	এড্‌ওয়ার্ড পার্সেল ও	—	আমেরিকা
	ফেলিক্‌স ব্লচ	—	আমেরিকা

রসায়ন বিদ্যা

1901	জ্যাকোবাস হেণ্ডি ক ভ্যাণ্ট হফ	—	হল্যাণ্ড
1902	অ্যামিল ফিসার	—	জার্মানি
1903	স্যণ্টে অগাষ্ট অ্যাবেনিয়াস	—	সুইডেন
1904	স্যার উইলিয়াম র‍্যাম্‌সে	—	ইংল্যাণ্ড
1905	অ্যাডল্‌ফ ভন বেয়ার	—	জার্মানি
1906	হেন্‌রি ময়সাঁ	—	ফ্রান্স
1907	অ্যাডুয়ার্ড বুচ্‌নার	—	জার্মানি
1908	স্যার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড	—	ইংল্যাণ্ড
1909	উইলহেলম্‌ অষ্টওয়াল্ড	—	জার্মানি
1910	অটো ওয়ালাচ	—	জার্মানি
1911	মেরী স্লোডোস্কা কুরি	—	ফ্রান্স
1912	ভিক্টর গ্রিগ্‌নার্ড ও পল স্যাবাষ্টিয়ের	—	ফ্রান্স
1913	অ্যালফ্রেড ওয়ার্নার	—	সুইজারল্যাণ্ড
1914	থিয়োডোর উইলিয়াম রিচার্ডস	—	ইংল্যাণ্ড
1915	রিচার্ড উইলষ্ট্যাটার	—	জার্মানি
1916, 1917	পুরস্কার স্থগিত	—	—

1918	ফ্রিট্জ হ্যাবার	—	জার্মানি
1919	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1920	ওয়াল্টার নার্নষ্ট	—	জার্মানি
1921	ফ্রেডেরিক সডি	—	ইংল্যাণ্ড
1922	ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাষ্টন	—	ইংল্যাণ্ড
1923	ফ্রিট্জ প্রেগ্ল	—	অষ্ট্রিয়া
1924	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1925	রিচার্ড সিগ্মণ্ড	—	জার্মানি
1926	থিয়োডোর ভেড্বার্জ	—	সুইডেন
1927	হেন্‌রিচ অটো উইল্যাণ্ড	—	জার্মানি
1928	অ্যাডল্‌ফ উইণ্ডাস	—	জার্মানি
1929	স্থার আর্থার হার্ডে ও	—	জার্মানি
	হান্স ভন উইলার চেপ্লিন	—	সুইডেন
1930	হান্স ফিসার	—	জার্মানি
1931	কার্ল বস্ ও ফ্রেড্রিক গুস্তভ বার্গ্ইস	—	জার্মানি
1932	আর্ভিং ল্যাং মুর	—	আমেরিকা
1933	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1934	হ্যারল্ড ক্লেটন ইউরি	—	আমেরিকা
1935	ফ্রেড্রিক জোলিও কুরি ও আইরিন জোলিও কুরি	—	ফ্রান্স
1936	পিটার জোসেফ উইল্‌হেল্‌ম ডেরি	—	হল্যাণ্ড
1937	ওয়াল্টার নর্ম্যান হাওয়ার্থ ও	—	ইংল্যাণ্ড
	পল কারের	—	সুইজারল্যাণ্ড
1938	রিচার্ড কুন	—	জার্মানি

1939	অ্যাডল্ফ বুটেন্যাণ্ডট্ ও	—	জার্মানি
	লিওপোল্ড রুজিকা	—	সুইজারল্যাণ্ড
1940—1942	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1943	জর্জ হেভেসি	—	হাঙ্গেরি
1944	অটো হান	—	জার্মানি
1945	আর্তুরি বির্টাস্থান	—	ফিন্ল্যাণ্ড
1946	ওয়েণ্ডেল ষ্ট্যান্লি, জন নর্থরাপ ও জেম্স সামার	—	আমেরিকা
1947	স্যার রবার্ট রবিন্সন	—	ইংল্যাণ্ড
1948	আর্নে টেলিয়ুস	—	সুইডেন
1949	ডব্লিউ, এফ, জিয়াক	—	আমেরিকা
1950	অটো ডিয়েল্স ও কেল্ট অ্যাডলার	—	জার্মানি
1951	অ্যাডুইন ম্যাক্মিলান ও গ্লেন সিবোর্জ্জ	—	আমেরিকা
1952	আর্চার জন পার্টনার মেরিন ও রিচার্ড লরেন্স মিলিংটন	—	ইংল্যাণ্ড

চিকিৎসা বিজ্ঞান

1901	অ্যামিল ভন বেরিং	—	জার্মানি
1902	স্যার রোনাল্ড রস	—	ইংল্যাণ্ড
1903	নিলস্ রাইবার্জ ফিন্সেন	—	ডেনমার্ক
1904	আইভ্যান পেট্রোভিচ্ পাভ্লভ	—	রাশিয়া
1905	রবার্ট কক্	—	জার্মানি
1906	ক্যামিলো গল্গি ও	—	ইটালি
	র‍্যামোনি কাজাল	—	স্পেন

1907	চার্লস লুই অ্যালফোস´ ল্যাভেরন	—	ফ্রান্স
1908	পল আর্লিচ ও	—	জার্মানি
	অ্যালি মেচ্‌নিকফ	—	রাশিয়া
1909	অ্যামিল থিয়োডোর কোচের	—	সুইজারল্যাণ্ড
1910	অ্যাল্‌ফ্রেড কসেল	—	জার্মানি
1911	অ্যাল্‌ভার গলষ্ট্র্যাণ্ড	—	সুইডেন
1912	অ্যালেকিস ক্যারেন	—	আমেরিকা
1913	চার্লস বরার্ট রিচেট	—	ফ্রান্স
1914	রবার্ট ব্যারেনি	—	অষ্ট্রিয়া
1915—1918	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1219	জুলেস বোর্ডেট	—	বেলজিয়াম
1920	অগাষ্ট ক্রোঘ	—	ডেনমার্ক
1921	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1922	আর্চিবল্ড ভিভিয়ান হিল ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অটো মেয়ার হফ	—	জার্মানি
1923	ফ্রেড্যারিক গ্র্যাণ্ট ব্যান্টিং ও জন্‌ জেম্‌স রিচার্ড ম্যাক্‌লিয়ড	—	ক্যানাডা
1924	উইল্‌হেল্‌ম আয়েন্থোডেন	—	হল্যাণ্ড
1925	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1926	জোহান্স অ্যাণ্ড্রিস গ্রিব	—	ডেনমার্ক
1927	জুলিয়াস ওয়াগ্‌নার জোরেগ	—	অষ্ট্রিয়া
1928	চার্লস জুলেস হেন্‌রি নিকোল	—	ফ্রান্স
1929	ক্রিশ্চিয়ান আইক্‌ম্যান ও	—	হল্যাণ্ড
	স্যার এফ, জি, হপ্‌কিন্স	—	ইংল্যাণ্ড
1930	কার্ল ল্যাণ্ডষ্টিনার	—	আমেরিকা
1931	অটো হেন্‌রিচ ওয়ারবার্গ	—	জার্মানি

1932	অ্যাড্সার ডগ্লাস ফ্যাড্রিয়ান ও স্যার চার্লস স্কট শেরিংটন	—	ইংল্যাণ্ড
1933	টমাস হার্ণ্ট মর্গ্যান	—	আমেরিকা
1934	জর্জ রিচার্ডস মাউন্ট, উইলিয়াম প্যারি মর্ফি ও জর্জ হোট হুইপ্ল	—	আমেরিকা
1935	হ্যান্স স্পেম্যান	—	জার্মানি
1936	স্যার হেনরি হ্যালেট ডেল ও	—	ইংল্যাণ্ড
	অটো লোয়ি	—	অষ্ট্রিয়া
1937	অ্যালবার্ট ভন্ সেন্টিওর্গি স্যাগিরাপোল্ট	—	হাঙ্গেরি
1938	কর্নিল হেম্যান্স	—	বেলজিয়াম
1939	জেরাড ডোম্যাক	—	জার্মানি
1940—1942	পুরস্কার স্থগিত	—	—
1943	এডওয়ার্ড অ্যাডেলনার্ট ডোইজি	—	আমেরিকা
	ও হেন্রিক ড্যাম	—	ডেনমার্ক
1944	জোসেফ আর্ল্যাঙ্গার ও হার্বার্ট স্পেন্সার গ্যাসার	—	আমেরিকা
1945	স্যার আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং, স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও আর্নেস্ট চেইন	—	ইংল্যাণ্ড
1946	হার্ম্যান মুলার	—	আমেরিকা
1947	কার্ল কোরি ও গার্টি কোরি	—	চেকোস্লোভাকিয়া
	বার্নাডো অ্যালবার্টো হাউসে	—	ব্রাজিল
1948	পল মুলার	—	সুইজারল্যাণ্ড
1949	রুডল্ফ হেস ও	—	সুইজারল্যাণ্ড
	অ্যাণ্টোনিও এগার মোনিজ	—	পর্তুগাল

1950 ফিলিপ হেন্‌চ ও এড্‌ওয়ার্ড কেণ্ডলি — আমেরিকা
এড্‌ওয়ার্ড তাডিউজ রিচ্‌ষ্টেন — সুইজারল্যাণ্ড
1951 ম্যাক্স থিলার — আমেরিকা
1952 সেলম্যান. এ. ওয়াক্সম্যান — আমেরিকা

1952 পর্যন্ত কোন দেশের কতজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন :

দেশ	পদার্থ বিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা বিজ্ঞান	দেশ	পদার্থ বিদ্যা	রসায়ন	চিকিৎসা বিজ্ঞান
ইংল্যাণ্ড	14	9	9	আয়ারল্যাণ্ড	1	—	—
জার্মানি	11	20	8	ডেনমার্ক	1	—	4
আমেরিকা	11	8	14	হাঙ্গেরি	—	1	1
ফ্রান্স	6	6	3	ফিন্‌ল্যাণ্ড	—	1	—
হল্যাণ্ড	4	2	2	স্পেন	—	—	1
ইটালি	2	—	1	রাশিয়া	—	—	2
সুইডেন	2	4	1	বেলজিয়াম	—	—	2
সুইজারল্যাণ্ড	2	3	4	কানাডা	—	—	2
অস্ট্রিয়া	2	1	3	ব্রেজিল	—	—	1
জাপান	1	—	—	চেকোস্লোভাকিয়া	—	—	2
ভারতবর্ষ	1	—	—	পর্তুগাল	—	—	1

ব্যবহৃত পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা অনেক সময় প্রকৃত অর্থ-বোধক হয় না; কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা প্রতিশব্দ গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, বা নিরর্থক মনে হয়। এজন্যে এ পুস্তকের অনেক স্থানেই ইংরেজী শব্দ বিশেষ তাৎপর্য্য রক্ষা করে বাংলা বানানে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাবে, ক্রমে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দসম্ভার বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে অনেক অসুবিধা দূর করবে বলে আমাদের ধারণা।

যে সব বাংলা পরিভাষা বহু প্রচলিত ও সহজবোধ্য বলে এ পুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছে পাঠকবর্গের সুবিধার জন্যে সেগুলোর একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা মূল ইংরেজী শব্দ সহ নিম্নে দেওয়া হোল :

অক্ষ—axis
অক্ষদণ্ড—axle
অক্ষরেখা—latitude line
অক্ষিপট—retina
অগ্ন্যাশয়—pancreas
অঙ্গার—carbon
অজৈব—inorganic
অণু—molecule
অণুবীক্ষণ—microscope
অতিবেগুনী—ultra-violet
অতিভুজ—hypotenuse
অধঃক্ষেপ—precipitate
অধিবৃত্ত—parabola
অনচ্ছ—opeque
অনন্ত—infinity
অন্ত্র—bowel, intestine
অন্তস্থ—internal (angle)
অনার্দ্র—anhydrous
অনুঘটক—catalyst
অনুঘটন—catalysis
অনুপাত—ratio
অনুপ্রভা—phosphorescence
অনুভূমিক—horizontal
অপেক্ষক—function
অপেরণ—aberration
অবতল—concave
অবলোহিত—infra-red
অবীজপত্রী—acotyledon
অভ্র—mica
অভিকর্ষ—gravity

অভিলম্ব—normal
অভিব্যক্তি—evolution
অয়নান্ত—solistice
অযুগ্ম—odd
আকরিক—mineral
আকর্ষ—tendril
আকর্ষণ—attraction
আঙ্গিক—qualitative
আগ্নেয়—igneous
আণবিক—molecular
আর্দ্রতা—humidity
আত্তীকরণ—assimilation
আনুপাতিক—proportional
আপতিত রশ্মি—incident ray
আপতন কোণ—angle of incidence
আপাত—apparent
আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity
আপেক্ষিকতা বাদ—theory of relativity
আবেশ—induction
আয়তন—area, volume
আয়তক্ষেত্র—rectangle
আয়নায়িত—ionised
আলকাতরা—coal tar
আলেয়া—ignis-fatuus
আসক্তি—affinity
আহিত—charged (electrically)
আহ্নিক—diurnal
ইক্ষু শর্করা—cane sugar
ইন্ধন—fuel
ঈষদচ্ছ—translucent
ঋজুরেখ—rectilinear
ঋণ তড়িৎ—negative electricity
উৎপাদক—factor
উত্তল—convex
উদ্‌বায়ী—volatile
উদ্ভিদ কুল—flora
উদর—abdomen
উদরপদ—gastropod
উদস্থিতি বিদ্যা—hydrostatics
উদাসীন—neutral
উপগ্রহ—satellite
উপক্ষার—alkaloid
উপজাত—by-product
উপচ্ছায়া—penumbra
উপবৃত্ত—ellipse
উপাদান—constituent
উভচর—amphibious
উল্কা—meteor
উল্কাপিণ্ড—meteorite
উষ্ণতা—temperature
একক—unit
এককেন্দ্রীয়—concentric
একতলীয়—coplanar
একবীজপত্রী—monocotyledon
একলিঙ্গ—unisexual
একান্তর—alternate (angle)
কক্ষ—orbit

কণিকা—particle
কর্কটক্রান্তি—summer solistice
কর্কটক্রান্তি বৃত্ত—tropic of cancer
করোটি—skull
কঠিন—solid
কষায়—astringent
কর্পূর—camphor
কলিচুন—quicklime
কাচীয়—vitreous
কিমিয়া—alchemy
কীটাণু—animalcule
কু-মেরু—south pole
কুণ্ডলী—coil
কৃষ্ণসীস—graphite
কেন্দ্র—centre
কেন্দ্রাতিগ—centrifugal
কেন্দ্রাভিগ—centripetal
কৈশিক—capillary
কোরক—bud
ক্বাথ—decoction
ক্ষরণ—discharge, secretion
ক্ষার—alkali
ক্ষারীয়, ক্ষারধর্মী—alkaline
ক্ষারকীয়—basic
ক্ষারক—base
ক্ষমতা—power
খরতা—hardness
খর জল—hard water
খল—mortar
খনিজ—mineral
খনিজ লবণ—rock salt
খমির—ferment
খ-গোল—celestial sphere
খড়ি—chalk
গতি—motion
গতীয়—kinetic, dynamic
গলন—fusion
গলনাঙ্ক—melting point
গন্ধক—sulphur
গড়—average
গুণক—multiplier
গুণনীয়ক—factor
গর্ভকেশর—pistil
গোমেদ—zircon
গ্রহ—planet
গ্রহণ—eclipse
গ্যাসীয়—gaseous
ঘন—cube, cubic, solid
ঘনমূল—cube root
ঘনাঙ্ক—density
ঘনীভূত—condenced
ঘর্ষ-তড়িৎ—frictional electricity
ঘাত—index, power
চান্দ্র—lunar
চাপ (বৃত্ত)—arc
চাপ—pressure
চাপমান যন্ত্র—barometer
চুম্বক—magnet
চৌম্বক, চুম্বকীয়—magnetic
চুল্লী—furnace

চুন—lime
চুনাপাথর—lime stone
চিহ্ন—symbol, sign
ছত্রাক—fungus
ছেদ—intersection, section
ছেদক—secant
ছায়া—shadow
ছায়াপথ—galaxy
জলীয়—aqueous
জ্বলন—ignition
জ্বলনাঙ্ক—ignition point
জোয়ার—flow tide
জনন কোষ—germ cell
জলচর, জলজ—aquatic
জড়—matter
জীববিৎ—biologist
জীব—organism
জীবাণু—bacteria, microbe
জীবাশ্ম—fossil.
জৈব—organic
জ্যা—chord
ঝালাই—soldering
টান—tension, strain
তল—surface, face
তরল—liquid
তরলীভবন—liquifaction
তরঙ্গ—wave
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য—wave length
তাপ—heat
তাপীয়—thermal
তড়িৎ—electricity
তড়িৎ-দ্বার—electrode
তড়িৎ বিশ্লেষণ—electrolysis
তড়িৎ চক্র—electric circuit
তন্ত্র—system
তুলা যন্ত্র—balance
তুল্যাঙ্ক—equivalent
তেজস্ক্রিয়—radio-active
তেজস্ক্রিয়তা—radio-activity
তৌলিক—gravimetric
তুঁতে, তুঁতিয়া—blue vitriol, (copper sulphate)
তরুণাস্থি—cartilage
দণ্ড—rod
দল—petal
দহন—combustion
দাহ্য—combustible
দ্রব, দ্রবণ—solution
দ্রাবক—solvent
দ্রাব্য—solute
দ্রবণীয়—soluble
দস্তা—zinc
দ্রাঘিমা—longitude
দূরবীক্ষণ—telescope
দোলক—pendulum
দোলন—oscillation
ধন-তড়িৎ—positive electricity
ধমনী—artery
ধাতু—metal
ধাতুমল—slag

ধাতুবিদ্যা—metallurgy
ধারকত্ব—capacity
ধ্রুবক রাশি—constant quantity
নিরক্ষ রেখা—equator
নিরুদক—anhydride
নিরুদন—dehydration
নিয়ম—law
নিশাদল—sal-ammoniac
নমনীয়—plastic
নীলকান্ত, নীলা—sapphire
নীহারিকা—nebula
নিষ্কাশন—extraction
নিষ্ক্রিয়—inert
পরম—absolute
পরজীবী—parasite
পরমাণু—atom
পর্যায়ক্রমিক—periodic
পরিসীমা—perimeter
পরিবর্তী—alternating (current)
পরিবাহী—conductor
পরিবহন—conduction
পরিচলন—convection
পারমাণবিক—atomic
পাতন—distillation
পান দেওয়া—tempering
প্লবতা—buoyancy
প্রতিক্রিয়া—reaction
প্রতিফলন—reflection
প্রতিবিষ—antitoxin
প্রতিসরণ—refraction
প্রতিজ্ঞা—proposition
প্রজননবিদ্যা—genetics
প্রবাহ—current
প্রাণীকুল—fauna
পিত্ত—bile
পিত্তাশয়—gall-bladder
পাকস্থলী—stomach
প্রচ্ছায়া—umbra
প্রশমন—neutralisation
পদ্মরাগ—ruby
পারদ—mercury
পারদ সংকর—amalgam
ফটকিরি—alum
ফল-শর্করা—fruit sugar
ফলক—blade
ফলিত বিজ্ঞান—applied science
বক যন্ত্র—retort
বলবিদ্যা—mechanics
বল—force
ব্যস্ত অনুপাত—inverse ratio
বর্গ, বর্গফল—square
বর্ণালী—spectrum
বৃত্ত—circle
বায়ুমণ্ডল—atmosphere
বাধা (তড়িৎ)—resistance
বেগ—velocity
বিকিরণ—radiation
বিচ্ছুরণ—scattering
বিকর্ষণ—repulsion
বিদ্যুৎ, তড়িৎ—electricity

বিবর্তন—deviation
বিবর্ধন—magnification
বিভব—potential (electric)
বিস্ফোরণ—explosion
বিশ্লেষণ—analysis
বিদাহী—caustic
ব্যবহারিক—applied
বেতার—wireless
বেলে পাথর—sand stone
বিষুব রেখা (বৃত্ত)—equator
বীজ, বীজাণু—germ
বীজবারক—antiseptic
বাতান্বিত—ærated
ভর—mass
ভরবেগ—momentum
ভার—weight
ভার কেন্দ্র—centre of gravity
ভূমি—base
ভস্ম—calx
ভস্মীকরণ—calcination
ভাস্বর—incandescent
ভুষা—lamp black
মৌলিক পদার্থ, মৌল—element
মিনা—enamel
মুর্দা শঙ্খ—litharge
মরিচা—rust (iron-oxide)
মিশ্র, মিশ্রণ—mixture
মকরক্রান্তি—winter solistice
মনছাল, মনঃশিলা—realgar
মরীচিকা—mirage
মহাকর্ষ—gravitation
মাক্ষিক—pyrite
মান, মূল্য—value
মানচিত্র—map
মানমন্দির—observatory
মাত্রিক—quantitative
মঙ্গল গ্রহ—mars
মজ্জা—pith, marrow
মধ্য রেখা—meridian
মাধ্যম—medium
মধ্যচ্ছদা—diaphragm
মেরু—pole
মৃদুজল—soft water
রঞ্জক—dye
রঞ্জন—dying
রজন—resin
রশ্মি—ray
রক্তরস—plasma
রক্তকোষ—blood cell
রঙ্গ, রাং—tin
রসায়ন—chemistry
রসাঞ্জন—antimony sulphide
রসকর্পূর—corrosive sublimate
রাশি—quantity
রাসায়নিক—chemical
লম্ব—perpendicular
লাক্ষা, গালা—lac
লীন—latent
লসিকা—lymph
লৈখিক—graphical

লঘুকরণ—reduction, dilution
শত করা—per cent
শক্তি—energy
শূন্য—vaccum, zero
শিশিরাঙ্ক—dew point
শোষণ—absorption
শীর্ষ—vertex
শর্করা—sugar
শিরা—vein
শ্বেতসার—starch
শনি গ্রহ—saturn
শুক্র গ্রহ—venus
শ্রেণী—series, class
শারীরবৃত্ত—physiology
শ্বাসতন্ত্র—respiratory system
সঞ্চারপথ—locus
সক্রিয়—active
সংপৃক্ত—saturated
সংশ্লেষণ—synthesis
সমবায়—combination
সমীকরণ—equation
সমানুপাত—proportion
সমাধান—solution
সফেদা—white lead
সীস সিন্দুর—minium
সীসা—lead
সূচক—index, indicator
সূত্র—formula, law
সুগ্রাহী—sensitive
সংকেত—formula
সংকর ধাতু—alloy
সীসাঞ্জন—galena
সীসশ্বেত—white lead
সেঁকো—white arsenic
সুষুম্না কাণ্ড—spinal chord
সোহাগা—borax
সোরা—saltpetre
সৌরকলঙ্ক—sun-spot
স্থিতিস্থাপক—elastic
স্নেহ পদার্থ—fat
স্থিতিবিদ্যা—statics
স্থৈতিক—potential (energy)
স্পন্দন—vibration
স্ফুটনাঙ্ক—boiling point
স্ফটিক—crystal
হরিতাল—orpiment
হিঙ্গুল—cinnabar
হিমাঙ্ক—melting point
হিরাকস—green vitriol
হীরক—diamond

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত পরিভাষা অবলম্বনে)

Physics—পদার্থবিদ্যা

Absolute—পরম
Absorbent—শোষক
Absorption—শোষণ
Aberration—অপেরণ
Adjustment—উপযোজন
Achromatic—অবার্ণ
Adhesion—আসঞ্জন
Alternating current—পরিবর্তী প্রবাহ
Amplitude—বিস্তার
Apperatus—যন্ত্র
Astigmatism—বিষম দৃষ্টি
Asymmetric—প্রতিসম
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল
Balance—তুলা যন্ত্র
Beat—অধিকম্প
Boiling—স্ফুটন
" point—স্ফুটনাঙ্ক
Buoyancy—প্লবতা
Calibration—ক্রমাঙ্কন
Capacity—ধারকত্ব
Capillary—কৈশিক
Charge—আধান
Charged—আহিত
Chord (music)—স্বরসংগতি
Coefficient—গুণাঙ্ক
Cohesion—সংসক্তি
Coil—কুণ্ডলী
Colour—বর্ণ
Compass—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র
Compression—সংনমন
Concave—অবতল
Concentration (of rays)—সমাহরণ
Concentrated—সমাহৃত
Condensation ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Conduction—পরিবহণ
Conductivity—পরিবাহিতা
Conductor—পরিবাহী
Conservation of energy—শক্তির নিত্যতা
Constant—ধ্রুবক
Constant quantity—ধ্রুবরাশি
Contraction—সংকোচন
Convection—পরিচলন
Convergent—অভিসারী
Convex—উত্তল
Crystal—স্ফটিক

Crystalline—স্ফটিকাকার
Current—প্রবাহ
Diflection—বিক্ষেপ
Density—ঘনত্ব, ঘনাঙ্ক
Dew point—শিশিরাঙ্ক
Diamagnetism—তিরশ্চুম্বকতা
Dip—বিনতি
Direct current—সমপ্রবাহ
Discharge—ক্ষরণ, মোক্ষণ
Dispersion (of light)—বিচ্ছুরণ
Divergent—অপসারী
Electricity—তড়িৎ, বিদ্যুৎ
Electrode—তড়িদ্দ্বার
Electrolysis—তড়িদ্বিশ্লেষণ
Electromagnet—তড়িচ্চুম্বক
Electromotive—তড়িচ্চালক
Evaporation—বাষ্পীভবন, বাষ্পীকরণ
Expansion—সম্প্রসারণ
Fluid—তরল, বায়ব
Fluorescence—প্রতিপ্রভা
Fluorescent—প্রতিপ্রভ
Formula—সংকেত
Freezing point—হিমাঙ্ক
Heat—তাপ
Horizontal—অনুভূমিক
Humidity—আর্দ্রতা
Hydraulic—ঔদক
Hydrostatics—উদস্থিতি বিদ্যা
Image—প্রতিবিম্ব
Image, real—সদ্বিম্ব
" , virtual—অসদ্বিম্ব
Incidence—আপতন
Induction—আবেশ
Infra-red—অবলোহিত
Insulation—অন্তরণ
Insulated—অন্তরিত
Insulator—অন্তরক
Ionised—আয়নিত
Latent—লীন
Law—নিয়ম, সূত্র
Liquifaction—গলন, তরলীভবন
Magnet—চুম্বক
Magnetic—চুম্বকীয়, চৌম্বক
Magnetism—চৌম্বকত্ব
Magnetisation—চুম্বকন
Magnification—বিবর্ধন
Medium—মাধ্যম
Melting point—গলনাঙ্ক
Microscope—অণুবীক্ষণ
Mirage—মরীচিকা
Mirror—দর্পণ
Negative electricity—ঋণ-তড়িৎ
Neutral—উদাসীন
Opeque—অনচ্ছ
Orange (colour)—নারঙ্গ
Oscillation—দোলন
Parallax—লম্বন
Pendulum—দোলক
Penumbra—উপচ্ছায়া

Period—পর্যায়, কাল
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Permeable—প্রবেশ্য
Phase—দশা
Phosphorescence—অনুপ্রভা
Phosphorescent—অনুপ্রভ
Polarization (light)—সমবর্তন
Pole—মেরু
Porous—বহুরন্ধ্র
Porosity—সরন্ধ্রতা
Positive electricity—ধনতড়িৎ
Potential (electric)—বিভব
Pressure—চাপ
Rarefication—তনুকরণ
Ray—রশ্মি
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Reflection—প্রতিফলন
Reflected—প্রতিফলিত
Refraction—প্রতিসরণ
Refracted—প্রতিসরিত
Refraction (angle of)—প্রতিসরণ কোণ
Refracting index—প্রতিসরাঙ্ক
Refrigeration—হিমায়ন
Relative—আপেক্ষিক
Relativity—আপেক্ষিকতা
" (theory of)—আপেক্ষিক বাদ
Repulsion—বিকর্ষণ
Resistance—রোধ
Resonance—অনুনাদ
Response—সাড়া
Saturation—সংপৃক্তি
Sensitive (balance)—সুবেদী
" (photo plate)—সুগ্রাহী
Shade, Shadow—ছায়া
Solid—কঠিন, ঘনবস্তু
Solidification—ঘনীভবন, ঘনীকরণ
Source—উৎস, প্রভব
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
Spectrum—বর্ণালী
Standard—প্রমাণ
Strain—টান
Stress—পীড়ন
Suction—চোষণ
Symmetry—প্রতিসাম্য
Symmetrical—প্রতিসম
Synchronism—সমলয়
Telescope—দূরবীক্ষণ, দূরবীন
Television—দূরেক্ষণ
Temperature—উষ্ণতা
Tension—টান
Thermal—তাপীয়
Thermometer—তাপ (উষ্ণতা) মান যন্ত্র
Translucent—ঈষদচ্ছ
Transparent—স্বচ্ছ
Ultraviolet—অতি-বেগুনী
Umbra—প্রচ্ছায়া
Unit—একক, মাত্রা

Vacuum—শূন্য
Vapour—বাষ্প
Vibration—কম্পন, স্পন্দন
Violet—বেগুনী
Viscosity—সান্দ্রতা
Viscous—সান্দ্র
Vortex—আবর্ত
Wave—তরঙ্গ
Wave-length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য
X'ray—এক্স-রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি

Mechanics—বলবিদ্যা

Acceleration—ত্বরণ
Attraction—আকর্ষণ
Axle—অক্ষদণ্ড
Capacity—সামর্থ্য, ধারকত্ব
Centre of gravity—ভারকেন্দ্র
Centrifugal—কেন্দ্রাতিগ, অপকেন্দ্র
Centripetal—কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্দ্র
Conservation—নিত্যতা
Density—ঘনাঙ্ক
Dynamic—গতীয়
Dynamics (Kinetics)—গতিবিদ্যা
Elastic—স্থিতিস্থাপক
Energy—শক্তি
Equilibrium—সাম্য, স্থিতি
Force—বল
Friction—ঘর্ষণ
Fulcrum—আলম্ব
Gravitation—মহাকর্ষ
Gravity—অভিকর্ষ
Horizontal—অনুভূমিক
Impact—সংঘাত
Impulse, blow—ঘাত
Inclined—নত
Inertia—জাড্য
Kinematics—স্থিতিবিদ্যা
Kinetic—গতীয়, চল-
Kinetics (Dynamics)—গতিবিদ্যা
Mass—ভর
Matter—জড়
Moment—ভ্রামক
Momentum—ভরবেগ
Motion—গতি
Neutral—উদাসীন
Parallelogram of forces—বলসামন্তরিক
Pendulum—দোলক
Period—দোলনকাল, পর্যায়কাল
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Pitch, step (of screw)—থাক
Plane—সমতল

Plumb line—লম্বসূত্র, ওলনদড়ি
Position—অবস্থিতি
Potential (energy)—স্থৈতিক
Power—ক্ষমতা
Pressure—চাপ
Pull—টান
Pulley—কপি
Push—ঠেলা
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Repulsion—বিকর্ষণ
Resistance—বাধা
Rest—স্থিতি
Resultant—ফল, লব্ধি
Retardation—মন্দন
Revolution—পরিক্রমণ
Speed—দ্রুতি
Stable—সুস্থিত, সুপ্রতিষ্ঠ
Static—স্থিতীয়
Statics—স্থিতিবিদ্যা
Tension—টান
Thrust—ঘাত
Unstable—অপ্রতিষ্ঠ, দুঃস্থিত
Velocity—বেগ
Vertical—উল্লম্ব, খাড়া
Weight—ভার
Work—কার্য

রসায়ন—Chemistry

Absolute alcohol—নির্জল [অ্যালকোহল
Active—সক্রিয়
Affinity—আসক্তি
Alchemy—কিমিয়া
Alkali—ক্ষার
Alkaline—ক্ষারীয়
Alkaloid—উপক্ষার
Alloy—সংকর ধাতু
Alum—ফটকিরি
Amalgam—পারদ সংকর
Amorphous—অনিবন্ধী
Analysis—বিশ্লেষণ
" gravimetric—ভৌলিক "
" qualitative—আত্মিক "
" quantitative—মাত্রিক "
" volumetric—আয়তন "
Anhydride—নিরুদক
Anhydrous—অনার্দ্র
Annealing—কোমলায়ন
Aqueous—জলীয়
Astringent—কষায়
Atom—পরমাণু

Atomic—পারমাণবিক
Balance—তুলা
Base—ক্ষারক
Basic—ক্ষারকীয়
Basic salt—ক্ষারলবণ
Bell metal—কাঁসা, কাংস্য
Bellows—হাপর, ভস্ত্রা
Bivalent—দ্বিযোজী
Bleaching—বিরঞ্জন
Binary compound—দ্বিযৌগিক পদার্থ
Blow pipe—বাঁক নল
Blue vitriol—তুঁতিয়া, তুথ
Bone black—অস্থি অঙ্গার
Boiling—স্ফুটন, ফোটা
Boiling point—স্ফুটনাঙ্ক
Borax—সোহাগা
Bubble—বুদবুদ
By-product—উপজাত
Calcination—ভস্মীকরণ
Calx—ভস্ম
Camphor—কর্পূর
Cane sugar—ইক্ষু শর্করা
Capillary—কৈশিক
Carbon—অঙ্গারক
Cast iron—ঢালাই লোহা
Catalyst—অনুঘটক
Catalysis—অনুঘটন
Caustic—বিদাহী
Caustic alkali—তীক্ষ্ণক্ষার

Charcoal—কাঠকয়লা
Chemical—রাসায়নিক
Chemical action-রাসায়নিক ক্রিয়া
Chemical affinity—রাসায়নিক আসক্তি
" activity— " সক্রিয়তা
" composition— " গঠন
" formula— " সংকেত
" law— " সূত্র
" method— " পদ্ধতি
" theory— " বাদ
Chemistry—রসায়ন
" analytical—বৈশ্লেষিক রসায়ন
" applied—ফলিত "
" physical—ভৌত "
" practical—ব্যবহারিক "
" theoretical—তত্ত্বীয় "
Cinnabar—হিঙ্গুল
Coal-tar—আলকাতরা
Combustion—দহন
Combustible—দাহ্য
Compound—যৌগিকপদার্থ
Composition—গঠন
Copper pyrites—তাম্র মাক্ষিক
" sulphate—তুঁতে, তুঁতিয়া
Corrosive—ক্ষারী
" sublimate—রসকর্পূর
Crystal—স্ফটিক
Crystalline—স্ফটিকাকার
Decomposition—বিয়োজন

Decomposed—বিয়োজিত
Decoction—ক্বাথ, ক্বথন
Dehydrated—নিরুদিত
Dehydration—নিরুদন
Destructive distillation—অন্তর্ধূম পাতন
Decantation—আস্রাবন
Density—ঘনত্ব, ঘনাঙ্ক
Dilution—লঘূকরণ
Distillation—পাতন
Distilled—পাতিত
Disinfectant—বীজঘ্ন
Dissolve—দ্রবীভূত করা
Distil—পাতিত করা
Ductility—প্রসার্যতা
Dye—রঞ্জক
Dying—রঞ্জন
Ebullition—স্ফুটন
Effervescence—বুদ্বুদন
Efflorescent—উদত্যাগী
Element—মৌলিক পদার্থ, মৌল
Electrode—তড়িৎ-দ্বার
Enamel—মিনা
Evaporation—বাষ্পীভবন
Extraction—নিষ্কাশন
Essential oil—উদ্বায়ী তৈল
Explosion—বিস্ফোরণ
Explosive—বিস্ফোরক
Fat—চর্বি, স্নেহপদার্থ
Ferment—খমির, কিণ্ব
Fermentation—সন্ধান
Fermented—সন্ধিত
Fertilizer—সার
Filtration—পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি
Filtered—পরিস্রুত
Fire-proof—অগ্নিসহ
Fixed alkali—স্থির ক্ষার
Flower of sulphur—গন্ধক রজ
Fluorescence—প্রতিপ্রভা
Flame—শিখা
Formation—সংগঠন
Formula—সংকেত
Fruit sugar—ফল শর্করা
Furnace—চুল্লী
Freezing point—হিমাঙ্ক
Fusion—গলন
Fume—ধূম
Fuming acid—ধূমায়মান অ্যাসিড
Gaseous—গ্যাসীয়
Galena—সীসাঞ্জন
Grape sugar—দ্রাক্ষা শর্করা
Glass—কাচ
" rod—কাচ দণ্ড
" tube—" নল
Green vitriol—হিরাকস
Gravimetric analysis—ভৌলিক বিশ্লেষণ
Grind—পেষণ করা
Ground glass—ঘষা কাচ
Gun powder—বারুদ

Hard water—খর জল
Hardness—খরতা, কঠোরতা
Heat—তাপ
Heavy metal—গুরু ধাতু
Hydrolysis—আর্দ্র-বিশ্লেষণ
Hygroscopic—জলাকর্ষী
Hypothesis—প্রকল্প
Ignition—জ্বলন
" point—জ্বলনাঙ্ক
Inorganic—অজৈব
Inactivity—নিষ্ক্রিয়তা
Incandescence—ভাস্বরতা
Incombustible—অদাহ্যতা
Indicator—সূচক
Indigo—নীল
Inert, inactive—নিষ্ক্রিয়
Insoluble—অদ্রাব্য
Iron—লোহা
" , ore—লৌহ আকরিক
" , soft—কাঁচা লোহা
" , wrought—পেটা লোহা
" , cast—ঢালাই লোহা
Isomorphous—সমাকৃতি
Kiln—ভাটি
Lac—লাক্ষা, গালা
Lactose—দুগ্ধ শর্করা
Lampblack—ভুষা কালি
Law—নিয়ম, সূত্র
Lime stone—চুনাপাথর
Liquid—ত[illegible]

Lead—সীসা, সীসক
" , black—কৃষ্ণ সীস
" , red—মেটে সিন্দুর
" , white—সফেদা
Litharge—মুদ্রাশঙ্খ
Lixiviation—দ্রাবণ
Malt—সীরা
Mercury—পারা, পারদ
Melting point—গলনাঙ্ক
Metal—ধাতু
" , noble—বরধাতু
" , base—অবরধাতু
Metallurgy—ধাতুবিদ্যা
Metalloid—ধাতুকল্প
Mineral—খনিজ, মণিক
Mineralogy—মণিকবিদ্যা
Minium—মেটেসিন্দুর, সীসসিন্দুর
Mixture—মিশ্রণ
Moist—আর্দ্র
Molecule—অণু
Molecular—আণবিক
" formula—আণবিক সংকেত
Monobasic—একক্ষারীয়
Monovalent—একযোজী
Mortar—খল
Multivalent—বহুযোজী
Nascent—জায়মান
Natural water—প্রাকৃত জল
Neutralization—প্রশমন
Neutral—প্রশমিত

Nitre—সোরা
Non-metal—অধাতু
Non-volatile—অস্থায়ী
Normal density—প্রমাণ ঘনত্ব
Occlusion—অন্তর্ধৃতি
Octahedron—অষ্টতলক
Opaque—অনচ্ছ
Organic—জৈব, অঙ্গারক
Orpiment—হরিতাল
Paraffin—খনিজ মোম
Passive iron—নিষ্ক্রিয় লৌহ
Perfect gas—আদর্শ গ্যাস
Periodic law—পর্যায় সূত্র
Phosphorescence—অনুপ্রভা
Physical change-ভৌত পরিবর্তন
Pigment—রঞ্জক
Plastic—নমনীয়
Plating—ধাতুলেপন
Precipitation—অধঃক্ষেপন
Polyvalent—বহুযোজী
Pressure—চাপ
Poisonous—সবিষ
Putrefaction—পচন
Purified—শোধিত
Pyrite—মাক্ষিক
Quadrivalent—চতুর্যোজী
Quicklime—কলি চুন
Quick silver—পারদ
Radio-active—তেজস্ক্রিয়
Rare earth—বিরলমৃত্তিক

Reaction—বিক্রিয়া
Reactive—সক্রিয়
Reagent—বিকারক
Realgar—মোমছাল, মনঃশিলা
Reducing agent—বিজারক দ্রব্য
Reduction—বিজারণ
Retort—বকযন্ত্র
Resin—রজন
Rock salt—খনিজ লবণ
Ruby glass—লোহিত কাচ
Ruby—পদ্মরাগ, চুনি
Rust—মরিচা
Salammoniac—নিশাদল
Salt—লবণ
" , common—খাদ্য লবণ
" , compound—যৌগ লবণ
Saltpetre—সোরা
Saturation—সংপৃক্তি
Saturated—সংপৃক্ত
Sediment—গাদ, কল্ক
Sapphire—নীলকান্ত
Solder—ঝাল
Soluble—দ্রবণীয়
Solubility—দ্রাব্যতা, দ্রবণীয়তা
Solution—দ্রব, দ্রবণ
Slag—ধাতুমল
Smelting—বিগলন
Stable—স্থায়ী
Starch—শ্বেতসার
Standard solution—প্রমাণ দ্রব

Sublimation—ঊর্দ্ধ্ব পাতন
Sugar—শর্করা, চিনি
Sulpher—গন্ধক
Supersaturated—অতিপৃক্ত
Synthesis—সংশ্লেষণ
Synthetic—সাংশ্লেষিক
Symbol—চিহ্ন
Temperature—উষ্ণতা
Tempering—পান দেওয়া
Turpentine—তার্পিন
Theory—তত্ত্ব, বাদ
Theoretical—তত্ত্বীয়, বাদীয়
Tin—রাং, টিন
Triad, Trivalent—ত্রিযোজী
Trituration—বিচূর্ণন
Tube—নল
Tubular—নলাকার
Union—সংযোগ
Unequal—অসম
Univalent—একযোজী
Unsaturated—অসংপৃক্ত
Vapour—বাষ্প
Vinegar—সিরকা
Vermillion—সিন্দুর
Viscous—সান্দ্র
Viscosity—সান্দ্রতা
Vitreous—কাচীয়
Volatile—উদ্বায়ী
Vitrol, blue—তুঁতিয়া
" , green—হিরাকস
Volume—আয়তন
Water hard—খর জল
" soft—মৃদু জল
Waterproof—জলাভেদ্য
Watertight—জলরোধক
Weak solution—ক্ষীণ দ্রব
White arsenic—সেঁকো
White lead—সফেদা, শ্বেতসীস
White heat—শ্বেততাপ
Wood charcoal—কাঠকয়লা
Zinc—দস্তা
Zircon—গোমেদ

গণিত—Mathematics

পাটীগণিত—Arithmetic

জ্যামিতি—Geometry

বীজগণিত—Algebra

ত্রিকোণমিতি—Trigonometry

Absolute—পরম
Abscissa—ভুজ
Abstract number—শুদ্ধ সংখ্যা
Adjacent angle—সন্নিহিত কোণ
Acute angle—সূক্ষ্ম কোণ
Addition—যোগ, সংকলন
Alternate—একান্তর
Approximate value—আসন্নমান
Arc—চাপ
Area—কালি, ক্ষেত্রফল
Arm—ভুজ, বাহু
Average—গড়
Axiom—স্বতঃসিদ্ধ
Axis—অক্ষ
Base—ভূমি
Binomial—দ্বিপদ
By (÷)—ভাজিত
Centre—কেন্দ্র
Cardinal—অঙ্কবাচক
Chord—জ্যা
Circle—বৃত্ত
Circular measure—বৃত্তীয় মান
Circumference—পরিধি
Circumscribed—পরিলিখিত

Coefficient—গুণক, সহগ
Combination—সমবায়
Coincidence—সমাপতন
Collinear—একরেখীয়
Complex—জটিল
Compound—মিশ্র, যৌগিক
" interest—চক্রবৃদ্ধি
Complementary angle—পূরক কোণ
Concrete number—বদ্ধ সংখ্যা
Constant—ধ্রুবক
Concentric—এককেন্দ্রীয়
Concurrent—সমবিন্দু
Co-ordinates—স্থানাঙ্ক
Cone—শঙ্কু
Conjugate—অনুবন্ধী
Convergent—অভিসারী
Converse—বিপরীত
Coplanar—একতলীয়
Corollary—অনুসিদ্ধান্ত
Cross section—প্রস্থচ্ছেদ
Cube—ঘন, ঘনফল
Cube root—ঘন মূল
Cubic—ঘন, ত্রিঘাত

Decimal—দশমিক
Deduction—সিদ্ধান্ত
Difference—অন্তর
Differential Calculus—অন্তরকলন
Digit—অঙ্ক
Diagonal—কর্ণ
Diameter—ব্যাস
Dimension—মাত্রা
Directrix—নিয়ামক
Divergent—অপসারী
Dividend—ভাজ্য
Division—ভাগ, হরণ
Divisor—ভাজক
Duo-decimal—দ্বাদশিক
Eccentricity—উৎকেন্দ্রতা
Ellipse—উপবৃত্ত
Elimination—অপনয়ন
Equation—সমীকরণ
Equivalent—তুল্য, সমমূল্য
Equiangular—সদৃশকোণী
Equidistant—সমদূরবর্তী
Equilateral—সমবাহু
Even—যুগ্ম, জোড়
Evolution—অবঘাতন
Escribed—বহির্লিখিত
Exterior angle—বহিঃকোণ
External—বহিস্থ
Expansion—বিস্তৃতি
Exponential Theorem সূচকসূত্র
Expression—রাশি
Face—তল
Factor—উৎপাদক, গুণনীয়ক
Factorial—গৌণিক
Formula—সূত্র
Figure—চিত্র
Fraction—ভগ্নাংশ
Function—অপেক্ষক
Graph—চিত্র, লেখ
Graphical—লৈখিক
Geometric series—গুণোত্তর শ্রেণী
Hyperbola—পরাবৃত্ত
Hypotenuse—অতিভুজ
Hypothesis—কল্পনা, প্রকল্প
Highest common factor (H. C. F)—গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ, সা, গু)
Homogeneous—সমমাত্র
Included angle—অন্তর্ভুক্ত কোণ
Inscribed—অন্তর্লিখিত
Identity—অভেদ
Imaginary—কল্পিত
Improper fraction—অপ্রকৃত ভগ্নাংশ
Incommensurable—অমেয়
Index—সূচক
Infinite, Infinity—অসীম, অনন্ত
Integer—পূর্ণসংখ্যা
Integral calculus—সমাকলন

Into(×)—গুণিত
Internal—অন্তস্থ
Intersection—প্রতিচ্ছেদ, ছেদ
Irregular—বিষম
Isosceles—সমদ্বিবাহু
Inverse ratio—ব্যস্ত অনুপাত
Involution—উদ্‌ঘাতন
Latus rectum—নাভিলম্ব
Line—রেখা
Locus—সঞ্চারপথ
Longitudinal section—দীর্ঘচ্ছেদ
Lowest common multiple (L. C.M)—লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল, সা, গু)
Magnitude—মান, পরিমাণ
Major axis—পরাক্ষ
Minor axis—উপাক্ষ
Maixmum—চরম, বৃহত্তম
Mean—মধ্যক, সমক
Minus—বিযুক্ত
Minute—কলা, মিনিট
Minimum—অল্পতম
Mixed (fraction)—মিশ্র
Multiple—গুণিতক
Multiplicand—গুণ্য, গুণনীয়
Multiplication—গুণন, পূরণ
Multiplier—গুণক
Negative—ঋণাত্মক
Number—সংখ্যা
Numerator—লব
Normal—অভিলম্ব
Normal section—লম্বচ্ছেদ
Odd—অযুগ্ম, বিষম
Order—ক্রম
Oblique section—বক্রচ্ছেদ
Obtuse angle—স্থূল কোণ
Octahedron—অষ্টতলক
Opposite angle—বিপরীত কোণ
Ordinate—কোটি
Ordinal—পূরণবাচক
Parabola—অধিবৃত্ত
Parallel—সমান্তরাল
Parallelogram—সামান্তরিক
Pentagon—পঞ্চভুজ
Perimeter—পরিসীমা
Perpendicular—লম্ব
Per cent—শতকরা
Percentage—শতকরা হার
Permutation—বিন্যাস
Plane—সমতল
Plus—যুক্ত
Point—বিন্দু
Pole—মেরু
Polygon—বহুভুজ
Polyhedron—বহুতলক
Postulate—স্বীকার্য
Positive—ধনাত্মক
Power—ঘাত
Practice—চলিত নিয়ম
Problem—সম্পাদ্য

Projection—অভিক্ষেপ
Prime—মৌলিক
Product—গুণফল
Progression—প্রগতি
Proportion—সমানুপাত
Proportional—আনুপাতিক
Proposition—প্রতিজ্ঞা
Quadratic—দ্বিঘাত
Quantity—রাশি
Quadrilateral—চতুর্ভুজ
Quotient—ভাগফল
Rate—হার, দর
Ratio—অনুপাত
Radius—ব্যাসার্ধ
Rational—মূলদ
Reciprocal—বিপরীত
Rectangle—আয়ত ক্ষেত্র
Rectilinear—ঋজুরেখ
Reflex angle—প্রবৃদ্ধ কোণ
Regular—সুষম
Recurring—আবৃত্ত
Reduction—লঘূকরণ
Remainder—অবশিষ্ট, বাকী
Root—মূল
Rule of three—ত্রৈরাশিক
Right angle—সমকোণ
Side—বাহু, ভুজ, পক্ষ
Sign—চিহ্ন
Simplification—সরলীকরণ
Scalene—বিষমভুজ
Secant—ছেদক
Second—বিকলা, সেকেণ্ড
Section—ছেদ
Sector—বৃত্তকলা
Segment—বৃত্তাংশ
Semicircle—অর্ধবৃত্ত
Series—শ্রেণী
Size—আয়তন
Solution—সমাধান
Simultaneous equation—সহসমীকরণ
Square—বর্গ, বর্গক্ষেত্র
Square root—বর্গমূল
Solid—ঘন, ঘনবস্তু
Space—স্থান, দেশ
Spiral—সর্পিল
Straight—সরল, ঋজু
Subtended angle—সম্মুখ কোণ
Superposition—উপরিপাত
Subtraction—বিয়োগ, ব্যবকলন
Sum—যোগফল, সমষ্টি
Surd—করণী
Supplementary angle—সম্পূরক কোণ
Surface—তল, পৃষ্ঠ
Symmetry—প্রতিসাম্য
Tangent—স্পর্শক
Tetrahedron—চতুস্তলক
Term—রাশি, পদ
Theorem—উপপাদ্য

Transverse—তির্যক
Triangle—ত্রিভুজ, ত্রিকোণ
Trigonometrical ratio—কোণানুপাত
Unit—একক
Uniform—সম
Unitary method—ঐকিক নিয়ম
Value—মূল্য, মান
Variable—চল
Variation—ভেদ
Vertex—শীর্ষ
Vertical angle—শিরঃকোণ
Vertically opposite—বিপ্রতীপ
Volume—ঘনফল, ঘনমান, আয়তন
Vulgar (fraction)—সামান্য
Zero—শূন্য

জ্যোতিষ—Astronomy

Aberration —অপেরণ
Altitude—উন্নতি
Annual motion—বার্ষিক গতি
Aphelion—অপসূর
Apogee—অপভূ
Apparent—আপাত
Ascending node উদ্‌বিন্দু, উচ্চপাত
Asteriods—গ্রহাণুপুঞ্জ
Autumnal equinox—জলবিষুব
Azimuth—দিগংশ
Binary star—যুগ্মতারা
Canopus—অগস্ত্য
Celestial equator, equinoctial —খ-বিষুবরেখা, খ-বিষুববৃত্ত
Celestial latitude—ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ
" longitude—ক্রান্ত্যংশ, ভুজাংশ
" sphere—খগোল
Collimation—অক্ষীকরণ
Comet—ধূমকেতু
Constellation—নক্ষত্র, তারামণ্ডল
Culmination—মধ্যগমন
Cycle—চক্র
Declination—বিষুবলম্ব
Descending node—অববিন্দু, নিম্নপাত
Deviation—চ্যুতি
Diurnal—আহ্নিক, দৈনিক
Ebb tide—ভাটা
Eclipse—গ্রহণ
" annular—বলয়গ্রাস
" partial—খণ্ডগ্রাস
" total—পূর্ণগ্রাস
Ecliptic - ক্রান্তিবৃত্ত
Equator—নিরক্ষরেখা, ভূ-বিষুববৃত্ত

Equatorial—নিরক্ষীয়
Equinox (time)—বিষুব
Flow tide—জোয়ার
Full moon—পূর্ণিমা
Galaxy—ছায়াপথ
Geocentric—ভূকেন্দ্রীয়
Heliocentric—সূর্যকেন্দ্রীয়
Horizon (circle)—দিগন্ত
" (plane)—ক্ষিতিজ
Horizontal—অনুভূমিক
Inferior planet—অন্তর্গ্রহ
Interstellar space—আন্তঃপ্রদেশ
Jupiter—বৃহস্পতি
Leap-year—অধিবর্ষ
Local time—স্থানীয় সময়
Lunar—চান্দ্র
Lunation—চান্দ্রমাস
Mars—মঙ্গল
Mean time—মধ্যকাল
Mercury—বুধ
Meridian—মধ্যরেখা
" plane—মধ্যতল
Meteor—উল্কা
Meteorite—উল্কাপিণ্ড
Moon—চন্দ্র
Nadir—কুবিন্দু
Neap-tide—লঘুস্ফীতি, মরা কটাল
Nebula—নীহারিকা
Neptune—নেপচুন
New moon—অমাবস্যা
Node—পাত
Nutation—অক্ষবিচলন
Observatory—মানমন্দির
Orbit—কক্ষ
Orion—কালপুরুষ
Parallax—লম্বন
Penumbra—উপচ্ছায়া
Perigee—অনুভূ
Perihelion—অনুসূর
Phase—কলা
Planet—গ্রহ
Polar axis—ধ্রুবাক্ষ
" distance—লম্বাংশ
Pole—মেরু
Pole star—ধ্রুবতারা
Precession—অয়নচলন
Prime meridian—মূল মধ্যরেখা
" vertical—পূর্বাপরবৃত্ত
Progression—অগ্রগতি
Regression—পশ্চাদ্গতি
Right ascension—বিষুবাংশ
Satellite—উপগ্রহ
Saturn—শনি
Siderial time—নাক্ষত্রকাল
Sirius—লুব্ধক
Solstice—অয়নান্ত
Spring-tide গুরুস্ফীতি, তেজ কটাল
Star—তারা, তারকা
Sun—সূর্য
Sun-spot—সৌর কলঙ্ক

Sun-dial—সূর্যঘড়ি
Superior planet—বহির্গ্রহ
Synodic period—যুতিকাল
Tide—জোয়ার-ভাটা, জলস্ফীতি
Transit circle—মধ্যবৃত্ত
Twilight—সন্ধ্যালোক
Umbra—প্রচ্ছায়া
Ursa major—সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa minor—শিশুমার
Vega—অভিজিৎ
Venus—শুক্র
Vernal equinox—মহাবিষুব
Vertical—উল্লম্ব, উর্ধ্বাধ
Vertical circle—লম্ববৃত্ত
Winter solstice—মকরক্রান্তি
Zenith—খমধ্য, সুবিন্দু
" distance—নতাংশ

শারীরবৃত্ত—Physiology

Abdomen—উদর
Adam's apple—কণ্ঠমণি
Adenoids—গলরসগ্রন্থি
Alimentary canal—পৌষ্টিক নালী
Anæmia—রক্তাল্পতা
Anatomy—শারীরস্থান
Antiseptic—বীজবারক
Antitoxin—প্রতিবিষ
Anus—পায়ু
Aorta—মহাধমনী
Appetite—ক্ষুধা
" , loss of—ক্ষুধামান্দ্য
Artery—ধমনী
Artificial—কৃত্রিম
" feeding—কৃত্রিম খাদন
" respiration—কৃত্রিম শ্বসন

স্বাস্থ্যবিদ্যা—Hygiene

Aseptic—নির্বীজ
Assimilation—আত্তীকরণ
Auricle—অলিন্দ
Balanced diet—সুষম খাদ্য
Bile—পিত্ত
Bladder—বস্তি
Blood—রক্ত
Circulation of blood—রক্ত সংবহন
Clotting of " —রক্ত তঞ্চন
Blood pressure—রক্তপ্রেষ
" vessel—রক্তবাহ
Bone—অস্থি, হাড়
Breast bone—উরঃফলক
Carpal " —করকূর্চাস্থি
Hip " —নিতম্বাস্থি

Innominate bone—অযনাস্থি, কপাল
Metacarpal " —করাঙ্গুলি-মূল-শলাকা
Metatarsal " —পদাঙ্গুলি-মূল-শলাকা
Thigh " —উর্বস্থি
Bowel—অন্ত্র
Brain—মস্তিষ্ক
Breathing—শ্বসন, শ্বাসকার্য
Bronchus—ক্লোমশাখা
Capillaries—জালক
Cartilage—তরুণাস্থি
Cerebellum—লঘুমস্তিষ্ক
Cerebrum—গুরুমস্তিষ্ক
Chest—বক্ষ
Choroid coat—কৃষ্ণমণ্ডল
Chyme—পাকমণ্ড
Coccyx—অনুত্রিকাস্থি
Collar bone—অক্ষকাস্থি
Colon—মলাশয়
Conjunctiva—নেত্রবর্ত্ম কলা
Cornea—অচ্ছোদ পটল
Corpuscles, blood—রক্ত কণিকা
" , red—লোহিত কণিকা
" , white—শ্বেত কণিকা
Cranium—করোটিকা
Cuticle—ত্বক্তিক
Dermis—অন্তত্বক্
Diaphragm—মধ্যচ্ছদা
Digestion—পরিপাক, হজম
Discharge—স্রাব
Disease—রোগ, ব্যাধি
" , contagious—স্পর্শক্রামী বা ছোঁয়াচে রোগ
" , infectious—সংক্রামী রোগ
" , water-borne—জলবাহিত রোগ
Disinfectant—বীজঘ্ন
Disinfection—নির্বীজন
Ducts, thoracic—মুখ্যা রসকুল্যা
Duodenum—গ্রহণী
Eyeball—চক্ষুগোলক
Fainting—মূর্চ্ছা
Femur—উর্বস্থি
Ferment—কিণ্ব
Fibula—অনুজঙ্ঘাস্থি
Foramen magnum—মহাবিবর
Gall bladder—পিত্তাশয়
Ganglion—নার্ভগ্রন্থি
Gastric juice—পাচকরস
Germ—বীজ, রোগবীজ
Gland—গ্রন্থি
Gullet—গ্রাসনালী
Gum—মাঢ়ী
Heart—হৃৎপিণ্ড
" , beat—হৃৎস্পন্দন
Humerus—প্রগণ্ডাস্থি
Immune—অনাক্রম্য
Inspiration—প্রশ্বাস

Instep—পদপৃষ্ঠ
Intestine—অন্ত্র
,, large—বৃহদন্ত্র
,, small—ক্ষুদ্রান্ত্র
Iris—কনীনিকা
Joint—সন্ধি
Kidney—বৃক্ক
Knee—জানু
Knee-cap—জানুকাপালিক
Larynx—স্বরযন্ত্র
Ligament—সন্ধিবন্ধনী
Liver—যকৃত
Loin—কটি
Longsightedness—দূরবদ্ধ দৃষ্টি
Lungs—ফুসফুস
Lymph—লসিকা
Lymphatic vessel—লসিকানালী
Membrane—ঝিল্লী
Microbe—জীবাণু
Mucus—শ্লেষ্মা
,, membrane—শ্লেষ্মাঝিল্লী
Muscle—পেশী
,, voluntary—ঐচ্ছিক পেশী
,, involuntary—অনৈচ্ছিক ,,
Nasal passage—নাসাপথ
Neck—গ্রীবা
Nerve—নার্ভ
,, afferent—অন্তর্মুখ নার্ভ
,, efferent—বহির্মুখ ,,
,, motor—চেষ্টীয় ,,
Nerve, sensory—সংবেদ নার্ভ
Nose cavity—নাসাবিবর
Nostril—নাসারন্ধ্র
Nourishment, nutrition—পুষ্টি
Œsophagus—গ্রাসনালী
Organ—যন্ত্র
,, digestive—পাচন যন্ত্র
,, excretory—রেচন যন্ত্র
,, respiratory—শ্বাসযন্ত্র
Ovary—অণ্ডাশয়
Pancreas—অগ্ন্যাশয়
Parasite—পরজীবী
Pelvis—শ্রোণীচক্র
Pericardium—হৃদ্ধরা কলা
Peristalsis—ক্রমসংকোচ
Perspiration—ঘর্ম
Phalanges—অঙ্গুলিনলক
Pharynx—গলবিল
Plasma—রক্তরস
Pleura—ফুসফুসধরা কলা
Poison—বিষ
Poisonous—সবিষ
Poisoned—বিষিত
Poisoning—বিষণ
Prevention—বারণ, প্রতিরোধ
Pulse—নাড়ী
Pupil—তারারন্ধ্র
Pus—পূষ
Putrefaction—পচন, শটন

Quarantine—সঙ্গরোধ
Radius—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Rectum—মলনালী
Respiration—শ্বসন
Retina—অক্ষিপট
Rib—পাঁজরা, পর্শুকা
Rigor mortis—মরণ সংকোচ
Sacrum—ত্রিকাস্থি
Saliva—লালা
Salivary gland—লালাগ্রন্থি
Sanitation—স্বাস্থ্যবিধান
Scapula—অংসফলক
Sclerotic coat—শ্বেতমণ্ডল
Secretion—ক্ষরণ
Sense-organ—ইন্দ্রিয়স্থান
Sensory centre—সংজ্ঞাকেন্দ্র
Sepsis—বীজদূষণ
Septic tank—মলশোধনী
Serum—রক্তমস্তু, রক্তরস
Shortsightedness—অদূরবদ্ধ দৃষ্টি
Shoulder-blade—অংসফলক
Skin—চর্ম
Skull—করোটি
Socket—কোটর
Spinal chord—সুষুম্নাকাণ্ড
" column—মেরুদণ্ড
Spleen—প্লীহা
Spore—বীজগুটি
Sternum—উরঃফলক
Sterilization—নির্বীজন
Sterilised—নির্বীজিত
Stomach—পাকস্থলী
Sweat-gland—স্বেদগ্রন্থি
System—তন্ত্র
" alimentary—পৌষ্টিক তন্ত্র
" circulatory রক্তসংবহন "
" digestive—পাচন "
" respiratory—শ্বসন "
" sensory—সংজ্ঞা "
Tendon—কণ্ডরা
Thigh—উরু
Throat—কণ্ঠ
Tibia—জঙ্ঘাস্থি
Tissue—কলা
Tooth—দন্ত, দাঁত
", bicuspid—দ্বিশীর্ষ দন্ত
", canine—ছেদক দন্ত
", incisor—কৃন্তক দন্ত
", molar—পেষক দন্ত
Trachea—ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী
Trunk—মধ্যশরীর, ধড়
Tympanum—কর্ণপটহ
Ulna—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
Ureter—গবিনী
Urethra—মূত্রনালী
Vein—শিরা
Vena cava—মহাশিরা
" ", inferior—অধরা "
" ", superior—উত্তরা "
Ventilated—বাতাহিত

Ventilation—বায়ুচলন
Ventricle—নিলয়
Vertebra—কশেরুকা
Vertebral column—মেরুদণ্ড
Viscera—আন্তর যন্ত্র
Vitamin—খাদ্য-প্রাণ
Voice-box—স্বরকক্ষ
Windpipe—শ্বাসনালী,
শ্লোমনালিকা
Waste—বর্জ্য, জঞ্জাল
Waste product—বর্জ্য পদার্থ
Worm—কৃমি
Wound—ক্ষত
Wrist—মণিবন্ধ, কব্জি

Biology—জীববিদ্যা

Zoology—প্রাণিবিদ্যা

Abiogenesis—অজীবজনি
Abortive—লুপ্ত
Acotyledon—অবীজপত্রী
Acquired character—লব্ধ গুণ
Adaptation—অভিযোজন,
প্রতিযোজন
Adventitious—অস্থানিক
Aerial root—অবরোহ
Aerobic—বায়ুজীবী
Air-bladder—পটকা, বায়ুস্থলী
Algæ—শেওলা
Amphibious—উভচর
Anabolism—উপচিতি
Anærobic—অবায়ুজীবী
Angiosperm—গুপ্তবীজী
Animalcule—কীটাণু
Analogous—সমবৃত্তি

Botany—উদ্ভিদবিদ্যা

Ancestral—কৌলিক
Annual—বর্ষজীবী
Anther—পরাগধানী
Antenna—শুঙ্গ
Anterior—অগ্র, পুরঃ -
Ape—বনমানুষ
Appendage—উপাঙ্গ
Acquatic—জলজ, জলচর
Arthropod—সন্ধিপদ
Articulated—গ্রথিত, গ্রন্থিল
Asexual—অযৌন
Assimilation—আত্তীকরণ
Biogenesis—জীবজনি
Biologist—জীববিৎ
Bisexual—উভলিঙ্গ
Bark—বল্কল
Blade—ফলক

Bract—মঞ্জরীপত্র
Branching—শাখা বিন্যাস
Bat—চামচিকা, বাদুড়
Beak, bill—চঞ্চু
Biped—দ্বিপদ
Bladder—থলী
Boa—অজগর
Bud—কোরক, মুকুল
Budding—কোরকোদ্গম
Breeding—প্রজনন
Burrow—গর্ত, বিবর
Burrowing—গর্তকারী, গর্তবাসী
Butterfly—প্রজাপতি
Bulb—কন্দ
Cell—কোষ
Cell wall—কোষ প্রাচীর
Calyx—বৃতি
Carpel—গর্ভপত্র
Canine—শ্বান
Carapace—বর্ম
Carnivorous—মাংসাশী
Climber—রোহিণী
Cordate—তাম্বুলাকার
Corolla—দলমণ্ডল
Corona—মুকুট
Caterpillar—শূক, শুঁয়াপোকা
Centipede—শতপদ। বিছা, বৃশ্চিক
Cotyledon—বীজপত্র
Character—লক্ষণ
Chaetopod—শূকপদ
Creeper—ব্রততী
Crenate—সভঙ্গ
Cruciform—ক্রুশাকার
Cryptogam—অপুষ্পক উদ্ভিদ
Cocoon—গুটি
Cold-blooded—অনুষ্ণশোণিত
Colouration—বর্ণগ্রহ
Compound eye—পুঞ্জাক্ষি
Crayfish—চিংড়ি
Cricket—ঝিঁঝিঁ, ঝিল্লী
Crustacean—কবচী
Class—শ্রেণী
Classification—শ্রেণী বিভাগ
Colony—সংঘ
Contractile—সংকোচী
Culture—কৃষ্টি
Culm—তৃণকাণ্ড
Cyme—স্তবক
Deciduous (leaf)—পাতী
,, (tree)—পর্ণমোচী
Dentate—দন্তুর
Daughter cell—অপত্যকোষ
Defensive—রক্ষাকর
Degeneration—আপজাত্য
Descent—উদ্ভব
Diandrous—দ্বিকেশর
Differentiation—বিভেদ
Distribution—বিস্তারণ, সংস্থান
Diclinous, unisexual—একলিঙ্গ
Dicotyledon—দ্বিবীজপত্রী

Digitate—অঙ্গুলাকার
Dioecious—ভিন্নবাসী
Dominate—প্রকট
Dormant, latent—অব্যক্ত, লীন
Dorsal—পৃষ্ঠ্য, পৃষ্ঠ
Drone—পুং-মধুপ
Ecology—বাস্তব্যবিদ্যা
Endocarp—ফলের অন্তস্ত্বক্
Endogenous—অন্তর্জনিষ্ণু
Earthworm—কেঁচো
Egg—ডিম্ব, অণ্ড
Endoskeleton—অন্তঃকঙ্কাল
Entomology—পতঙ্গবিদ্যা
Exoskeleton—বহিঃকঙ্কাল
Endosperm—সস্য
Evergreen—চিরহরিৎ
Embryo—ভ্রূণ
Embryology—ভ্রূণবিদ্যা
Environment—প্রতিবেশ
Ephemeral—ক্ষণস্থায়ী
Evolution—অভিব্যক্তি
Exotic—বিদেশীয়
Extinct—লুপ্ত
Family—গোত্র
Fang—বিষদন্ত
Fauna—প্রাণিকুল
Feather—পালক
Feline—বৈড়াল
Fertilization—নিষেক, গর্ভাধান
Fin—পাখ্‌না
Fœtus—ভ্রূণ
Forelimb—অগ্রপদ
Fossil—জীবাশ্ম
Fossilized—অশ্মীভূত, শিলিভূত
Flora—উদ্ভিদকুল
Fungus—ছত্রাক
Frugivorous—ফলাশী
Fusiform—মূলকাকার
Gamete—জনন কোষ
Gamopetalous—যুক্তদল
Gamosepalous—যুক্তবৃতি
Gastropod—উদরপদ
Germination—অঙ্কুরোদ্‌গম
Generation—জনি
Genetics—প্রজননবিদ্যা
Genus—গণ
Germ cell—জনন-কোষ
Gill—ফুল্‌কো
Gill flap—কান্‌কো
Gregarious—যূথচর, যূথচারী
Growth—বৃদ্ধি
Gymnosperm—ব্যক্তবীজী
Gynandrous—যোষিৎপুংস্ক
Habit—আচরণ, বৃত্তি
Habitat—বসতি
Hereditary—বংশগত
Heredity—বংশগতি
Hermaphrodite—উভয়লিঙ্গ
Heliotropism—সূর্যাবৃত্তি
Hedgehog—কাঁটাচুয়া

Herbivorous—শাকাশী, তৃণভোজী
Hind limb—পশ্চাৎপদ
Hibernation—শীতস্তম্ভ
Histology—কলাস্থান
Homogamous—সমপরিণত
Homologous—সমসংস্থ
Host—পোষক
Hybrid—সংকর
Irritability—উত্তেজিতা
Imago—সমজ
Inflorescence—পুষ্পবিন্যাস
Insect—পতঙ্গ
Insectivorous—পতঙ্গাশী
Invertebrate—অমেরুদণ্ডী
Katabolism—অপচিতি
Kingdom—সর্গ
Kernel—অন্তর্বীজ
Larva—শূক, লার্ভা
Labiate—ওষ্ঠাকার
Lanceolate—ভল্লাকার
Latex—তরুক্ষীর
Leaf—পত্র, পর্ণ
Leaf bud—পত্রমুকুল
Legume—শিম্ব
Leg, jointed—সন্ধিতপদ
Lobster—গলদা চিংড়ি
Life cycle—জীবন চক্র
Life history—জীবন বৃত্তান্ত
Littoral—বেলাবাসী
Marine—সামুদ্র, সামুদ্রিক
Mane—কেশর
Mammal—স্তন্যপায়ী
Marsupial—অঙ্কগর্ভ
Mesocarp—ফলের মধ্যত্বক্
Metabolism—বিপাক
Metabolic—বিপাকীয়
Metamorphosis—রূপান্তর
Monoclinous—উভয়লিঙ্গ
Monocotyledon—একবীজপত্রী
Monoecious—সহবাসী
Molusc—কম্বোজ
Millepede—সহস্রপদ। কেন্নো
Mimicry—অনুকৃতি
Modification—পরিবর্তন
Morphology—অঙ্গসংস্থান
Mould—ছাতা, চিতি
Moulting—নির্মোচন
Mutation—পরিব্যক্তি
Natural selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন
" history—জীববৃত্তান্ত
Naturalist—নিসর্গবেদী, নিসর্গী
Neuter—ক্লীব
Nectar—মকরন্দ, মধু
Nucleus—কেন্দ্রীন
Node—পর্ব
Ontogeny—ব্যক্তিজনি
Order—বর্গ
Order, sub—উপবর্গ
Organism—জীব

Omnivorous—সর্বাশী
Oviparous—ডিম্বজ
Ostrich—উটপাখি
Oyster—ঝিনুক, শুক্তি
Ovary—ডিম্বাশয়
Ovum—ডিম্বাণু
Ovule—ডিম্বক
Parental care—জনিতৃযত্ন
Parthenogenesis—অপুংজনি
Parasite—পরজীবী
Parent—জনিতা
Palæontology—প্রত্নজীববিদ্যা
Pedigree—কুলজি
Perenial—বহুবর্ষজীবী
Perianth—পুষ্পপুট
Pericarp—ফলত্বক্‌
Petal—দল, পাপড়ি
Pelagic—সমুদ্রচর
Phylum—পর্ব
Phanerogam—সপুষ্পক উদ্ভিদ
Photosynthesis—সালোকসংশ্লেষ
Pinnate—পক্ষল
Pistil—গর্ভকেশর
Pollen—পরাগ
Pollination—পরাগযোগ
Pith—মজ্জা
Polycotyledon—বহুবীজপত্রী
Polygamous—বিমিশ্র
Placenta—অমরা, ফুল
Porcupine—শজারু, শল্লকি
Prawn—বাগ্‌দা চিংড়ি
Prehensile—গ্রাহী
Proboscis—শুণ্ড, শুঁড়
Pseudopodium—ক্ষণপদ
Quadruped—চতুষ্পদ
Race—জাতি
Root—মূল
Reptile—সরীসৃপ
Rodent—তীক্ষ্ণদন্ত
Ruminant—রোমন্থক
Reproduction—জনন
Response—সাড়া, প্রতিক্রিয়া
Reversion—পূর্বানুবৃত্তি
Sac—স্থলী
Seed—বীজ
Scale—শল্ক, শকল, আঁশ
Shark—হাঙর
Shell—খোলক
Shrew—ছুঁচা
Sepal—বৃতাংশ
Serrate—ক্রকচ
Shrub—গুল্ম
Selection—নির্বাচন
Sensitive—সুবেদী
Species—প্রজাতি
Spine—শল্য, কণ্টক
Spore—রেণু
Stem—কাণ্ড
Sterile—বন্ধ্যা
Stimulus—উদ্দীপক

Stigma—গর্ভমুণ্ড
Sting—হুল, অল
Style—গর্ভদণ্ড
Slough—খোলস, নির্মোক
Snail—শামুক, শম্বুক
Snout—তুণ্ড
Sucker—চোষক
Survival—উদ্বর্তন
Symbiosis—মিথোজীবিতা
Talons—নখর
Tendril—আকর্ষ
Tribe—জাতিরূপ
Testes—শুক্রাশয়
Tusk—প্রদণ্ড
Unisexual—একলিঙ্গ
Vertebrate—মেরুদণ্ডী
Viviparous—জরায়ুজ
Variation—প্রকারণ
Variety—প্রকার
Ventral—অঙ্কীয়
Web-footed—জালপদ, লিপ্তপদ
Whale—তিমি
Worker—কর্মী
Worm—কৃমি

Psychology—মনোবিদ্যা Philosophy—দর্শন
Miscellaneous—বিবিধ

Aberration—অপেরণ
Abnormal—অস্বভাবী
Absolute—পরম
Abstinence—উপরতি
Abstract—বিমূর্ত, সংক্ষেপ
Abstraction—বিমূর্তন
Abstruse—নিগূঢ়
Accessory—আনুষঙ্গিক, উপকরণ
Accident—আপতন
Accidental—আপতিক
Accommodation—উপযোজন
Accretion—উপলেপ
Adaptation—অভিযোজন
Advocate—অধিবক্তা
Aesthetic—কান্ত
Aesthetics—কান্তবিদ্যা
Aetiology—নিদান
Afferent—অন্তর্মুখ
Agnosticism—অজ্ঞাবাদ
Aggregate—সমূহ
Aggrement—ঐক্য
Altercation—বিতণ্ডা

Alternative—বিকল্প, অনুকল্প
Altruism—পরার্থিতা, পরার্থবাদ
Ambiguous—দ্ব্যর্থক
Ambivalence—উভয়বলতা
Ambivalent—উভয়বল
Amnesia—অস্মার
Ampullar sensation—দিগ্‌বেদন
Anaesthesia—অবেদন
Analogous—সমবৃত্তি
Analogy—উপমা
Analysis—বিশ্লেষণ
Ancestor—উদ্‌বংশীয়
Animism—সর্বপ্রাণবাদ
Anomalous—ব্যতিক্রান্ত
Anomaly—ব্যতিক্রম
Anthropology—নৃবিদ্যা
Anthropomorphism—নরত্বারোপ
Anticipation—অগ্রজ্ঞান, পূর্বজ্ঞান
Antipathy—দ্বেষ, বিরোধ
Anxiety—উৎকণ্ঠা
Apathy—অনীহা
Aphorism—সূত্র
Apotheosis—দেবত্বারোপ
Apparent—আপাত
Application—প্রয়োগ
Approximate—আসন্ন
Approximation—আসত্তি
Archoeology—প্রত্নবিদ্যা
Archetype—আদিরূপ
Argument—যুক্তি

Armistice—অবহার
Asexual—অযৌন
Aspiration—উৎকাঙ্খা
Assemblage—সমূহ
Assimilation—আত্মীকরণ
Association—অনুষঙ্গ
Assumption—অঙ্গীকার
Assymetrical—অপ্রতিসম
Atavism—পূর্বগানুকৃতি
Atheism—অনীশ্বরবাদ
Attribute—গুণ, ধর্ম, লক্ষণ
Auditory—শ্রাবণ
Authentic—প্রামাণিক
Automatic—স্বতঃক্রিয়
Awkwardness—অপাটব
Axiom—স্বতঃসিদ্ধ
Back ground—পশ্চাদভূমি
Behaviour—ব্যবহার। চেষ্টিত
Being—সত্তা
Bias—পক্ষপাত
Broadcast—সম্প্রচার
By-product—উপজাত
Capacity—সামর্থ্য
Castration—উপস্থচ্ছেদ
Casual—আপতিক, আকস্মিক
Category—পদার্থ, জাতি
Categorical—নিরপেক্ষ
Causality—কারণতা
Cause—কারণ
Causal—কারণিক

Censor—প্রহরী
Certain—নিশ্চিত
Certainty—নিশ্চয়
Certificate—শংসাপত্র, শংসালেখ
Chance—আকস্মিকতা
Chaos—সংপ্লব
Clairvoyance—অলোকদৃষ্টি
Clearness—বৈশদ্য, বিশদতা
Cleptomania—চৌর্যোন্মাদ
Climax—পরাকাষ্ঠা
Code—সংহিতা
Coexistence—সহভাব
Coextension—সহব্যাপ্তি
Cognitive—জ্ঞানীয়
Coincidence—সমাপতন
Common sense—কাণ্ডজ্ঞান
Comparative—তৌলনিক, তুলনাত্মক
Compassion—অনুকম্পা
Compatible—সংগত, অবিরুদ্ধ
Complementary—পূরক
Complex—জটিল
Composite—সংযুত
Composition—সংযুতি
Comprehension—ধারণা
Compromise—সন্ধি
Concatenation—শৃঙ্খলা
Concept—ধারণা, প্রত্যয়
Conception—ধারণা
Concomitant—সহভাবী
Concrete—মূর্ত
Concurrence—সমাপাত, সহঘটন
Concurrent—সহঘটমান, সহগামী
Conditional—সাপেক্ষ
Congenital—সহজাত
Congruity—সংগতি, সামঞ্জস্য
Connotation—তাত্পর্য
Conscience—বিবেক
Conscious—সজ্ঞান
Consciousness—সংবিৎ, চেতনা
Consequence—পরিণাম, অনুক্রম
Consequent—অনুবর্তী
Constitution—সংস্থান
Contempt—অবমতি
Context—প্রকরণ
Contiguity—সন্নিধি
Continuity—অনবচ্ছেদ
Continuum—সন্ততি
Contour—পরিণাহ
Contrary—বিপরীত
Contrast—বৈসাদৃশ্য
Controversy—বিবাদ
Convention—প্রচল
Converse—বিপরীত
Coordination—সমন্বয়, স্বন্বয়
Correlation—অনুবন্ধ, পারস্পর্য
Correspondence—প্রতিষঙ্গ
Counterpart—প্রতিরূপ
Crime—অপরাধ, দুষ্ক্রিয়া
Criminal—দুষ্ক্রিয়

Criterion—নির্ণায়ক
Crucial—বিনিশ্চায়ক
Culture—সংস্কৃতি, কৃষ্টি
Cynic—অসূয়ক
Data—উপাত্ত
Day-dream—জাগরস্বপ্ন
Decadence—অবক্ষয়
Decaying—জরিষ্ণু
Deduction—অবরোহ, অনুমান
Definition—সংজ্ঞার্থ, লক্ষণ
Defined—নিরুক্ত
Degenerate—অপজাত
Degeneration—আপজাত্য
Deism—ঈশ্বরবাদ
Delusion—ভ্রান্তি
Demensia—চিত্তভ্রংশ
Demoralisation—নীতিভ্রংশ
Denotation—ব্যক্ত্যর্থ, বিশেষাভিধান
Depreciation—অপচয়
Design—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য
Despondency—নির্বেদ
Destiny—নিয়তি
Deviation—চ্যুতি, ব্যত্যয়
Diagnosis—নিদান
Die-hard—দুর্মর
Dilemma—উভয় সংকট
Direct—সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ
Discipline—বিনয়, শৃঙ্খলা
Displacement—অভিক্রান্তি
Disquisition—নিবন্ধ
Dissociation—বিষঙ্গ
Divine—দিব্য
Doctrine—মত, বাদ
Dualism—দ্বৈতবাদ
Duet—যমল গান
Effeminacy—স্ত্রীভাব
Effeminate—স্ত্রীময়
Efferent—বহির্মুখ
Efficacy—সাধকতা
Effort—প্রযত্ন
Ego—অহম্
Egoism, egotism—অহমিকা, অস্মিতা
Elimination—অপনয়
Emaciated—কৃশিত
Emotion—প্রক্ষোভ
Empirical—প্রায়োগিক, প্রয়োগজ
Entity—সত্তা, সত্ত্ব
Environment—প্রতিবেশ, পরিগম
Envy—ঈর্ষা, অসূয়া
Eolithic—আদ্যোপলীয়
Ephemeral—ঐকাহিক
Equilibrium—সাম্য, সুস্থিতি
Equivalent—তুল্য
Equivocation—বাক্‌ছল
Eternal—শাশ্বত, নিত্য, চিরন্তন
Ethics—নীতিবিদ্যা
Ethnology—নৃকুলবিদ্যা
Etiology—নিদানবিদ্যা

Eugenics—সুপ্রজননবিদ্যা
Evolution—অভিব্যক্তি
Exception—ব্যতিক্রম
Expectation—প্রত্যাশা
Expediency—উপযুক্তি
Extract—নিষ্কর্ষ
Fact—তথ্য, ঘটনা
Faculty—শক্তি
Fallacy—হেত্বাভাস
Fanaticism—ধর্মোন্মাদ
Feeling—অনুভূতি
Feigning—ভান
Fetish—ভক্তিবস্তু
Fetishism—বস্তুরতি
Fine art—ললিতকলা
Finite—পরিমেয়, সান্ত
Foreground—পুরোভূমি
Form—আকার
Formal—বিধিবৎ
Formality—শিষ্টাচার
Formula—সূত্র
Fortuitious—আকস্মিক
Free will—ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য
Function—বৃত্তি, ধর্ম
Fundamental—মৌলিক, প্রধান
General—সামান্য, সাধারণ
Generalization—সামান্যীকরণ
Generic—জাতীয়
Gregarious—যূথচর, যূথচারী
Gustatory—রাসন
Habit—অভ্যাস
Hallucination—মায়া, অমূলপ্রত্য
Hate—দ্বেষ
Hedonism—প্রেয়োবাদ
Hereditary—বংশগত
Heridity—বংশগতি
Heterogeneous—অসমসত্ত্ব
Homogenous—সমসত্ত্ব
Hypnosis, hypnotism—সংবেশন
Hypothesis—প্রকল্প
Idea—ভাব
Ideal—আদর্শ
Idealism—ভাববাদ
Identity—একত্ব, অভেদ
Identification—একাত্মীকরণ
Idiot—জড়ধী
Illusion—অধ্যাস
Image—প্রতিরূপ
Imagination—কল্পনা
Immanence—ব্যাপিতা
Immediate—অব্যবহিত
Immolation—বলি
Impersonal—অব্যক্তিক
Implication—লক্ষণা
Impulse—আবেগ
Imputation—আরোপ
Inborn—সহজাত, অন্তর্জাত
Incarnation—অবতার
Incest—অজাচার

Incidental—প্রাসঙ্গিক,
Incipient—উপক্রান্ত
Incompatible—বিরুদ্ধ
Inconsistent—অসংগত
Indefinite—অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত
Indicative—সূচক
Indirect—পরোক্ষ
Individual—ব্যক্তি, ব্যক্তিগত, প্রাতিস্বিক
Individuality—ব্যক্তিতা
Induction—আরোহ, উপগম
Industry—শিল্প, শ্রমশিল্প
Industrial—শিল্পীয়
Inertia—জাড্য
Inference—অনুমিতি, অনুমান
Inferiority complex—হীনমন্যতা, হীনতাভাব
Infinite—অনন্ত, অমেয়
Infinity—আনন্ত্য, অমেয়তা
Inherence—অধিষ্ঠান
Inheritance—উত্তরলব্ধি
Inhibition—বাধ
Innate—সহজাত
Inner—আন্তর
Insight—পরিজ্ঞান
Instability—অনবস্থা, অনবস্থ
Instinct—সহজ প্রবৃত্তি
Instinctive—সাহজিক
Instrumentality—করণতা
Intellect—বুদ্ধি
Interaction—মিথস্ক্রিয়া
Introspection—অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
Intuition—স্বজ্ঞা
Inversion—বিপর্যয়
Irrelevant—অপ্রাসঙ্গিক
Jealousy—ঈর্ষা, অসূয়া
Judgement—বিচার, সিদ্ধান্ত
Kinaesthesis—চেষ্টাবেদন
Law—নিয়ম, বিধি, সূত্র
Lethergy—জড়িমা
Limit—সীমা, অবধি
Local—স্থানীয়
Logic—যুক্তিবিদ্যা
Logical—যৌক্তিক
Logos—শব্দব্রহ্ম
Longing—অনুকাঙ্ক্ষা
Lust—রিরংসা
Luxury—বিলাস
Magic—জাদু, ইন্দ্রজাল
Major—প্রধান, মুখ্য
Malice—পৈশুন্য
Manifest—নিয়ম, বিধি, সূত্র
Masochism—মর্ষকাম
Masochist—মর্ষকামী
Material—ভৌতিক, জড়, অচিৎ
Material cause—সমবায়ী কারণ
Materialism—জড়বাদ, দেহাত্মবাদ
Maximum—চরম, বৃহত্তম
Mean—মধ্যক, সমক
Meditation—ধ্যান

Memory—স্মৃতি
Mentality—মানসতা
Mental Science—মানসবিজ্ঞান
Measurement—মাপনা
Metaphysical—আধিবিদ্যক
Metaphysics—অধিবিদ্যা
Method—প্রণালী, পদ্ধতি
Migration—অভিপ্রয়াণ, পরিযাণ
Mind—মন
Minimum—অবম, অল্পতম
Minor—অপ্রধান, লঘু
Misogynist—স্ত্রীদ্বেষী
Modal—প্রকারাত্মক
Monism—অদ্বৈতবাদ
Monotony—একান্বয়
Moral—নৈতিক
Morality—নীতি
Morbid—ব্যাধিত
Mystic—অতীন্দ্রিয়
Myth—অতিকথা
Mythology—পুরাণ, ঐতিহ্য
Narcissism—স্বকাম
Negative—নঞর্থক
Neolithic—নবোপলীয়
Normal—স্বভাবী
Notion—প্রত্যয়, মতি
Object—বিষয়
Objective—বিষয়মুখ
Observation—অবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ
Obsession—আবেশ
Obversion—প্রতিবর্তন
Occasional—কাদাচিৎক
Omnipotent—সর্বশক্তিমান
Omnipresent—সর্বব্যাপী, বিভু
Ontology—তত্ত্ববিদ্যা
Origin—উৎপত্তি, প্রভব
Orthodox—নৈষ্ঠিক
Outer—বাহ্য
Outline—পরিলেখ
Output—উৎপাদ
Over-population—অতিপ্রজন
Over-ruled—প্রতিদিষ্ট
Paleolithic— পুরোপলীয়
Panorama— পরিদৃশ্য
Pantheism—সর্বেশ্বরবাদ
Paradox—কূটাভাস, কূট
Parallelism—সহচার, সহচরবাদ
Passive—ভোগবৃত্ত, নিষ্ক্রিয়
Percept—প্রত্যক্ষ, রূপ
Perfection—পরোৎকর্ষ
Period—কাল, পর্যায়
Periodic—পর্যাবৃত্ত
Persistence—নির্বন্ধ
Persistent—নির্বদ্ধ
Personality—অস্মিতা, ব্যক্তিত্ব
Personification—নরত্বারোপ
Pessimism—দুঃখবাদ
Phase—দশা
Phobia—আতঙ্ক
Portable—সুবহ

Positive—সদর্থক
Postivism—দৃষ্টবাদ, প্রত্যক্ষবাদ
Postulate—স্বীকার্য
Practical—ব্যবহারিক, ফলিত
Pragmatism—প্রয়োগবাদ
Pragmatic—প্রায়োগিক
Precaution—প্রাগ্‌বিধান
Precocity—বালপ্রৌঢ়ি, অকালপক্কতা
Predicate—বিধেয়
Principle—তত্ত্ব
Probable—সম্ভাব্য
Problem—সম্পাদ্য
Profile—পার্শ্বচিত্র
Projection—অভিক্ষেপ
Prologue—পূর্বরঙ্গ
Propensity—প্রবণতা
Propitiation—প্রসাদন
Proposition—প্রতিজ্ঞা
Psycho-analysis—মনঃসমীক্ষণ
Psychology—মনোবিদ্যা
Psychologist—মনোবিৎ
Punctuality—সময়নিষ্ঠা
Puritanism—অতিনৈতিকতা
Rationalism—যুক্তিপদ
Rationalization—যুক্ত্যাভাস
Reaction—প্রতিক্রিয়া
Real—বাস্তব, যথার্থ
Realism—বাস্তবতা, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ
Reason—বুদ্ধি, হেতু
Receptive—গ্রাহী
Receprocity—ব্যতিহার
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
Reconciliation—সমন্বয়
Recreation—বিনোদন
Redundancy—অতিরেক
Reflex—প্রতিবর্তী
Relative—আপেক্ষিক, সাপেক্ষ
Relativity—আপেক্ষিকতা
Relaxtation—শ্লথন
Repetition—আবৃত্তি
Repression—অবদমন
Reproduction—জনন
Resident—আবাসিক
Resistance—বাধা, প্রতিবন্ধক
Response—প্রতিক্রিয়া, সাড়া
Rhythm—ছন্দ
Sacrament—সংস্কার
Sadism—ধর্ষকাম
Sadist—ধর্ষকামী
Safe-conduct—অভয়পত্র
Sanctimonious—ধর্মধ্বজী
Scepticism—সন্দেহবাদ
School—সম্প্রদায়
Scientist—বিজ্ঞানী
Self-contempt—স্বাবমাননা
Self-evident—স্বতঃপ্রমাণ
Self-supporting—স্বয়ম্ভর
Sensation—সংবেদন
Sense—জ্ঞানেন্দ্রিয়

Sense-organ—ইন্দ্রিয়স্থান
Sensitive—সুবেদী
Sentiment—রস
Sex—লিঙ্গ
Sexual—যৌন, কামজ, লৈঙ্গিক
Sexuality—যৌনতা, কামিতা, কামধর্ম
Simultaneous—যুগপৎ
Sociology—সমাজবিদ্যা
Sodomy—পায়ুকাম
Somnambulism—স্বপ্নচারিতা
Space—দেশ
Speculation—দূরকল্পনা
Spontaneity—স্বতঃবৃত্তি
Smell—ঘ্রাণ
Standard—প্রমাণ
Statistics—পরিসংখ্যান
Stimulus—উদ্দীপক
Stupor—স্তম্ভ, ব্যামোহ
Subconscious—অন্তর্জ্ঞানীয়
Subject—বিষয়
Subjective—আত্মমুখ
Sublimation—ঊর্দ্ধগতি
Substitution—প্রতিকল্পন
Suggestion—অভিভাব, অভিভাবন
Superintendent—অধিকর্মা
Supernatural—অতিপ্রাকৃত
Suppression—নিরোধ
Syllogism—ন্যায়, অনুমান বাক্য
Symbol—প্রতীক
Symbolism—প্রতীকতা
Symmetry—প্রতিসাম্য
Sympathy—সমবেদনা
Synthesis—সংশ্লেষণ
Taboo—নিষিদ্ধ, টাবু
Tactile—স্পার্শন
Taste—স্বাদ
Technique—কৌশল
Teleology—উদ্দেশ্যবাদ
Texture—গ্রথন
Theism—ঈশ্বরবাদ
Theorem—উপপাদ্য
Theory—সিদ্ধান্ত, বাদ
Theoritical—তত্ত্বিয়, বাদীয়
Tint—আভা
Trance—সমাধি
Transcendental—তুরীয়
Type—জাতিরূপ
Unconscious—নির্জ্ঞাত, অজ্ঞাত
Undermining—অধঃখনন
Universal—সার্বিক, সর্বগত
Utilitarianism—উপযোগবাদ
Utility—উপযোগ
Utopia—রামরাজ্য
Will—সংকল্প
Wish—ইচ্ছা
Vision—দর্শন, দৃষ্টি, ছায়া
Visionary—কল্পিত, ভৌতক